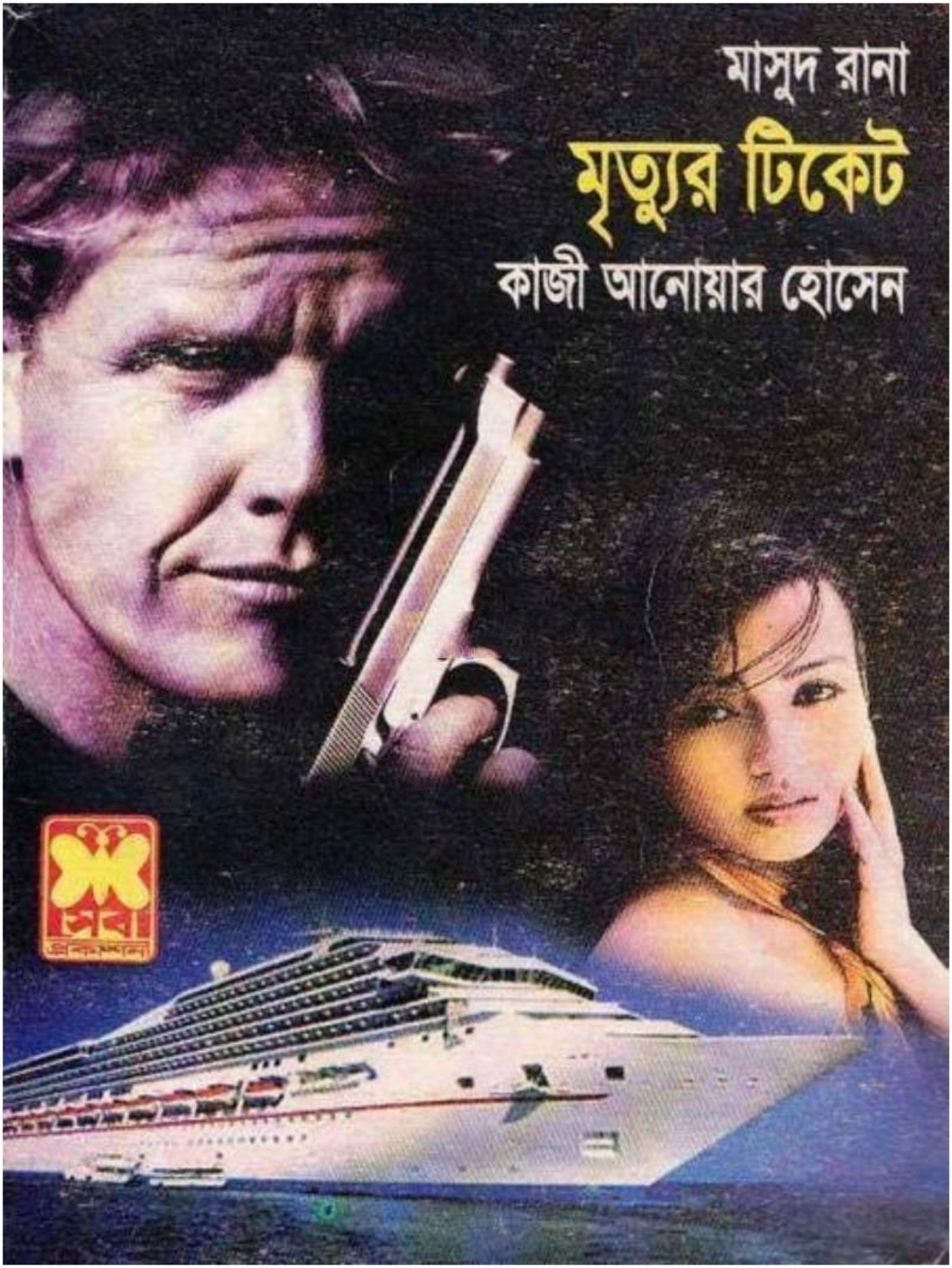

মাসুদ রানা
মৃত্যুর টিকেট
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

মৃত্যুর টিকেট

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিলাসবহুল জাহাজ লাভ অ্যাট সি, চলেছে সমুদ্রভ্রমণে। সোহানাকে নিয়ে ওতে উঠল রানা। দু'দিন পেরতেই ওদের সাধারণ ছুটি অসাধারণ হয়ে উঠল! রানা-সোহানা কি জানত, আসলে ওরা কীসের টিকেট কেটেছে? কম্পিউটার জিনিয়াস স্ট্রাথার হ্যালেক ঠিক করেছে প্রতিশোধ নেবে, যাত্রীসহ গোটা জাহাজ ধ্বংস করে দেবে।
তার চোখ পড়ল সুন্দরী সোহানার উপর। মনে জ্বলে উঠল দুরাশা! বন্দি হলো সোহানা। ওকে উদ্ধার করবে কে? ওদিকে রানা নিজেই তো আটকা পড়েছে জাহাজের তলায়—মরতে বসেছে পানির নীচে শ্বাস আটকে! তেলবাহী বিশাল এক অয়েল ট্যাঙ্কারের দিকে ছুটছে জাহাজ! দুই জাহাজে সংঘর্ষ ঠেকানোর জন্য পাগলের মত চেষ্টা চালাচ্ছে রানা। ভোলেনি সোহানার বিপদের কথাও। কিন্তু...

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মৃত্যুর টিকেট

এক

নিউ ইয়র্ক।

ভ্যালি স্ট্রিমের দক্ষিণে, রকভিল সেন্টার।

এখানেই বিশাল জাহাজ কোম্পানি ‘সেভেন সি’র অফিস। সারা দুনিয়ায় তিন শ’ জাহাজ এদের চষে বেড়াচ্ছে সাত সাগর।

আয়েশ করে রিভলভিং চেয়ার থেকে দেয়াল-ঘড়ি দেখলেন কোম্পানির এমডি, হ্যারি খামোশনস্কি। বিকেল পৌনে পাঁচটা। আর পনেরো মিনিট, তারপর অফিস ছুটি।

ঠিক তখনই অফিসের দরজা খুট করে খুলে গেল, ভিতরে ঢুকলেন কম্পিউটার বিভাগের প্রধান, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী স্টাথার হ্যালেক। পিছন পিছন এল মিস্টার খামোশনস্কির পিএ, সামান্থা। চোখে নালিশ নিয়ে বসের দিকে চাইল সে, ‘স্যর, মিস্টার হ্যালেক জোর করে...’

‘ঠিক আছে, তুমি যাও,’ মদু হেসে বললেন খামোশনস্কি।

ততক্ষণে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন হ্যালেক, মুখ থমথম করছে।

দরজা বন্ধ করে চলে গেল সামান্থা।

‘বসুন,’ চেয়ার দেখালেন খামোশনস্কি। একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইলেন।

আজ এই প্রতিষ্ঠানে মিস্টার হ্যালেকের শেষ দিন। বিশেষ ব্যবস্থায় পাওনার কয়েক গুণ বেশি টাকার চেক দেয়ার কথা।

এতক্ষণে দেয়া হয়ে গেছে হয়তো! কিন্তু তার পরেও মানুষটা সারাদিন গোটা অফিসে ঘুরঘুর করেছেন। হয়তো এতদিন এখানে চাকরি করার পর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারছেন না।

'আপনারা আমাকে কোনও ফেয়ারওয়েল দেবেন না?' টিটকারির ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন স্ট্রাথার হ্যালেক। চেয়ারে না বসে ওটার কাঁধে দু'হাত রাখলেন, মিস্টার খামোশনস্কির চোখের দিকে চাইলেন চোখ গরম করে। 'আপনারা আমাকে অন্যায় ভাবে বিদায় করছেন, মিস্টার এমডি।'

'আপনি অসুস্থ, মিস্টার হ্যালেক, আপনার চিকিৎসা দরকার, বললেন খামোশনস্কি।

বেসুরো হেসে উঠলেন স্ট্রাথার হ্যালেক। 'দেখলাম আপনারা আমাকে মাত্র পাঁচ লাখ ডলার দিতে চান।'

'নিয়ম অনুযায়ী এক লাখ আপনার প্রাপ্য।'

কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ আবারও হেসে উঠলেন। 'ওই টাকায় কীসের চিকিৎসা হবে, মিস্টার খামোশনস্কি?' এমডির দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে এলেন তিনি। দু'চোখ সরু হয়ে গেল। 'বড় বড় পাঁচজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার বলেছে, আমি আর অল্প কয়েক মাস বাঁচব।'

চুপ করে রইলেন মিস্টার খামোশনস্কি। মিস্টার হ্যালেকের এ কথার কোনও জবাব হয় না।

'আরও বেশি বাঁচতে চাইলে চিকিৎসার জন্য অন্তত পঞ্চাশ লাখ ডলার লাগবে,' বললেন হ্যালেক। 'আর আপনারা আমাকে দিতে চাইছেন পাঁচ লাখ!

এত বছর অক্লান্ত, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলাম -তার বিনিময়ে আমার প্রাপ্য হলো এ-ই?'

'আপনি উত্তেজিত হবেন না,' বললেন খামোশনস্কি। 'বসুন।'

'কী হবে বসে?' উত্তরোত্তর রেগে উঠছেন হ্যালেক। 'আপনারা নিজেদেরকে কী মনে করেন?'

মিস্টার হ্যালেকের দিকে চেয়ে রইলেন খামোশনস্কি। কিছু বললেন না। একবার বলতে চাইলেন, আপনি তো আপনার কাজের বিনিময়ে যথেষ্ট বেতন পেয়েছেন -কিন্তু বললেন না। আসলে কোম্পানির সবাই মিলে চাইলেও হ্যালেকের প্রয়োজন। মিটাতে পারবেন না। পঞ্চাশ লাখ তাঁদের সাধ্যের বাইরে।

একটা মানুষ টাকার অভাবে, চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে, সেটা মেনে নেয়া কঠিন, তবে এটাই রূঢ় বাস্তব। আর, এই লোক। তো চিকিৎসা করালেও মরবে। কিন্তু মেনে নিতে পারছে না, শুধু ও নয়, দুনিয়ার সবাই মরবে।

স্ট্রাথার হ্যালেক প্রায় ধমকে উঠলেন, 'কিছু বলছেন না যে?'

'আপনি এখন আসুন,' শান্ত স্বরে বললেন খামোশনস্কি। 'অ্যাকাউন্ট্যাণ্টের কাছ থেকে আপনার চেক বুঝে নিন গিয়ে।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না। নিজেদের আপনারা কী মনে করেন। আমি আমার জীবনটা দিয়েছি এই কোম্পানির জন্য, মারাত্মক অসুখ বাধিয়েছি আপনাদেরই কাজ করতে গিয়ে, এই ক'টা টাকা ধরিয়ে দিলেই সব শোধ হয়ে গেল? একটা মানুষের জীবনের, অক্লান্ত পরিশ্রমের দাম বুঝি এ-ই?'

‘আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই,’ খামোশনস্কি বললেন। ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। ‘সামান্থা, মিস্টার হ্যালেক এখন আসবেন, তুমি তাকে...’

দ্রুতপায়ে টেবিল ঘুরে এমডির পাশে পৌঁছে গেলেন স্ট্রাথার হ্যালেক। খামোশূনস্কি উঠে দাঁড়ানোর আগেই দুইহাতে তাঁর গলা টিপে ধরলেন।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন খামোশনস্কি, হাত থেকে রিসিভার ঠকাস্ করে পড়ে গেছে আগেই। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে এক ধাক্কায় হ্যালেককে সরিয়ে দিতে চাইলেন।

আধপাক ঘুরে হুড়মুড় করে কার্পেটে পড়লেন হ্যালেক, মুখ দিয়ে গালি বেরিয়ে এল, ‘শালা... আমি তোর চোদ্দোগুষ্টির...’

হ্যালেক উঠবার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা, সামান্থার সঙ্গে ভিতরে ঢুকল দু’জন শক্তসমর্থ গার্ড। একটানে হ্যালেককে কার্পেট থেকে টেনে তুলল তারা, শক্ত করে ধরে রাখল উত্তেজিত, ক্রোধান্ধ মানুষটার দুই হাত।

অকথ্য গালিবর্ষণ চালিয়ে গেল হ্যালেক বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে করতে। মা-বোন থেকে শুরু করে বাদ রাখল না কিছুই। তারপর ধরল তাঁর স্ত্রীকে, শেষে তাঁকে।

‘এঁকে নিয়ে যাও,’ টাই ঠিক করবার ফাঁকে গার্ডদের বললেন খামোশনস্কি। টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখ।

হ্যালেককে জাপ্টে ধরে দরজার দিকে নিয়ে চলেছে দুই গার্ড, হিসহিস করল বিজ্ঞানী, ‘আমি তোদের কী সর্বনাশ করি দেখবি... তোরা...’

গার্ডদের উদ্দেশে, না মিস্টার খামোশনস্কির উদ্দেশে বলছে, বোঝা গেল না। দুই গার্ড কম্পিউটার বিজ্ঞানীকে বের করে নিয়ে গেল, দরজাটা লাগিয়ে দিল সামান্থা।

থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকলেন খামোশনস্কি। একদম খামোশ।

ছোট্ট কোনও দ্বীপের তুলনায় সেইন্ট কিটস্-এর গোল্ডেন রক এয়ারপোর্ট অত্যন্ত ব্যস্ত। আশপাশের দ্বীপ থেকে একটু পর পর আসছে খুদে বিমান, এখান থেকেও রওনা হচ্ছে একের পর এক। ইমিগ্রেশন অফিসার রানা-সোহানার পাসপোর্ট দেখল না বললেই চলে। কাস্টমস অফিসার চেহারা দুটো দেখে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানাল, মনে হলো, ওরা যেন তার কতদিনের চেনা -আবার দেখা হওয়ায় যার পর নাই আনন্দিত। হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল ওদের লাগেজ পরীক্ষার দরকার নেই, ইচ্ছে করলে টার্মিনাল ছাড়তে পারে ওরা এখনই। এ দ্বীপের মানুষ প্রচুর আগন্তক দেখে অভ্যস্ত। এখানে নানান দেশ থেকে হরেক জাতের পর্যটক আসে, অঢেল টাকা ঢালে শপিঙে; সেই সুবাদে জমজমাট ব্যবসা করে এরা, দেশের সমৃদ্ধি হয়। ব্যাগ ও সুটকেসগুলো কার্টে শুইয়ে এগোল রানা, পাশে সোহানা। অটোমেটিক দরজার সাত ফুটের মধ্যে পৌঁছে যেতেই খুলে গেল ওটা, এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে চওড়া ফুটপাথ। একটু আগে সূর্য উঠেছে, পরিবেশ একটু ভেজা ভেজা, স্নিগ্ধ; বাতাসে গাছের পাতা ও ফুলের সুবাস।

রাস্তার ওপাশের দেয়ালে বিরাট এক সাইনে লেখা: ‘ ক্রুজ শিপে যাওয়ার শাটল।’ ওটার দিকে হাতের ইশারা করল রানা।

কয়েকটা বাস ওখানে ইঞ্জিন চালু রেখে অপেক্ষা করছে। ওরা ওদিকে যাওয়ার আগেই একটা ট্যাক্সি সামনে এসে থামল।

রানার দিকে চেয়ে হাসল সোহানা, ‘চলো, ট্যাক্সি নিয়েই যাই। চারপাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।’

গাড়ির ভিতর উঁকি দিল রানা, বুঝল ট্যাক্সি ড্রাইভার দরজা খুলে বেরবে না, সুটকেসগুলো ট্রাঙ্কে তুলতে হবে ওরই। ভয়ানক মোটা এক মহিলা স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে আটকে গেছে, নিশ্চয়ই পরে কেউ তাকে উদ্ধার করবে। মনে হলো না এ নিয়ে চিন্তা করছে, রেডিওতে ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে ক্যালিপসো বাজনা। শুনছে সে।

সুটকেস ও ব্যাগ ট্রাঙ্কে রেখে গাড়িতে উঠে পড়ল ওরা। লাফিয়ে উঠে রওনা হলো ক্যাব। দু’পাশে গাছপালা, ডোবা, কখনও দু’একটা বাড়ি। মাঝে মাঝে পাথরের গোলাকৃতি টাওয়ার। ড্রাইভার মহিলা জানাল, ওগুলো একসময় চিনির মিল ছিল, এখন সব পরিত্যক্ত। একটু পর ছোট একটা গ্রাম পড়ল। মাঠে ছোট-বড় অনেকে ক্রিকেট খেলছে। পুরো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জুড়ে উৎসাহী ক্রিকেটারের অভাব নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে রাজধানী ব্যাসটেয়া মাত্র তিন মাইল, চার মিনিট পর রেডিওর ভলিউম সামান্য কমিয়ে মহিলা জানাল, ওরা রাজধানীতে ঢুকছে।

ছোটখাটো শহর ব্যাসটেয়া। সবকিছুর মধ্যে পুরনো একটা ভাব রয়েছে। রাস্তাগুলো সরু। বেশিরভাগ বাড়ি কাঠের, ছাদ তৈরি করা হয়েছে করোগেটেড দস্তা দিয়ে। রাস্তার দু’পাশে টুরিস্টদের জন্য ঝকমকে দোকান। বেশিরভাগ দোকানে টিশার্টের ডিসপ্লে, ওখানে বেশিরভাগ টি-শার্টেই লেখা: অমুক

হারিকেন বা তমুক হারিকেন; তুমি নিষ্ঠুর, তুমি হিংস্র, তুমি ভয়ঙ্কর, তুমি ভীষণ খারাপ!

মহিলা জানাল, 'আটানব্বইয়ের সেপ্টেম্বরে আসে লুইসা। কী যে বিধ্বংসী! আমরা টি-শার্টে ভদ্রতা করে শুধু ওটুকু লিখি।'

এক গলি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আরেক গলিতে গিয়ে পড়ল ক্যাব, দূরে হার্বার টার্মিনাল বিল্ডিং দেখা গেল। ক্যালিপসো বাজনার দিকে মন দিয়েছে মহিলা, দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে গাড়ি। বিদ্যুৎ-বেগে টার্মিনালের এককোনা পার হয়ে গেল সে, বাঁক নিতেই বন্দর দেখতে পেল ওরা –গাঁঢ় নীল সাগরে বিশাল সব সেইল-বোট, অপূর্ব ইয়ট ও ক্রুজ শিপের টেণ্ডার ভাসছে। অবারিত হাওয়া আসছে ওদিক থেকে। ট্যাক্সির ড্রাইভার খুঁজে পেতে 'লাভ অ্যাট সি' নামের এক ক্রুজ জাহাজের টেণ্ডারের সামনে থামল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে টেণ্ডারে সুটকেস-ব্যাগেজ তুলে ফেলল রানা, কর্তৃপক্ষকে ব্যাগেজ বুঝিয়ে দিল। ততক্ষণে নৌযানটা ঘাট ছাড়ার জন্য তৈরি হয়েছে। জিনিসটা ছাদহীন ফেরির মত, সোহানাকে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল রানা। এরইমধ্যে যাত্রীরা আসন দখল করেছে, অনেকে ক্যারি-অন ব্যাগেজগুলো সঙ্গে রেখেছে।

পাশাপাশি আসন পেল না ওরা। প্রথম বেঞ্চিতে একটা জায়গা দেখে সোহানাকে বসিয়ে দিল রানা, নিজে চলল শেষ-বেঞ্চির দিকে।

সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত জাহাজের এক অফিসার বলে উঠল, 'আপনারা দয়া করে যার যার সিটে বসে পড়ন, এখনই রওনা হবো আমরা। বসে পড়ুন সবাই।'

ভীষণ মোটা, মাঝবয়সী এক দম্পতির মাঝখানে সামান্য জায়গা করে নিল রানা। দু'জন ফ্যাট বাস্টার টি-শার্ট পরে নিজেদের ভুঁড়ি লুকাতে চেয়েছে। মাঝে রানাকে দেখে অবাক হলো তারা।

ডক ছেড়ে রওনা হয়ে গেল টেণ্ডার।

'তুমি বাছা কোত্থেকে এলে?' কৌতুকের সুরে জানতে চাইল স্বামীটা। দুই সওয়া শ' কেজি সলিড পাউরুটির মাঝখানে তুমি কীসের কিমা, হে? হ্যা...'

রানা চট করে বলল, 'না, না, হ্যাম না। বিফ।'

'অর্থাৎ মুসলিম?'

'রাইট।'

'আমার ভিক্টর আবার ছোট বোটে বমি করে,' রানাকে তথ্য দিল মহিলা।

'যাকগে ওসব কথা,' বলল ভিক্টর, চট করে প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তো নিশ্চয়ই এটাই তোমার প্রথম হানিমুন, বাছা?'

মাথা নাড়ল রানা, 'আসলে...'

'ও-ও-ও, বুঝেছি, তোমরা মাত্র এনগেজমেন্ট করেছ,' বলল ভিক্টর। জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল না সে, 'বন্ধু, খুব সাবধান! অনেক উঁচু বাড়ির ছাদে উঠতে যাচ্ছ তুমি।' একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে রানার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'একটু বেসামাল হলেই... ব্যাপারটা প্রায় পঞ্চাশ তলা বাড়ির ছাদ থেকে নীচে পড়লে যা হয়। দড়াম! ব্যস... খেলা শেষ! ব্যাপারটা মরা পাখির নীচে পড়ার মত আর কী!'

'কথাটা সবসময় মাথায় রাখব,' মৃদু হেসে বলল রানা।

ওর দু’পাশের কপোত-কপোতি তাদের মোটা ঘাড় সামনে বাড়িয়ে দিল, প্রথম বেঞ্চে বসা সোহানাকে দেখছে আগ্রহ নিয়ে।

সোহানা টের পেল কয়েকটা চোখের দৃষ্টি ওর মাথার পিছনে স্থির হয়েছে। ঘুরে তাকাল ও, দেখল রানার দু’পাশে বসা মোটা এক দম্পতি ড্যাব ড্যাব করে ওর দিকে চেয়ে আছে। নিশ্চয়ই রানা কিছু বলেছে!

ভিক্টরের স্ত্রী অস্বাভাবিক চিকন স্বরে জানাল: সত্যিই, ভিক্টর, ছেলেটার রুচি আছে কিন্তু, অমন সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে চলেছে।

শ্রাগ করল রানা।

কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে চাইল সোহানা, আন্দাজ করতে পারল না রানা কী বলেছে। ঘুরে সামনের সাগরের দিকে চোখ রাখল। উজ্জ্বল আলোয় বন্দরটা এত সুন্দর লাগল যে মনে হলো ঘন্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকতে পারবে।

ওর পাশে বসা এক লোক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘এই প্রথম ক্রুজ?’

লোকটার দিকে তাকাল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করল, কথা বলবে, না উপেক্ষা করবে। লোকটা চিকন চাকন ধরনের, বেশ লম্বা। কপালে অনেকগুলো খাড়া ও সমান্তরাল ভাঁজ। বয়স কমবেশি পঁয়ত্রিশ, কিন্তু দু’ চোখের কোণে সরু সরু সূক্ষ্ম ভাঁজের চিহ্ন -দৃষ্টিতে কীসের যেন খিদে। চোখ দেখলে মনে হয় কিছু যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। মাথা ভরা চুলগুলো কালচে-খয়েরি রঙের, সব মিলে কেমন একটু অসুস্থ, পাগলাটে মনে হয়। তবে অনেক মেয়ের কাছে আকর্ষণীয়ও লাগবে। চোয়ালের হাড়দুটো একটু বেশি উঁচু, দুই গালে একটা করে গভীর নালা নাকের পাশ থেকে প্রায় চিবুক

পর্যন্ত নেমে এসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে লোকটা। চোখে নিরেট প্রশংসা।

'হ্যাঁ, প্রথম ক্রুজ,' হাসল সোহানাও। 'আপনিও প্রথম?'

'না, বহুবার এসেছি,' নরম স্বরে বলল সে। আবারও হাসল। 'দুঃখিত, নিজের নামই বলিনি! আমি স্ট্রাথার হ্যালেক।'

'সোহানা চৌধুরী,' হাত বাড়িয়ে দিল না সোহানা।

'এরকম ট্রিপে শত শত বার এসেছি আমি,' লোকটার কণ্ঠে বিন্দুমাত্র গর্ব প্রকাশ পেল না। 'এইসব ক্রুজ লাইনারগুলোর কম্পিউটার সিস্টেম পরীক্ষা করার ও সুস্থ রাখার চাকরি ছিল আমার। আমার কাজ কম্পিউটারের ইন্টারফেস বাস্তব পরিবেশে কেমন কাজ করে তা দেখা।'

'তার মানে আপনি সমস্যা খোঁজেন,' বলল সোহানা।

'হ্যাঁ, পোকা খুঁজি,' শুধরে দিল হ্যালেক। 'সেটাই আসল কাজ।' আগ্রহ নিয়ে সোহানার দিকে চেয়ে রয়েছে। জানতে চায় ও কী বলে।

বাধ্য হয়ে বলল সোহানা, 'কিন্তু যদি একটাও না থাকে?'

'এসব জাহাজের দাম সাত শ' মিলিয়ন ডলার, তেমনি দামি এর কম্পিউটার... হ্যাকারদের টার্গেট,' হাসল হ্যালেক। 'ভাইরাস আপনি পাবেনই।'

সে হয়তো আশা করছে সোহানা আগ্রহ নিয়ে আরও কিছু জানতে চাইবে, কিন্তু তা হলো না। অন্য কোনও বিষয়ে দু'জন। আলাপ করল না। অস্বস্তি বোধ করে চুপ রইল সোহানা, ওর চোখ পড়ল ভদ্রলোকের ক্যারি-অন ব্যাগের উপর। সাধারণত এসব দামি ব্যাগ-কেসে ল্যাপটপ কম্পিউটার ও জটিল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট রাখা হয়।

‘আপনি ভাবতে পারেন, এই যাত্রায় কোনও বিশ্রাম পাব না আমি,’ বলল হ্যালেক। ‘তা কিন্তু নয়, দুর্দান্ত একটা ছুটি কাটিয়ে ফিরব।’

বন্দর ছেড়ে সাগরে বেরিয়ে এসেছে টেণ্ডার, সোহানার চোখ চলে গেল খানিকটা দূরে বিশাল এক সাদা জাহাজের দিকে। এক পাশ থেকে ওটাকে প্রকাণ্ড একটা দেয়াল মনে হচ্ছে। ‘লাভ অ্যাট সি’র বহনক্ষমতা পঞ্চান্ন হাজার টন, বন্দর থেকে খানিকটা দূরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে।

রানার কাছে সোহানা শুনেছে, এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ। এখন চুপচাপ সাগরের বুকে বসে। জাহাজের পিছনে মেরিনার দরজা পুরোপুরি খোলা, এরইমধ্যে যাত্রীরা স্নরকেলিং, জেট স্কিইং করছে। কেউ কেউ রাফটে উপুড় হয়ে শুয়ে সানবেদিং করছে।

কিছুক্ষণ পর জাহাজের পাশে পৌঁছে গেল টেণ্ডার। যাত্রীরা একে একে ধাতব গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে উঠছে। রানার জন্য অপেক্ষা করল সোহানা, তারপর সবার শেষে পাশাপাশি এগোল ওরা! প্রকাণ্ড জাহাজের গায়ে একটা দরজা খোলা হয়েছে, যাত্রীদের পিছু নিয়ে সেটার দিকে পা বাড়াল ওরা।

দরজার কাছে দাড়িয়ে এক ফটোগ্রাফার। ‘এই তো সুন্দর একজোড়া মডেল পাওয়া গেছে,’ পেশাদারী ভঙ্গিতে বলল সে। ‘ছবি তুলবেন না আপনারা? নড়বেন না! ছবি চিরদিনের জন্য, ওটার বয়স বাড়ে না কোনদিন। আপনাদের নাম কী?’

‘ও মাসুদ রানা, আমি সোহানা।’

‘রানা আর সোহানা, অপূর্ব-অপূর্ব!’ মানুষকে খুশি করবার কৌশল ভালই রপ্ত করেছে ফটোগ্রাফার। ‘বড় করে হাসুন তো দু’জন। দেখে যেন মনে হয় বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি!’

‘আমরা বিয়ে করিনি এখনও,’ মৃদু হেসে বলল সোহানা।

ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। দু’জন দু'জনের দিকে তাকাল ওরা।

‘দু’জন দুটো ছবি নিলে মাত্র পঞ্চাশ ডলার,’ ফটোগ্রাফার পাকা ব্যবসায়ীর মত বলল, ‘পরে যদি ছবিটা পছন্দ না হয়, পরেরবার যখন আসবেন, বিনে পয়সায় ছবি তুলে দেব। ...এই স্বর্গে আপনাদের স্বাগতম।’

সোহানার দিকে চাইল রানা। ছ’বি নেব আমরা?’

‘নেব।’

মাথা দোলাল রানা। ফটোগ্রাফার হাসল। ‘আটদিন পর ডেলিভারি পাবেন।’

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল স্টুয়ার্ড, যাত্রীদের নিয়ে। কেবিনে পৌঁছে দিচ্ছে তারা। সোহানা ও রানার জন্য এক স্টুয়ার্ড অপেক্ষা করছে। ওরা জাহাজের যেদিকে যাবে, সেদিকে নিয়ে যাবে। একটু পরেই বোঝা গেল হাসিখুশি মানুষ সে।

পথ দেখাল, একটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে বলল, ‘এ জাহাজে যাত্রীদের জন্য সাতটা ডেক, আরও আছে সুইমিং পুল, হেলথ স্পা, ক্যাসিনো, ড্রাই ক্লিনার্স, মুভি, থিয়েটার...’

মস্ত এক বলরুম পার হলো ওরা, ওটার শেষে রয়েছে ব্যান্ডস্ট্যাণ্ড, ওখানে বিরাট ব্যানারে লেখা: ডায়মণ্ড জুয়েলার্স অভ আমেরিকা কনভেনশন।

একটা হলওয়ে ধরে এগোল স্টুয়ার্ড। একপাশে পড়ল ব্যাঙ্কের অফিস। চওড়া দরজা দিয়ে স্টিলের প্রকাণ্ড ভল্টের একাংশ দেখা গেল।

‘আপনারা ইচ্ছে করলে জাহাজের ভল্টে ভ্যালিউবলস রাখতে পাবেন’ বলল স্টুয়ার্ড। সোহানা ও রানাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল সে। যেন ভাবছে,

তোমরা দু'জন তো একে অপরের কাছে হীরার চেয়েও অনেক বেশি দামি। 'চলুন,' পা বাড়াল স্টুয়ার্ড।

টেণ্ডারে সোহানার সঙ্গে যে লোকটা কথা বলেছিল, হঠাৎ সে সামনের করিডোর থেকে এল। 'তুমি কি আমার গলফ ক্লাবগুলো খুঁজে পেয়েছ?' স্টুয়ার্ডের উদ্দেশে প্রশ্ন করল সে।

'জী, সার,' বলল স্টুয়ার্ড। 'এঁদের কেবিনটা দেখিয়ে দিয়েই আপনার জিনিস পৌঁছে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' বলল হ্যালেক। সোহানার দিকে। চেয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। কিন্তু সুন্দরীর পাশে যে বেয়াড়া টাইপের লোকটি আছে, তাকে তার পছন্দ হলো না। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে বলল, 'আশাকরি ক্রুজটা সবাই মন-প্রাণ ভরে উপভোগ করবে।'

খটকা লাগায় ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে দেখল রানা।

ওরা আরেক স্টেয়ারকেস নামল, সামনে পড়ল লম্বা এক করিডোর। ওটার শেষে বাঁক নিল ওরা, স্টুয়ার্ড হাত তুলে ৭০৮৮ লেখা একটা দরজা দেখাল, নাটকীয়তার সঙ্গে বলল, 'আজ থেকে এটা আপনাদের বাড়ি। আগামী সাতটা দিন আপনারা এই রুমে কাটাবার পর চলে যেতে খুব খারাপ লাগবে, দেখবেন।'

দরজাটা খুলল রানা, ওর পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকল সোহানা। একধারে প্রকাণ্ড ডবল বেড। পোর্ট হোলের উপরের পর্দা সরাল সোহানা, জাহাজের গায়ে একটু দূরে লাইফবোট ঝুলছে।

'আপনাদের যখন যা-কিছু লাগে, যে-কোনও কিছু, শুধু একবার আমাকে খবর দেবেন। আমার নাম জেসন।' বুকে টোকা দিল স্টুয়ার্ড। 'আপনাদের

আগেই ধন্যবাদ দিয়ে রাখি, জানি এই যাত্রাশেষে বিদায় নেয়ার আগে আপনারা আমাকে ভাল টিপস দেবেন।' হেসে ফেলল সে, 'এমনিই ঠাট্টা করলাম।'

'তার মানে টিপস দিতে হবে না?' ভ্রূ নাচাল রানা।

'নো টিপস,' সায় দিল জেসন।

'চলে যাওয়ার আগেই... এখনই যদি দিই?'

হাসল হাসিখুশি মানুষটা। মাথা নাড়ল। আপনাদের হানিমুন সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক।' চলে যাওয়ার আগে বলল, 'ভাল থাকুন।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই দু'হাতে সোহানাকে জড়িয়ে ধরল রানা। ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে আসছে দেখে সোহানা বলল, 'রাহাত চাচা যদি জানতেন ছুটিতে লুকিয়ে আমরা এখানে এসেছি...'

''কী হতো?' সোহানার ঠোঁটের এক সেন্টিমিটার দূরে থামল রানার ঠোঁট।

'চাকরি নট করে বিয়ে পড়িয়ে দিতেন।'

'হয়তো মন্দ হতো না তা হলে।'

রানার চোখে খানিকটা দ্বিধা?

'সুন্দর ঘর বাছাই করেছ,' প্রসঙ্গ পাল্টাল সোহানা। রানার বাহুডোর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

আরেক স্টুয়ার্ড আগেই ওদের সুটকেস-ব্যাগেজ বিছানার পাশে রেখে গেছে। নিজের সুটকেস খুলল সোহানা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে নিল। গুনগুন করে গান গাইছে, সুন্দর করে গুছিয়ে রাখল সব কেবিনে।

রানার মনে হলো, সত্যিই তো বাড়ির মতই লাগছে। পাঁচ মিনিট পর সায়া-শাড়ি-ব্রেসিয়ার-ব্লাউজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল সোহানা।

রানা নিজের সুটকেস থেকে সব বের করেছে কি করেনি, নীল রঙের কাতান পরে বেরিয়ে এল সোহানা। নীল পরীর মতই লাগল ওকে। এরইমধ্যে দুর্দান্ত মেকআপও নিয়েছে।

ওকে দেখে শিশিরভেজা গোলাপের কথা মনে পড়ল রানার।

উপরের ডেক থেকে পার্টির আওয়াজ ভেসে আসছে। নাচগান চলছে। অনেকে ওখানে জমে গেছে।

'আমার সঙ্গে কেউ পার্টিতে যাবে?' উঠে দাঁড়াল রানা।

সঙ্গিনী ভ্রূ নাচাল, 'আপনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন, জনাব?'

কেবিন থেকে বেরিয়ে প্রথম সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনে পড়ল পুল ডেক। ওখানে জাহাজের এক ক্রু চেইন স' নিয়ে ব্যস্ত, বিরাট এক টুকরো বরফের উপর করাত চালাচ্ছে। এরইমধ্যে বরফটা একটা, আকৃতি নিয়ে ফেলেছে। ডলফিনটা তিন ফুট দীর্ঘ, লেজের জোরে ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা সূর্যের আলো মাখতে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে দেখছে কী ঘটে এরপর। করাতের এককে পোচে বরফের ডলফিন অন্য কিছু হচ্ছে। অনেকে আন্দাজ করতে চাইছে এবার কীসের মূর্তি দেখবে।

এদিকে ব্যান্ড দল পুলের কাছে ক্যালিপসো মিউজিক বাজিয়ে চলেছে। ওখানে নাচছে অনেকে। রেইলের কাছে তরুণ এক দম্পতি ধীরে ধীরে নেচে চলেছে। বার কাউন্টারের উপর একটা টিভি চলছে, গম্ভীর চেহারায় দুই জকি রাগবি টুর্নামেন্টের কমেন্ট দিচ্ছে!

কাউন্টার থেকে সোহানার জন্য ডায়েট কোক নিল রানা, নিজের জন্য বিয়ার। ঘুরে দেখল, সোহানা পুলের দিকে চেয়ে। ওর চোখ অনুসরণ করল রানা, পাশে পৌঁছে কোকের গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

'লোকটার নাম স্ট্রাথার হ্যালেক,' গ্লাসটা নিল সোহানা। 'টেণ্ডারে আমার পাশে বসেছিল।'

লোকটা রেইলিঙের পাশে একটা স্টুলে বসেছে, হাতে গরম চায়ের কাপ। কার দিকে যেন চেয়ে আছে। তারপর মৃদু হাসল। চেহারা দেখে মনে হলো অন্যদের তুলনায় নিজেকে সে অনেক উঁচু পর্যায়ের লোক ভাবছে।

'বুঝতে পারছি না হঠাৎ গলফ ক্লাব পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন,' বলল রানা। 'মনে হয় না ও গলফ খেলে। আর জাহাজে ওই জিনিস দিয়ে কী করবে?'

'তা-ই আসলে,' কোকে চুমুক দিল সোহানা। 'আমি ভাবিইনি এ-ব্যাপারে।'

'এই লোক খেলোয়াড় নয়,' বলল রানা। 'ওই দেখো, টিভিতে গলফ টুর্নামেন্ট চলছে, কিন্তু লোকটা একবারও ওদিকে তাকায়নি।'

হ্যালেকের দিকে তাকাল সোহানা, চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। নির্লজ্জের মত ওরই দিকে চেয়ে আছে।

'লোকটা চোখ দিয়ে মেয়েদের গিলতে চায়,' বিরক্ত স্বরে বলল সোহানা।

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল রানা। এইমাত্র জাহাজের ক্রুজ এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর পুল ডেক-এ ছুটে এসেছে। উঁচু গলায় কথা বলে মহিলা। এসেই তিনবার বলল, তার নাম লিলি ল্যাংট্রি।

‘বিংগো! বিংগো! বিংগো!’ চারপাশটা দেখে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, ভাব দেখে মনে হলো জাহাজে টর্পেডো আঘাত হেনেছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, ‘একটা কথা জেনে নিন! আজ ক্রিস্টাল লাউঞ্জে বিংগো রাত আপনাদের জন্য। প্রথম দুটো কার্ড আমরাই সরবরাহ করব। আপনারা যদি বিংগো-বিংগো না খেলেন, তা হলে জীবনে আর কী-ই বা থাকল!’

কান ঝনঝন করছে সোহানার। ওর কপাল ভাল, মহিলা সরে গিয়ে আরেক দম্পতির কাছে চলে গেছে। আবারও নতুন করে বিংগো বিংগো করে চেঁচাতে লাগল।

‘ওহ, বাঁচলাম!’ বিড়বিড় করে বলল সোহানা! রানার দিকে চাইল। ও পুলের আরেকদিক দেখছে।

‘স্ট্রাথার হ্যালেক চলে গেছে, নিচু স্বরে বলল রানা।

‘ওই মহিলার চিৎকারে ভেগেছে হয়তো,’ হেসে ফেলল সোহানা।

লাভ অ্যাট সি’র ব্রিজে হাজির হয়েছেন ক্যাপ্টেন জন ডানহিল । শক্তপোক্ত মানুষ তিনি, বয়স পঞ্চাশ মত। ক্যাপের সোনালী ব্রেইড, কাঁধের এপলেট ও সাদা ইউনিফর্ম তাঁকে হ্যাণ্ডসাম করে তুলেছে। ডানহাতে দুটো ম্যাসেজ বল নিয়ে ব্যায়াম করছেন। একগাদা ইন্সট্রুমেন্টের সামনে বসে রয়েছে ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ব্র্যাডলি ও ন্যাভিগেটর জর্জ অ্যাডামস। তাদের সামনে বড় একটা কম্পিউটারের ডিসপ্লে, ওটার কারণে জাহাজের ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখা যায়। মেইন কম্পিউটারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, একটা কম্পিউটারাইজড কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন ডানহিল।’

‘গুড মর্নিং,’ খুশি মনে বললেন ক্যাপ্টেন।

ফাস্ট অফিসার ফোনের একটা রিসিভার নামিয়ে বলল, 'আমরা মেরিনা বন্ধ করছি, স্যর।

'হার্বার প্যাট্রলও তাই বলেছে -আমর সব সিস্টেম কনফার্ম করেছি,' বলল ন্যাভিগেটর জর্জ অ্যাডামস। ক্যাপ্টেনের হাতে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিল সে। 'ওগুলো প্রথমদিকের কোঅর্ডিনেশন, ক্যাপ্টেন।'

কাগজগুলো নিয়ে ব্রিজের জানালার কাছে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, গাঢ় নীল সাগর। আরেকটু উপরে চোখ তুললেই মেঘহীন ফ্যাকাসে-নীল আকাশ। অনেক দূরে আকাশ ও গাঢ় নীল সাগর দিগন্তে মিশেছে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কাগজগুলো দেখলেন ক্যাপ্টেন, ঘুরে তাকালেন। প্রথমে অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা। তারপর ক্যারিবিয়ান সাগর চষে বেড়ানো। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ফার্স্ট অফিসার, কী-বোর্ড টিপে কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিল। 'দুটো ইঞ্জিন পঞ্চাশ পার্সেন্ট গতি তুলেছে, স্যর।'

'তা হলে এবার জাহাজ নিয়ে রওনা হও,' বললেন ক্যাপ্টেন।

মস্ত ডিজেল ইঞ্জিনগুলো কাজ শুরু করেছে। বিশাল জাহাজের একেবারের নীচের দুটো ডেকে সামান্য কম্পন পাওয়া যাবে, সেটাও তেমন কিছু নয়। প্রপেলার দুটো হাজার হাজার গ্যালন পানি কেটে ঘুরতে শুরু করেছে।

ধবধবে সাদা বিশাল জাহাজ, লাভ অ্যাট সি রাজকীয় ভঙ্গিতে রওনা হয়ে গেল সাগর চিরে।

হৈ-চৈ এড়াতে পুল-ডেকের এক কোণে চলে গেছে সোহানা, চুপচাপ একটা ডেক-চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে আছে। ওদিকে রানা নেমেছে সুইমিং পুলে, বলে গেছে দু'মাইল সাঁতরে উঠে পড়বে।

শেষ অ্যাসাইমেন্টটা মনে পড়ছে সোহানার, রানার সঙ্গে লাইবেরিয়ায় ছিল ও। ইউএনও-র সহজ অ্যাসাইনমেন্ট, কিন্তু জনবিরল এলাকায় পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়ে হাঁপিয়ে যায় ওরা। ওদের দু'জনের আলাপের নতুন কিছু ছিল না। ইউএনও-র আরেকদল ওখানে যাওয়ার পর দেশে ফেরে ওরা।

না চাইতেই মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ছুটি দেন ওদের। রানা চলে যায় লস অ্যাঞ্জেলেসে, রানা এজেন্সির কাজ নিয়ে। তার পাঁচ দিন পর ওখানে রানার সঙ্গে দেখা করে ও।

রানা অপেক্ষা করছিল, ওকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। বলেছে, ওকে সারপ্রাইজ দেবে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বিমানে মায়ামিতে পৌঁচেছে ওরা। সেখান থেকে বড় বিমানে করে হাইতি। এরপর খুদে এক এয়ারলাইন্সের প্লেন। নেমেছে স্যান হুয়ানে। সারারাত জাগতে হয়েছে। যখন সেইন্ট কিটস-এর গোল্ডেন রক এয়ারপোর্টে নামল, সূর্য মাত্র উঠেছে। অতি পুরানো এয়ারপোর্ট-দালানে ঢুকে ভয় পেয়েছে ও, ধারণা করেছিল নিশ্চয়ই ওদের সুটকেস-ব্যাগ সব হারিয়েছে; কিন্তু ঠিকঠাক পেয়েছে সবই।

সেইন্ট কিটস আসবার পথে বিমানে ক্রুজ শিপের কথা শুনে অবাক হয়ে রানাকে বলেছে ও, 'জাহাজ? লাভ অ্যাট সি? আমরা সাগরে ঘুরে বেড়াব?'

'আমাদের ছুটি, ভুলে গেছ?' বলেছে রানা।

একটু আগেই ও বলেছে, ‘রাহাত আঙ্কেল যদি জানতেন আমরা এখানে ছুটিতে এসেছি... চাকরি নট করে বিয়ে পড়িয়ে দিতেন।’

‘হয়তো মন্দ হতো না তা হলে,’ বলেছে রানা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সোহানা ভাবল, রানা যদি সত্যি একবার বলে? কী করবে ও? হাসবে? খুশি হবে? আপত্তি করবে? যে বিরাট মনের বেপরোয়া যুবকটিকে ও ভালবাসে, সংসারে কেমন হবে? মানুষটা বদলে যাবে? পরে ওরই যদি মনে হয়। আগের সেই মানুষটি আর নেই? তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা: রানার যদি এই বেপরোয়া জীবনটা হারিয়ে আফসোস হয়? মনে মনে দোষ দেয় নিজেকে?

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সোহানার অন্তর থেকে। নিজেকে বলল, থাক না, এ নিয়ে না-ই বা ভাবলাম। ভালই তো আছি। যেমন এখন। চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল ও, গাঢ় নীল সাগর চিরে চলেছে আমাদের জাহাজ, যাকে ভালবাসি সে তো কাছেই রয়েছে। কোনও নারী এর বেশি আর কী চাইতে পারে!

সূর্যের মৃদু তাপে আরাম লাগছে ওর, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর সূর্য হারিয়ে গেল। রানা হতে পারে না, বোধহয় কোনও পাহড়পর্বত হবে। বিরক্ত হয়ে সানগ্লাস খুলল সোহানা, পত্রিকা থেকে চোখ তুলে দেখল ভীষণ মোটা সেই লোক -জাহাজে উঠবার আগে টেণ্ডারে যে ওকে দেখছিল। লোকটা রানার একপাশে বসেছিল। পরনে এখন ও ফ্যাট বাস্টার টি-শার্ট। দু’হাতে দুটো কোন আইসক্রিম নিয়ে দাঁড়িয়ে। জিভ দিয়ে একটা থেকে আইসক্রিম তুলছে। অন্যটা বাড়িয়ে ধরেছে। আইসক্রিম গলে সোহানার হাতে ধরা পত্রিকার উপর টপটপ করে রস পড়ছে।

‘এটা তোমার জন্য এনেছি,’ আইসক্রিম আরও বাড়িয়ে দিল ভিক্টর। ‘আমি ভিক্টর হিগিন্স।’

আইসক্রিম না নিয়ে উপায় থাকল না সোহানার, না নিলে ওর গায়ে পড়বে এবার। নিল ও।

‘তুমি, তোমার বয়ফ্রেন্ড, আমার বউ রুবি, আর আমি -মানে আমরা কয়েকজন আজ রাতে একই টেবিলে বসব,’ বলল ভিক্টর হিগিন্স। ‘রুবিই ব্যবস্থা করেছে।’ লোকটা আশা করছে এ খবর পেয়ে মেয়েটা খুশি হবে। ‘আমাদের টেবিল ক্যাপ্টেনের টেবিলের কাছেই।’

আঠালো আইসক্রিম দ্রুতই গলছে, যতটা পারা যায় গা থেকে সরিয়ে রেখেছে সোহানা। বিরক্ত বোধ করছে, মাথায় আসতেই তাড়াতাড়ি করে বলল, 'রুবি কোথায়?’

নিজের আইসক্রিম দিয়ে একদিক দেখিয়ে দিল ভিক্টর। 'ওই তো, ওখানে!’

ওদিকে তাকাল না সোহানা। মনে মনে বলল, হায় আল্লাহ, এরা কি পুরো সময় আমাদের সঙ্গে থাকবে? নিজেকে বলল, দরকার হলে কঠোর হতে হবে। রানাকে বললে এ লোককে খসিয়ে দেবে। আপাতত সূর্য আটকে ঝুঁকে আছে এ, আইসক্রিম গছিয়ে দিয়ে বিপদে ফেলেছে, কিন্তু এরপর কী করবে কে জানে! কিছু বলছেও না, এদিক ওদিক দেখছে আর আইসক্রিম চাটছে!

এক মিনিটও পার হয়নি, স্বামীরই মত ফ্যাট বাস্টার টি-শার্ট পরনে হাজির হলো রুবি হিগিন্স। এর হাতে আধ গ্যালনের পেপার টাব। ভিতরে আইসক্রিমের মধ্যে ডুবে আছে প্লাস্টিকের চামচ। সোহানার হাতে চুপসানো

আইসক্রিম দেখে জিজ্ঞেস করল রুবি, 'ভুল স্বাদ আর ফ্লেভারের জিনিস নিয়ে ফেলেছ?'

'আইসক্রিমের মুড নেই এখন,' বলল সোহানা।

'তা হলে এটার মধ্যে দিয়ে দাও' আগ্রহ নিয়ে বালতি এগিয়ে দিল রুবি।

তা-ই করল সোহানা । রুবি একটা পেপার ন্যাপকিনও দিয়েছে ওকে, ওটা দিয়ে হাত পরিষ্কার করল। কয়েক টুকরো কাগজ ত্বকের সঙ্গে রয়ে গেল। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল প্রায় আটকে গেছে। চট চট করছে হাত। ডায়েট সোডা ঢেলে হাত ধুলো সোহানা। ভাবল, দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল জাহাজে উঠে এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, সেটা কে জানত!

রুবি কোনের ধ্বংসাবশেষ খেয়ে নিজের টাবের আইসক্রিম শেষ করছে এখন। 'ভিক্টর, সূর্য থেকে সরে এসো,' বলল সে। 'মনে নেই তুমি রোদে গেলে শুকিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে যাও।'

বিশ কেজি মাংস ঠাসা কাঁধ দুটো উঁচু করে ঝাঁকাল ভিক্টর।

'আমার ভিক্টর ছাদ তৈরির কন্ট্রাকটার,' বলল রুবি, 'কিন্তু কাজটা ওর ছাড়তেই হবে।'

'রোদে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'নিউ জার্সিতে ছিলাম,' মাথা দুলিয়ে বলল ভিক্টর। 'সূর্য-রোদ বড় কথা নয়, আসলে সমস্যা হয় ওখানে তুষারের জন্যে।'

'আমাদের প্রথম বিয়ের কথা বলছে ও,' বলল রুবি। 'চোখে স্বপ্নালু একটা ভাব দেখা গেল। ভিক্টর, মনে পড়ে সে-সময়ের কথা?'

''নিশ্চয়ই, পুতুল, দেখতে দারুণ মিষ্টি ছিলে তুমি।'

‘আমাদের সেই প্রথম বিয়ে!’ মৃদু হেসে সোহানাকে দেখল রুবি। তারপরই তো ডিভোর্স করলাম আমরা দু’জনকে। সেসময় অন্যরকম ছিলাম আমরা।’

জোরেশোরে মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর। ‘আমরা তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম। কোনও মত মিলত না আমাদের। দুজন ভাবতাম, আমিই ঠিক বলছি, অন্যজন ভুল করছে।’

‘পরে আমরা বুঝেছি, আসলে দুজনই ভুল করেছি,’ বলল রুবি।

মাথা দোলাল ভিক্টর। ‘আমরা বুঝতে পারি, আমাদের ওই একটা ব্যাপারে মত মিলে গেছে!’

‘কাজেই আপনারা আবার বিয়ে করেন?’ বলল সোহানা।

‘ভিক্টর ছিল তখন অরেঞ্জ কাউন্টিতে,’ বলল রুবি, ‘ভারী যন্ত্রপাতি বেচা-কেনা করত। আমার এক খালাত বোন ইউকলা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে বলে ওকে দেখতে পশ্চিমে যাই আমি। হঠাৎ মনে হলো মোটকা গুঁড়ির মত লাশটাকে একবার দেখে যাই। তারপর নিউ জার্সি আর ফিরে যাওয়া হয়নি আমার। তিনদিন থাকব বলে ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে এসেছিলাম, ওরা হয়তো এখনও আমার জন্য হা-হুতাশ করছে!’

এদের সঙ্গে সাপার করতে খারাপ লাগবে না, বুঝে গেছে সোহানা। মৃদু হেসে বলল, ‘এবার রোদটা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ালে কেমন হয়?’

দুই

সেই রাতে স্ট্রাথার হ্যালেক ক্লজিট থেকে গলফ ব্যাগ ও ক্লাবগুলো বের করল -পরীক্ষা করে দেখল ওগুলোর উপর কেউ কারিগরি করেনি। ক্লাবগুলো সরিয়ে রাখল সে, স্ক্রু-ড্রাইভার বের করল, তারপর ব্যাগটা উল্টো করে কাজে লেগে গেল -ব্যাগের নীচের বল্টুগুলো খুলছে একে একে। এতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। শেষপর্যন্ত ব্যাগের তলাটা খুলে এল। ওখান থেকে বের হলো প্লাস্টিকে মোড়া অনেকগুলো গলফ বল।

এবার প্যাঁচ খুলে ড্রাইভারের মাথা খুলে ফেলল সে। ফাঁপা ক্লাবগুলোর ভিতর থেকে খুদে ইলেকট্রনিক টাইমার, ডিটোনেটার, নানা রঙের সরু তার বের হলো।

ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিল সে, ওটার উপর দাঁড়িয়ে ছাদের একটা প্যানেল সরিয়ে দিল। ফোকরের ভিতর কয়েক বাণ্ডিল নানান রঙের অপটিক ফাইবার রয়েছে। তারগুলো একেকদিকে চলে গেছে। ওগুলোর ভিতর থেকে কয়েকটা তার বেছে নিল হ্যালেক, চওড়া হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে।

লাভ অ্যাট সি'র ডাইনিং রুমে উৎসবমুখর পরিবেশ, চারদিক সুন্দর করে সাজানো। আড়াই শ' যাত্রী ওখানে খেতে বসেছে। একটা ব্যান্ড দল যন্ত্রে রে-গে সুর তুলেছে, ওয়েটাররা ব্যস্ত হয়ে মেইন কোর্সের প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে গেছে। আরেকদল ট্রে ভরা ডোযার্ট নিয়ে এল।

ভিক্টর ও রুবির সঙ্গে একই টেবিলে বসেছে সোহানা ও রানা। ওদের পাশে বসেছেন যমজ বোন, জুলি ও ক্যারল। টেক্সাসের কাউবয় অঞ্চলের মানুষ তাঁরা। বয়স ষাটের কোঠায়, তবে সত্তরের বেশি কাছে, বিয়ে-থা করেননি। পরের টেবিলে বসেছে মিষ্টি এক মেয়ে, বয়স তেরো-চোদ্দ হবে। পাশে বসা বাবা-মা -নাম উইন্ট্রি ও সিয়েরা। তাদের পাশে রয়েছে অভিজাত চেহারার এক দম্পতি -সোফিয়া ও ক্যাভিস গর্ডন। তাদের পাশেই স্পেন থেকে আসা অ্যানিটা ও য্যান্ড্রো। হানিমুন করতে এসেছে ওরা। পুল ডেকে ওদের নাচতে দেখেছে সোহানা। নিজেদের নিয়ে একেবারে ম্যস্ত হয়ে আছে ওরা। পরস্পরের চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

মোটা রুবি হিগিন্স চুপচাপ খেয়ে চলেছে, কোনও দিকে তাকানোর সময় নেই তার। ওয়েটার ট্রে ভরা ডেযার্ট নামাতেই নিজের সামনে ওটা টেনে নিল সে। ওয়েটার আপত্তি তুলতে চাইল, কিন্তু রুবির দাঁত খিচানো দেখে কেটে পড়ল। ভিক্টর ও সোহানা সামান্য ডেযার্ট নিল। মনে হলো রানা চিন্তিত। আসলে এত লোকের মধ্যে ভাল লাগছে না ওর, ভাবছে, সোহানাকে নিয়ে সরে যেতে পারলে ভাল হয়।

প্লেট থেকে একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে মন্তব্য করল রুবি, 'অনেকে ধারণা করে ঘি-মাখন খাওয়া খুব খারাপ।' মাথা নাড়ল সে। 'আসল কথা, চিকন হতে চাইলে তেল-চর্বি-মাংস কিছু খাওয়া চলবে না। এই হচ্ছে মূল কথা।'

'এটাই আসল কথা,' জোর দিয়ে বলল ভিক্টর। 'মানুষের দেহ আসলে বিরাট একটা কম্পিউটার।' বলার ভঙ্গিতে মনে হলো কথাটা আগে সে কোথাও শুনেছে।

মাথা দোলাল রুবি। কেউ ফ্যাট না খেলে দেহের সেন্ট্রাল মেইনফ্রেম ধসে পড়বে। ধুপ করে পড়ে সব শেষ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্য চর্বি জমিয়ে রাখা ভাল । সেজন্যই আমরা ফ্যাট বাস্টাররা বলি, চর্বি আমাদের বন্ধু!'

'কিন্তু সেরা বন্ধু না,' সাবধান করল ভিক্টর।

'তা ঠিক, কিন্তু ভাল একজন বন্ধু,' বলল রুবি।

পাশের টেবিলের মিষ্টি মেয়েটির দিকে চোখ গেল রানার। আমেরিকান সাইন ল্যাংগুয়েজ-এ মার সঙ্গে কথা বলছে ও। ওটা রানাও জানে, আগ্রহ নিয়ে শিখেছিল। বোঝা গেল, মেয়েটি প্রতিবন্ধী। এটাও বোঝা গেল, ও ঠোঁট পড়তে পারে।

'একটা ডেযার্ট,' ইঙ্গিতে তার মা জানাল। 'ওই একটাই। ওই মোটা মহিলা যত খুশি খাক আর যা-ই বলুক।'

রানা আন্দাজ করল, মেয়েটি ঠোট নড়া দেখেই রুবির বক্তব্য বুঝেছে। একটু দূরের এক টেবিলে জোরে ঠন-ঠনাৎ করে কী যেন পড়ল। কারও প্লেটের ফর্ক। ওদিকে তাকাল ভিক্টর ও রানা। লোকটা চেয়ার ছেড়ে একদিকে ছুটছে।

'বমি করবে,' আন্দাজ করল ভিক্টর। 'প্রথম রাতে জাহাজে এমন হয়। পরে সয়ে যায়। ... রুবি, মনে পড়ে, সেই প্রথম রাতে ...'

রুবি এমন চেহারা করল যে মনে হলো, ওসব আর ভাবতে চায় না। ব্যান্ডের বাজনা শেষ হয়েছে, কেউ কেউ হাততালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করল। স্পেন থেকে আসা অ্যানিটা ও য্যান্ড্রো পরস্পরে মজে আছে। মাইক্রোফোনে বিশ্রী আওয়াজ হলো। জাহাজের ক্রুজ এন্টারটেইনমেন্ট

ডিরেক্টর লিলি ল্যাংট্রি হাজির। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে উঠে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল সে।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' মিষ্টি করে বলতে চাইল, কিন্তু তার কণ্ঠ যেমন কড়া তেমনই তীক্ষ, কানে গেলে চমকে ওঠে মানুষ। 'আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। কে না দেখতে চাইবে শতশত মিলিয়ন ডলারের জুয়েলারি!' শ্রোতাদের তরফ থেকে হই-হই শুনবার জন্য অপেক্ষা করল সে, কিছু জুটলও। 'আজ রাতে এই জাহাজে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমেরিকার সেরা জুয়েলাররা। তারা তাদের অপূর্ব হীরা-জহরতগুলো আপনাদেরকে প্রদর্শন করবেন। ইচ্ছে করলে আপনারা ওগুলো কিনতেও পারবেন।' এবার আগের চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া গেল।

ব্যাণ্ড দল আরেক মেজাজের বাজনা ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অপূর্ব সুন্দরী পাঁচ তরুণী হাজির হলো। তারা দু'হাতে ডিসপ্লে-কেস ধরে হেলেদুলে টেবিলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ওগুলোর ভিতর হীরার আংটি, দুল, ব্রেসলেট ও নেকলেস জ্বলজ্বল করছে। স্পটলাইটের আলোয় হীরাগুলো ঝিকমিক করছে। ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশে পাথরের টুকরোগুলো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় হীরাগুলো বরফের তৈরি অঙ্গার।

ষাটোর্ধ্ব জুলি চোখ সরাতে পারছেন না। 'ওগুলো হীরা...' শ্বাস আটকে যাওয়া স্বরে বললেন, পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন।

'ছুঁতে যেয়ো না, জুলি,' সাবধান করলেন তার বোন।

'একবার হীরাগুলো ছুঁয়ে দেখতে পারলে...'

'জুলি!' কড়া স্বরে ডাকলেন ক্যারল।

পাশের টেবিলে বসে আছেন গর্ডন, একইসঙ্গে হীরা ও মডেল দেখছেন -চেহারায় প্রশংসা ফুটে উঠেছে। হীরার উপর থেকে চোখ সরিয়ে কফিতে চুমুক দিলেন তাঁর স্ত্রী। কিছুদিন হলো তিনি ধূমপান ছেড়েছেন।

স্ত্রীর দিকে তাকালেন গর্ডন। 'এর কিছু তোমার জন্য নেয়া যেতে পারে।'

'আমার এখন এসবের চেয়ে একটা ফিল্টার ছাড়া বেনসন...' খপ করে মুখ বন্ধ করলেন সোফিয়া।

'হানি, তুমি নিকোটিন প্যাচ পরোনি?'

সোফিয়ার চেহারা তিক্ত হয়ে গেল, কড়া স্বরে বললেন, 'ওই প্যাচ-পুচ কোনও কাজে আসবে না! ওটা মুড়িয়ে আগুন ধরালে ধোঁয়াটা যদি কাজে লাগে!'

কিশোরী মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে পেস্ট্রিগুলোর দিকে চেয়ে আছে। মা'র দিকে পিঠ দিল সে, বাবার দিকে চেয়ে ইশারা করল। জবাবে বাবাও সাইন দেখাল, কিন্তু তার চেহারা কঠোর।

মন খারাপ হয়ে গেল মেয়েটির সামনে থেকে প্লেট সরিয়ে দিয়ে আবারও বাবাকে দু'হাতে সাইন দেখাল।

ব্যাপারটা সোহানাও খেয়াল করেছে, দেখল রানা ইশারায় কথা বলছে। কিশোরী প্রথমে চুপ করে ছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে কেউ আলাপ করতে চাইছে দেখে হেসে ফেলল -ইশারায় কথা শুরু হলো।

নিঃশব্দ আলাপের ফাঁকে সোহানা বলল, 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কাজের কাজই করেছ।'

‘ওর মন-খারাপ কাটাতে চাইছি,’ মৃদু হেসে বলল রানা। ওর নাম ন্যান্সি।’ কিশোরী ইশারা করছে। আলাপের ফাঁকে সোহানার জন্য অনুবাদও করছে রানা। ‘ও জানতে চায় তুমি আমার বোন কি না।’

‘ব্যাপারটা ওকে নরম করে বুঝিয়ে দাও,’ বলল সোহানা।

রানার বলা শেষ হতেই ধরে বসল সোহান, ‘কী বললে?’

বললাম, ‘আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি।’

উত্তরে কিছু বলল মেয়েটি।

‘মেয়েটা বলছে তুমি খুবই সুন্দরী,’ বলল রানা। ‘তোমার বাচ্চারাও খুব সুন্দর হবে।’

ন্যান্সির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল সোহানা, বলল, ‘ধন্যবাদ, ন্যান্সি।’

পাল্টা হাসল কিশোরী।

সোহানাকে চিন্তার খোরাক দিয়েছে ও। বাচ্চার মা হিসেবে নিজেকে ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেল সোহানা। চট করে রানার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

‘ভাল মা হবে তুমি,’ নিচু স্বরে বলল রানা।

‘জানি না,’ প্রায় ফিসফিস করল সোহানা, চামচটা আগেই বাটিতে থেমে গেছে। কী যেন ভাবছে ও, তারপর চোখ তুলে চাইল রানার চোখে।

'ন্যান্সি বলছে, তুমি সত্যিই খুব ভাল মা হবে,’ বলল রানা।

সোহানা ভাবল, তা হলে এ তোমার কথা নয়? এক পলকের জন্য অভিমান হলো ওর, একটু হতাশাও। দীর্ঘশ্বাস চাপল। জানে, ওদের পেশায় সংসার হয় না।

সোহানার চোখে কী যেন, ভাবল রানা। বুঝতে পারছে, হালকা কিছু বলে পরিস্থিতি সামলে নেয়াই ভাল। কিছু বলতে গেল, কিন্তু ওর পাশ থেকে উঠে দাড়াল মোটা ভিক্টর হিগিন্স -এক হাতে মুখ চেপে ধরেছে। যে-কোনও সময় বমি করবে। টলতে টলতে সামনে বাড়ল। এক লাফে তার পাশে চলে গেল রানা, হাত ধরে দ্রুত এগোল। পিছনে চলেছে রুবি ও সোহানা।

ডাইনিং হল ফেলে দু-মিনিট পর খোলা ডেকে পৌঁছল ওরা। ভিক্টর হিগিন্সকে রেইলিঙের পাশে নিয়ে গেল রানা। লোকটা উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ল, হড়হড় করে বমি ঢালছে সাগরে।

স্ট্রাথার হ্যালেক কালো ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ইঞ্জিন রুমের দিকে এগিয়ে চলেছে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আইডি কার্ড সিকিউরিটি স্লট-এ দিল। সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। বিশাল স্টিম টারবাইনগুলো চলছে, হিসহিস করছে। স্টিলের ভার্টিকাল মইগুলো গ্রেটওয়ার্কের নানাদিকে গেছে। মাথার উপর ক্যাটওয়াক দেখতে পেল হ্যালেক। ইঞ্জিন রুমে ঢুকে হনহন করে এগিয়ে চলল সে। মনে হলো ইঞ্জিনের আওয়াজ আর ও বাড়ছে। কিছুক্ষণ পর ওই শব্দে কানে তালা লেগে গেল।

হ্যালেক এরইমাঝে দু'জন লোকের আলাপ শুনতে পেয়েছে। কপাল ভাল মুখোমুখি হওয়ার আগেই তাদের গলার আওয়াজ শুনেছে। আড়াল নিয়ে এগোল সে, আধমিনিট পর একপাশের দেয়ালে ইমার্জেন্সি ফায়ার স্প্রিঙ্কলার দেখল। ওটা একটা মইয়ের পাশে, খানিকটা উপরে। ব্যাগ কাঁধ থেকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে, ভিতর থেকে এক ফুটি জিমি বের করল, ওটা নিয়ে মই বেয়ে উঠে ফায়ার স্প্রিঙ্কলারের ক্যাপ খুলে ফেলল। ছিটকে বেরিয়ে

এল পানির স্রোত। খুব বেশি জোরে নয়, তবে ইঞ্জিনিয়ারদের। কম্পিউটারাইযড ট্রাবলশুটিং মনিটরে ওটা ধরা পড়বে।

মই থেকে নেমে এল হ্যালেক, ব্যাগটা তুলে নিয়ে চোখের আড়ালে সরে গেল।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে যেতেই ইঞ্জিনিয়ারদের একজন মনিটরে ইলেকট্রনিক সার্কুলেশন প্ল্যানের একটা অংশ দেখে চমকে গেল। তাড়াতাড়ি সঙ্গীকে দেখাল। ‘ওটা আবার কী!’

আস্তে করে মাথা নাড়ল দ্বিতীয়জন, জানে না কী ঘটেছে। হাতের ইশারা করল, রওনা হয়ে গেল পরীক্ষা করতে। তারা দু’মিনিট পর ইমার্জেন্সি ফায়ার স্প্রিঙ্কলারটার সামনে থামল। প্রথমজন বলল, ‘ধূর শালা!’

মইয়ের পায়ের কাছে পানি পড়ছে। স্প্রিঙ্কলারের ক্যাপ নেই, খুঁজতে শুরু করল তারা। বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ব্যাটাদের আক্কেল দেখো। জিনিসটা ঠিক ভাবে আটকাতেও শেখেনি!’ ব্যস্ত হয়ে ক্যাপ খুঁজছে তারা, তাই স্ট্রাথার হ্যালেকের সঙ্গে দেখা হলো না।

ততক্ষণে হ্যালেক ইঞ্জিনগুলোর একটার কাছে, ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল বক্সে কিছু তারের সংযোগ দিচ্ছে -হাতে খুদে একটা কম্পিউটার, ওটার ডিসপ্লের দিকে চেয়ে রায়েছে সে।

ব্রিজে ন্যাভিগেটর জর্জ অ্যাডামস্ দ্রুত হাতে কম্পিউটারে আরও ডেটা দিল। ক্যাপ্টেন ডানহিল ও ফাস্ট অফিসার ব্র্যাডলি রেডার, স্যাটালাইট ন্যাভিগেশন ও কম্পিউটার স্ক্রিনগুলো দেখছে। হঠাৎ চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল তারা, কানের কাছে কে যেন কথা বলে উঠেছে।

‘আমি বোধহয় পথ হারিয়েছি?’ জড়ানো স্বরে বলল লোকটা।

স্ট্রাথার হ্যালেক, একটু একটু টলছে। কুঁচকে আছে তার টাই, চুলগুলো এলোমেলো।

‘আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি, স্যর,’ বলল ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি।

হ্যালেকের ভাব দেখে মনে হলো জ্ঞান হারাবে, বা ঘুমিয়ে পড়বে। জড়ানো স্বরে বলল সে, ‘এখানে অনেক বাতি দেখে মনে হলো এটাই ক্যাসিনো। একটা ড্রিঙ্ক দরকার আমার।’ অফিসারদের দিকে আশা নিয়ে তাকাল সে। ‘আপনারা কী জুয়া খেলেন?’

টলোমলো পায়ে কম্পিউটারের কাছে চলে গেল সে, পা পিছলে গেল তার। পড়েই যেত, কিন্তু একটা চেয়ারের পিঠ ধরে সামলে নিল।

একহাতে তার কনুই ধরে ফেললেন ক্যাপ্টেন, শীতল স্বরে বললেন, ‘স্যর, আমরা কি আপনাকে কেবিনে পৌঁছে দেব?’

‘ওটা কোথায় তা আমি জানি,’ তর্ক করবার ভঙ্গিতে বলল হ্যালেক। ‘বুঝতে পারছি আমাকে দেখে বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা।’ অফিসারদের একবার দেখে জানালার কাছে চলে গেল সে, অন্ধকার সগর আর আকাশ দেখল। সাবধান করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘আপনারা নিজেরা কোনদিকে যাচ্ছেন, সেটা খেয়াল করে চলবেন।’ দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে, কিন্তু টলে পড়ে গেল পাশের ডেস্কের উপর।

ক্যাপ্টেন ও দুই অফিসার অত্যাচার সহ্য করবার ভঙ্গিতে হাসল। তারা জানে এসব ক্রুজে এধরনের দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে, বেড়াতে বেরিয়ে কিছু লোক সামলাতে পারে না নিজেকে। এসব পাগলামি সহ্য করতেই হয় জাহাজের

ক্রুদের। কিন্তু এরা জানে না স্ট্রাথার হ্যালেক সেয়ান পাগল, মেইন কম্পিউটারের পিছনে কালো রঙের একটা ট্রান্সমিটার আটকে দিতেই এসেছে।

ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়েই সুস্থ হয়ে গেল হ্যালেক, নিজের কেবিনে চলে এল। একইসঙ্গে ল্যাপটপ ও পামটপ কম্পিউটারে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড পর ব্রিজের অফিসারদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল। মৃদু হাসল সে, সব ঠিকঠাক চলছে। এমন কী আওয়াজগুলো পর্যন্ত পুরোপুরি স্টেরিও।

'রেডারে সব পরিষ্কার,' বলল জর্জ অ্যাডামস। আমরা বাকি রাত নিশ্চিন্তে এগোতে পারি।'

ক্যাপ্টেন ডানহিল নির্দেশ দিলেন, 'তা হলে জাহাজ অটোপাইলটে দিয়ে দাও।'

'হ্যাঁ, সুইচ টিপে জাহাজ আমার হাতে তুলে দাও,' হাসল হ্যালেক। 'যাও, বিশ্রাম করে গিয়ে। জাহাজটা তোমরা ভাল। লোকের হাতেই তুলে দিচ্ছ।'

'অটোপাইলটে দিলাম,' ঘোষণা দিল জর্জ অ্যাডামস।

ইজি-চেয়ারে আরাম করে বসল হ্যালেক, আরেকবার মনে মনে সেটআপটা ঝালাই করে নিল। চেহারায় ফুটে উঠল খুশির ছাপ। ব্রিজের কম্পিউটারে যে ট্র্যান্সমিটার রেখেছে, ঠিক তেমনি একটা রেখেছে সে ইঞ্জিন রুমের অটোপাইলট কন্ট্রোল প্যানেলেও। এই দুটো ট্রান্সমিটার তার ল্যাপটপের সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয় তাদের উপর থেকে আসা কমিউনিকেশন সিস্টেমের ওয়ায়ারও ল্যাপটপের সঙ্গে মিশেছে। তার আনন্দ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কাজে কোনও ভুল হয়নি। জাহাজের কন্ট্রোল হাতে পাওয়া যত কঠিন হবে ভেবেছিল, তা হয়নি।

ল্যাপটপে কয়েকটা কী টিপল সে, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন কালো হয়ে গেল।

টিটকারির হাসি হাসল হ্যালেক, আপন মনে বলল, 'সময় হলেই টের পাবে বাছাধনেরা, কার নিয়ন্ত্রণে চলে জাহাজ।'

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে, ঠিক করেছে বিশ্রাম নেবে এখন। তার কাজ শুরু হবে আরও কয়েক ঘণ্টা পর। চোখ বন্ধ করল সে।

রাত আড়াইটায় ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতেই সচেতন হলো হ্যালেক।

যথেষ্ট সময় পেরিয়েছে। যেসব যাত্রী মাতাল হয়নি, তারাও খাওয়ার পর নাচানাচি সেরে যার যার কেবিনে ফিরেছে। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ইনসমনিয়াকরা বলবে সারাজীবন ধরে ঘুমাতে পারে না, কিন্তু জাহাজ খুঁজলে দেখা যাবে তারা এখন ঘুমিয়ে কাদা। যারা বলে তারা রাতের পাখি, অনেকক্ষণ হলো তারাও হাই তুলে বিদায় নিয়েছে। গভীর সাগরে এলে মানুষের এমনই হয়। পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভাবে, কী হয়েছিল কে জানে, কিন্তু খুব ঘুম পেয়েছিল। জাহাজের বেশিরভাগ -ডিউটি শেষে ঘুমাতে গেছে। ডেকগুলোতে দু'একজন থাকতেও পারে। আরও অপেক্ষা করল হ্যালেক।

রাত তিনটের সময় কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, কাধে তার কালো ব্যাগ। যাত্রীদের কেবিনগুলোর পাশ দিয়ে গেছে করিডোর, ওখানেই থামল সে, স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে এয়ার-কণ্ডিশনিং ডাক্ট খুলে ফেলল। ব্যাগে প্রায় ডজন দুয়েক গলফ বল আকৃতির বোমা রয়েছে। ওগুলো থেকে একটা তুলে নিল সে। বলের ভিতর রয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সে যে-কোনও সময় ওগুলো ফাটাতে পারবে। হ্যালেক বোমাটা ভেন্টের ভিতর রেখে গ্রিল আটকে দিল, চলল পরের ডাক্টের দিকে।

রাত চারটে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে গলফ বলগুলো স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে রাখা হয়ে গেল। ওগুলো এখন জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। রেডিও অফিসার যখন নাস্তা আনতে গেল, সে-সময়টাকে কাজে লাগাল সে, পাওয়ার সাপ্লাই কন্ট্রোল প্যানেলের ভিতর একটা গলফ বল রাখল। ওটার কারণে আসল সময়ে সমস্ত রেডিও ও স্যাটালাইট কমিউনিকেশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কাজ সেরে নিজের কেবিনের দিকে চলল সে, যাওয়ার পথে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা যাত্রী ও ক্রুদের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের দু'একজন উইশ করল। হ্যালেক জানাল, সে সারারাত জেগে এখন ঘুমাতে চলেছে। এদের কেউ জানে না মাঝরাত থেকে কী কাজ করেছে সে। সবকিছু তার জন্য সুন্দর ভাবে চলছে। সাধারণ কোনও মানুষ হলে মনে শঙ্কা আসত, কিন্তু সে সাধারণ লোক নয়। যে-কাজ করছে, সেটা তাকে করতেই হত।

ক্লান্ত হয়ে নিজের কেবিনে ফিরল সে, কাপড় ছেড়ে একটা বড় জার নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। ওটা তাকের ওপর রেখে প্রথমে হালকা গরম পানির শাওয়ার নিল, তারপর পানি ভরল টাবে। কয়েকটা বোতল থেকে ওষুধ খেল, কিছু শরীরে মাখল। ওগুলোর কয়েকটা তামা ও ভারী ধাতুর বিষ ঠেকানোর জন্য, অন্যগুলো কিলেশন থেরাপির জন্য । এগুলোর কারণে এখনও বেঁচে আছে সে। এইবার আসল থেরাপি -ও নাম দিয়েছে গ্রুপ থেরাপি। এটা রেড ইণ্ডিয়ানদের টোটকা চিকিৎসা। ওর ধারণা, একমাত্র এই চিকিৎসাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

তাক থেকে কাঁচের বড় জারটা নিল সে। ওটার চারভাগের তিনভাগ পানিতে ভরা -ভিতরে কালো কিছু নড়াচড়া করছে।

টাবে শুয়ে পড়ল হ্যালেক, আরেকবার পানির তাপ দেখে নিল -পানি যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়েছে।

জারের ভিতর থেকে কিলবিলে কী যেন একটা বের করে। বলল, ‘এবার আসল চিকিৎসা।’ কুচকুচে কালো ওই কীট তার দু’আঙুলের মাঝখান থেকে মুক্তি চাইছে। ওটার দিকে তাকাল হ্যালেক। ‘ডাক্তারগুলো মরে ভূত হোক। ...তোরা, তোরাই আমার আসল ডাক্তার।’

বুকের মাঝখানে ওটাকে নামিয়ে দিল সে। জোঁকটা তার চামড়া কামড়ে ধরেছে। সে জানে, কোনও ব্যথা পাবে না। নিঃশব্দে ওর দূষিত রক্ত চুষবে ওটা।

একে একে জোঁকগুলো বের করল সে জার থেকে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আটকে নিল। জোঁকগুলো বেশ কিছুক্ষণ রক্ত খেয়ে ফুলে উঠল। ভালবাসা নিয়ে ওগুলোর দিকে তাকাল হ্যালেক। বিড়বিড় করে বলল, ‘তোরা আমার দিকে খেয়াল রাখবি, আমি খেয়াল রাখব তোদের দিকে।’

তিন

সকালে ঘুম থেকে উঠে চারপাশে চাইল সোহানা, কেবিনে ও একা। দেয়াল ঘড়ি দেখল। সাড়ে দশটা বাজে।

‘এ-ই,’ মিষ্টি সুরেলা স্বরে ডাকল সোহানা। ভেবেছে রানা বাথরুমে।

ওখান থেকে কোনও জবাব এলো না। ও ঘুমিয়ে ছিল বলে রানা বোধহয় উপরের কোনও ডেকে গেছে। চুপ করে শুয়ে রইল সোহানা, মৃদু হাসল। ইশ... পাগলামিও করতে পারে! গত রাতে...

রানার দুষ্টুমির কথা ভেবে গোলাপি হয়ে উঠল সোহানা। দরজায় টোকার আওয়াজে উঠে বসল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে গেল। ট্রে হাতে স্টুয়ার্ড জেসন ঢুকল। চওড়া হেসে বলল, 'ভালবাসার পাখিদের জন্য নাস্তা!'

'যে অর্ডার দিয়েছে সে কই?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আমাকে বলেই চলে গেছেন, তা হলে এখানে আসেননি?' বেডসাইড টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল জেসন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

নীল-সবজেটে শান্ত সাগর চিরে এগিয়ে চলেছে ঝকঝকে সাদা জাহাজ। মাঝ আকাশের দিকে চলেছে সোনালী সূর্য। হালকা ভাবে নোনা হাওয়া বইছে। পিছনের এক ডেকে ব্যস্ত রানা, স্কিট শুটিং করছে। একের পর এক অবিরাম গুলি করছে ও, লক্ষ্যভেদ করতে একবারও ভুল হচ্ছে না।

পাম্প শটগান আবারও কাঁধে তুলে নিল ও, জানাল, 'পুল!'

জংলি কবুতর যেমন ছোটে, ঠিক তেমনি করে উজ্জ্বল হলুদ ক্লে পিজিয়ন ট্র্যাপ থেকে উড়াল দিল । এই ট্র্যাপ বিদঘুটে সব অ্যাঙ্গেল থেকে মাটির চাকা ছেড়ে। কোচ আইনুল হক সাহেবের কথাগুলো মনে পড়ল রানার, 'ক্লে পিজিয়নকে ডিঙিয়ে বন্দুকের ফোরসাইট টেনে নিয়ে যাবেন আরও সামনে, তারপর চলন্ত অবস্থাতেই ট্রিগার টিপে দেবেন আলগোছে।'

ক্লে পিজিয়নটা মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হলো।

যেসব শুটারকে গুলি করতে গিয়ে এক চোখ বন্ধ করতেই হয়, তারা অভাগা। রানা দু'চোখ খুলেই শুট করতে পারে, এর ফলে বেশিরভাগ শুটারের তুলনায় বেশি দেখে ও -বন্দুক নিয়ে তৈরিও হতে পারে দ্রুত।

আবারও প্রস্তুত হয়ে গেল রানা।

খানিক দূরে একটা ডেক-চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছে ন্যান্সি, মাঝে মাঝে রানাকে গুলি করতে দেখছে -চোখে প্রশংসা, মুগ্ধ হয়ে গেছে ও। ওর ধারণা গোটা জাহাজের সেরা লোক হচ্ছে মাসুদ রানা। তার কোনও তুলনা হয় না। মানুষটার সঙ্গে গল্প করতে পারলে দারুণ মজা হতো!

উপরের এক ডেকে বসেছে স্টাথার হ্যালেক, কফি পান করছে। শেষ সকালে নাস্তা নিয়ে বসেছে সে। যতটা ঘুম প্রয়োজন ছিল, তা পূরণ হয়নি। তার উপর কানের কাছে বন্দুকের আওয়াজে মেজাজ খিঁচড়ে উঠছে। রেলিঙের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল হ্যালেক, বিরক্ত চোখে মাসুদ রানাকে গুলি করতে দেখল। রাগ হলো তার, কিন্তু এটাও বুঝল, এই লোকটা সহজ পাত্র নয়। মাসুদ রানার জন্য মনে খানিকটা শ্রদ্ধা জন্মাল তার।

ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সোহানা, খানিকটা দূর থেকে হাত তুলল ক্যাভিস গর্ডন, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'শশশশ, সোফিয়া মেডিটেশন করছে!'

গতরাতে এই দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছে সোহানার। দুজনই তারা লম্বা, হালকা-পাতলা, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু নিজেরা সারাক্ষণ তর্ক করে। সোহানার কানে এসেছে, নিউ ইয়র্কের সেরা দুটো পরিবার থেকে এসেছে এরা।

রয়েল-ব্লু সিল্ক সুয়েট শার্ট ও সুয়েট প্যান্ট পরে ম্যাটে পদ্মাসনে বসে আছে সোফিয়া, ভাব দেখে মনে হলো বহু দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ। ‘হ্যালো, সোহানা,’ বলল ও নিচু গলায়।

‘শশশশ, ডিয়ার,’ বলল গর্ডন। ‘মনে রেখো, কথা নয়, চিত্ত স্থির রাখতে হবে।’

‘আমার চিত্ত স্থির, গর্ডন,’ বলল সোফিয়া। ও নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। ‘সর্বক্ষণ আমার মন বলছে আমি নরকে আছি।’

বুদ্ধিমতির মত একটু সরে এগোতে শুরু করল সোহানা, বলল, ‘আমি আপনাদের চিত্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না।’

‘একটু দাঁড়াও,’ প্রায় রেগে উঠল সোফিয়া। ‘আমি আর এই লোকটাকে সহ্য করতে পারছি না।’

দেরি না করে দু’হাতে স্ত্রীকে উঠতে সাহায্য করল গর্ডন, বলল, ‘আমার মনে হয় তোমার এখন হোয়াইট ওয়াইন দরকার।’

‘না, গর্ডন,’ আপত্তি ও টিটকারির সুরে বলল সোফিয়া। ‘আমি যদি সিগারেট ফুঁকতে না পারি, তুমিও ড্রিঙ্ক করতে পারবে না। তা ছাড়া, এখন মাত্র সকাল।’ সোহানার হাত ধরল মহিলা, একটু দূরের এক টেবিলে ওকে বসিয়ে দিল, নিজেও বসল। স্বামীর দিকে কড়া চোখে চেয়ে রইল।

গর্ডনের পরনে দামি সুয়েট শার্ট-প্যান্ট। তবে বোঝা গেল একটু আগে ডেকের ময়লায় গড়াগড়ি দিয়েছে সে। বোধহয় স্ত্রীকে নিজের সমস্ত জ্ঞান দান করতে চাইছে।

টেবিলের উল্টোদিকে বসল গর্ডন, গর্বের সঙ্গে বলল, ‘সোফিয়া শেষপর্যন্ত সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। আর সেজন্যই এই ট্রিপে এসেছি আমরা। মহা আনন্দে আছি।’

‘আমি দোষ থেকে মুক্ত হওয়ায় তেনার আনন্দ চলছে,’ সোহানার দিকে তাকাল সোফিয়া।

দ্বিতীয়বার আরও জোর দিয়ে বলল গর্ডন, ‘তাই তো, খুব আনন্দে আছি।’

‘তুমি আনন্দ করছ,’ খেঁকিয়ে উঠল সোফিয়া। ‘সিগারেট ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট খারাপ ছিল। কিন্তু তার চেয়েও অনেক খারাপ ব্যাপার যে তুমি সর্বক্ষণ আনন্দ করতে চাইছ।’

'তোমার তো ছাড়তে পেরে গর্ব হওয়া উচিত,’ আপত্তির সুরে বলল গর্ডন। সোহানার দিকে তাকাল সে। ‘আপনি কী বলেন?’

‘এ ব্যাপারে আমি কিছুই ভাবিনি,’ কোনও পক্ষ নিতে রাজি নয় সোহানা।

‘আমি ওসব বুঝি না, আমার একটা সিগারেট দরকার,’ বলল সোফিয়া। 'তুমি ড্রিঙ্ক করে বেড়াবে আর সিগারেটের বেলায় আমাকে...’

‘ওহ হো!' চমকে গেল সোহানা। ‘মনেই ছিল না যে রানাকে একটা কথা জানাতে হবে...’ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ও, ‘পরে দেখা হবে,’ বলেই ডেকের আরেকদিকে রওনা হয়ে গেল।

ওই ডেকে আর সোহানা থাকলই না। ভয় পেয়েছে আবারও ওকে মোড়ল মানা হবে। দ্রুত পায়ে পুল ডেকে চলে এল। ভেবেছিল রানাকে সুইমিং পুলে পাবে, নিশ্চয়ই সাঁতার কাটছে -কিন্তু ও ওখানে নেই।

সুইমিং পুলের একপাশে স্টিলের ড্রাম বাজিয়ে চলেছে দুই লোক। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল সোহানা, দেখল বড়সড় একটা ছাতার নীচে রুবি আর ভিক্টর। ওরা দুজন আয়েশ করে বসে একের পর এক হট ডগ এস্তেমাল করছে। সোহানা পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'আপনারা রানাকে দেখেছেন?'

'নাস্তার সময় আসেনি,' বলল রুবি।

'তুমিও জানো না ছোকরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ভিক্টর। 'গতরাতে বাঁচিয়েছে আমাকে, আমি কৃতজ্ঞ। তোমার সঙ্গে যাব আমি? খুঁজে দেখব?'

'কোনও দরকার নেই,' বলল সোহানা। 'পেয়ে যাব এখনই। এরা যে-কোনও সময় ওকে কিছু না কিছু খাওয়াতে চাইবে, ওখান থেকেও আরেকদিকে রওনা হয়ে গেল সোহানা।

স্পাইরাল স্টেয়ারকেস বেয়ে নেমে এল মাসুদ রানা, চলে এসেছে জাহাজের এইট্রিয়ামে। স্কিট শুটিং শেষে ন্যান্সির সঙ্গে দশ মিনিট গল্প করেছে ও, তারপর কেবিনে গিয়ে দেখেছে ওখানে সোহানা নেই। নিশ্চয়ই খেপেছে, ট্রের খাবার ছুঁয়েও দেখেনি। কে জানে, হয়তো ওকে খুঁজতেই বেরিয়েছে।

রানা বুঝেছে, কীর্তিটা ও ভাল করেনি। আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ল। এই ইয়াজদাহা জাহাজে সোহানাকে খুঁজে বের করতে হলে পুরো একটা দিন লাগবে। কাউকে পাবার সহজ কোনও পথ আছে নিশ্চয়ই। ওর এখন জাহাজের কোনও কর্মীকে দরকার, কিন্তু কেবিন থেকে বেরিয়ে তেমন কারও দেখা পাওয়া গেল না।

বলরুমে চলে এল রানা, ওখানে মডেলরা বড়সড় হীরাগুলোর ডিসপ্লে নিয়ে ব্যস্ত। খানিকটা দূরে ফটোগ্রাফারকে দেখতে পেল ও, যারা আসছে-

যাচ্ছে লোকটা তাদের ছবি তুলছে। ওর দিকে একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে আরেক দিকে চলে গেল।

মহা বিপদ! ভাবল রানা। ব্যাটা তো সময় দিল না!

'আপনিই না আমাদের মেয়ের সঙ্গে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছিলেন?' পাশ থেকে বলে উঠল এক নারী কণ্ঠ।

পাশ ফিরল রানা।

মহিলা স্বামীকে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

'আমরা ভাবতেও পারিনি এ জাহাজে এরকম কেউ থাকবে,' বলল ন্যান্সির বাবা।

'আমাদের ন্যান্সি ছোটবেলা থেকেই বধিরদের ক্যাম্পে গেছে,' বলল সিয়েরা, 'কিন্তু উইন্ট্রি আর আমি এবার ঠিক করেছি ওকে সত্যিকারের দুনিয়ায় ছাড়ব। আমরা চাই ও সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখুক।'

ভদ্রতা রক্ষার জন্যই বলল রানা, 'ও তো ভাল স্কুলেই পড়েছে।' একটু আগে ন্যান্সির সঙ্গে এসব নিয়ে কথা হয়েছে ওর।

'গত দু'বছর হলো আমাদের বাড়ির কাছে এক স্কুলে পড়ছে ও,' বলল উইন্ট্রি। 'তার আগে সবসময় বিশেষ স্কুলে গেছে।'

'ন্যান্সি নিজেকে খুব সুন্দর মানিয়ে নিতে পারে,' বলল সিয়েরা। 'সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে ও।'

'ওর মা প্রথম থেকেই ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে,' উইন্ট্রির কণ্ঠে স্ত্রীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ পেল।

'ওর বাবাও বহুকিছু শিখিয়েছে,' স্বামীর দিকে চাইল সিয়েরা।

'আমাদের পরিবারে সবাই পরস্পরের খুব কাছের মানুষ,' বলল উইন্ট্রি।

মাথা দোলাল রানা। মনে মনে বলল, পরিবার এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু আপনারা যা বলছেন তার বাইরেও কিছু আছে। আমার চোখে এমন কিছু পড়েছে, যেটা স্বাভাবিক নয়। মেয়েটিকে প্রতি পদে নির্দেশ দিয়ে জীবনটা হেল করে দিয়েছেন ওর।

'আমাদের মেয়ের বয়স চোদ্দো হলো, তাই আমরা ঠিক করেছি ওকে ক্রুজ শিপ আর সাগর ঘুরিয়ে দেখাব,' বলল সিয়েরা।

'খুব ভাল করেছেন,' বলল রানা।

ডিসপ্লে দেখার জন্য একটু আগে পাশে থেমেছে এক মহিলা। কথাগুলো শুনেছে সে, বলল, 'আমি চোদ্দো বছর বয়সী মেয়ে হলে এরকম ক্রুজ শিপে এলে বিরক্তিতে মারাই যেতাম!'

মহিলার চাঁছাছোলা কথা শুনে চমকে গেছে উইন্ট্রি।

চোখ কপালে তুলল সিয়েরা। 'ন্যান্সির কথা অবশ্য আলাদা, ও রীতিমত উপভোগ করছে...'

'আপনারা যাই বলুন...' মহিলা ছাড়বে না। 'আমি বলব...

'আসি, সোহানাকে খুঁজছি আমি,' দুই মহিলার মাঝখানে থাকতে চাইল না রানা। কোনও স্টুয়ার্ডের নাগাল পাওয়ার জন্য হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

একটা ঘরে যোগ ব্যায়ামের ভঙ্গি নিয়ে শুয়ে বসে আছে ক'জন। ক্রুজ এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর লিলি ল্যাংট্রি ক্লাস নিচ্ছে। সর্বক্ষণ বকবক করছে, সবাইকে জানিয়ে চলেছে, আসল কথা হলো মনটাকে স্থির করা, ধীরে দম নেয়া আর অল্প কথা বলা।

দ্রুতপায়ে ক্লাসের জায়গাটা পেরুতে চাইল সোহানা। ওর ধারণা, ওই ল্যাংট্রি ওকে দেখলেই ল্যাং মারবে -অর্থাৎ যোগ সাধনায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বকবক করতে থাকবে।

করিডোরের মোড় পার হলো সোহানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে নিজের নাম শুনতে পেল। মহিলা আবারও বলল: 'মিস সোহানা চৌধুরী, আপনার সঙ্গী লস্ট অ্যাণ্ড ফাউন্ড লাউঞ্জে পার্সারের ডেস্কে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি দয়া করে চলে আসুন।'

পার্সারের ডেস্ক পর্যন্ত পৌঁছুতে সাতজনের সাহায্য নিতে হলো সোহানাকে।

জেসন এদিকের কেবিনগুলোর স্টুয়ার্ড। একটা দরজার নব থেকে সাইনটা তুলে নিয়ে দেখল সে, একবার নক করল, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল -একহাতে নতুন তোয়ালে ও চাদর। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঢুকেছে সে, কিন্তু দরজাটা আটকে ঘুরেই চমকে গেল। তার চোখ দুটো পিংপং বলের মত বড় হয়ে উঠল।

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল সে। ছাদ থেকে একটা প্যানেল সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে নেমেছে কিছু তার। সেগুলো আবার যুক্ত হয়েছে একটা ল্যাপটপের সঙ্গে। জেসন অবাক হয়ে কেইলগুলো স্পর্শ করে দেখল। বুঝে গেল, এক্ষুনি কোনও অফিসারকে জানাতে হবে।

সে ঘুরে দাড়াচ্ছে, এমনি সময়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। স্ট্রাথার হ্যালেক। শীতল স্বরে বলল সে, 'আমার মনে পড়ে আমি দরজায় "ডু নট

ডিস্টার্ব” কার্ড ঝুলিয়ে রেখেছি।’ কথার ফাঁকে কয়েক পা এগিয়েছে সে, দেয়ালে ঠেস দেয়া গলফ ক্লাবটা তুলে নিল।

বোকার মত কার্ডটার দিকে তাকাল জেসন, হাসি হাসি ভাব করে পিছাতে চাইল। বলল, ‘কার্ডের এপাশে লেখা, “রুম। পরিষ্কার করুন”।’ ইঞ্চি-ইঞ্চি করে পিছানোর ফাঁকে কার্ডের উল্টোদিক দেখল সে। ওখানে লেখা: “ডু নট ডিস্টার্ব”। ‘আপনি বোধহয় কার্ডটা উল্টো করে রেখেছিলেন। হতে পারে কার্ডটা বাতাসে উল্টে গেছে, এমনও হতে পারে...’

‘এ নিয়ে আর আলাপ নাই বা করলাম আমরা,’ হ্যালেক দু’পা এগিয়ে এল, পরক্ষণে গলফ ক্লাবটা জেসনের মাথার উপর নামিয়ে আনল প্রচণ্ড জোরে।

বাচ্চাদের জন্য লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড সুন্দর করে সাজানো একটা লাউঞ্জ। এখানে নানা মুরাল রয়েছে -ভেড়া, খরগোশ, বাচ্চা হরিণ, ব্যাং, হরেক রঙের ফুল ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজানো। নিরাপদ প্লাস্টিকের খেলনাও অনেক। সব কার্পেটে ছড়িয়ে আছে। একটা সোফায় তিন পিচ্চি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বসে আছে রানা, আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে।

একটু আগে চার বছর বয়সী হিরোটি বলেছে, ‘একটু ভয় তো লাগবেই, রানা। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি।’

সাড়ে তিন বছর বয়সী মেয়েটিও রানাকে সান্ত্বনা দিল, ‘তোমার আম্মু তোমাকে ঠিকই খুঁজে নেবে। তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, লক্ষ্মী।’

দুই বছরের পিচ্চিটা এসব নিয়ে চিন্তা করছে না, ওর খেলনা ভালুক নিয়ে মগ্ন।

কিছুক্ষণ পর জানালার কাঁচে কে যেন টোকা দিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, সোহানা এসেছে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল ও। বড় বাচ্চা দুটি গুডবাই জানাল। ছোটটা জিভ নেড়ে ভেংচি কাটল।

বেরিয়ে এসে এইট্রিয়ামের ভিতর দিয়ে এগোল সোহানা ও রানা। একটু পর শপিং আর্কেডে পৌঁছে গেল ওরা। 'তোমাকে খুঁজে না পেয়ে লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ডে গেছি,' প্রায় কৈফিয়তের সুরে বলল রানা। 'তুমি তো মনে হয় নাস্তা করোনি, চলো কোথাও গিয়ে বসি।'

'বাদ দাও, দুপুর হতে চলল,' সোহানার স্বর একটু তপ্ত। 'একটু পরেই লাঞ্চে ডাকবে।'

চুপচাপ পাশে হাটছে রানা।

সঙ্গীকে দেখল সোহানা। 'তুমি নাস্তার অর্ডার দিয়ে কোথায় গেলে? আমি কেবিনে অপেক্ষা করছিলাম।'

'ভাবিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি জেগে যাবে,' বলল রানা। 'তোমাকে এত সুন্দর লাগছিল যে জাগাতে চাইনি। পরে গিয়ে দেখি তুমি কেবিনে নেই।'

'সত্যি কি আমাকে...' ধনুক ভ্রূ কোঁচকাল সোহানা। দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'আমাকে পটাতে চাইছ তুমি।'

'না,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা । নাস্তা করোনি তুমি, ডাইনিং রুমে চলো।'

পুরুষের চোখে দৃষ্টি রাখলে মেয়েরা অনেক কিছু বুঝে নেয়, সোহানাও এর ব্যতিক্রম নয়। রানা নিজেও নাস্তা করেনি বুঝে অন্তর পুড়ছে ওর। হঠাৎ তাড়া দিল ও, 'তুমিও তো কষ্ট পাচ্ছ খিদেয়। আমরা কোথায় চলেছি? আমাদের কেবিন তো ওদিকে!'

রানার কনুই ধরে উল্টোদিকে রওনা হয়ে গেল ও।

চার

সূর্যাস্তের পর সিনিয়র অফিসার হ্যারি ব্র্যাডলি ও ন্যাভিগেটর অ্যাডামস ব্রিজ থেকে ক্যাপ্টেনকে বার্তা পাঠাল, যেন তিনি দ্রুত চলে আসেন। এদিকে নিজেরা ব্যস্ত হয়ে কম্পিউটারগুলো পরীক্ষা করল, খুঁজে বের করতে চাইল দোষটা কোথায়।

একটু পর গটমট করে এসে ব্রিজে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন, বিরক্ত স্বরে বলেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, স্যর,' বলল অ্যাডামস। 'মূল কথা, আমরা কোর্স থেকে চার ডিগ্রি সরে গেছি।'

'কন্ট্রোল নিজেদের হাতে তুলে নাও,' ভুরু কুঁচকে বললেন ক্যাপ্টেন। এর অটোপাইলট ক্যানসাল করছে না কেন! জাহাজ ঠিক দিকে নিয়ে গেলেই তো হয়!'

'আমরা সে-চেষ্টা করেছি, স্যর,' বলল হ্যারি ব্র্যাডলি। 'অটোপাইলট সরছে না।'

'আবারও চেষ্টা করো,' বললেন ক্যাপ্টেন।

স্ট্রাথার হ্যালেক জাহাজের অফিসারদের সাদা ইউনিফর্ম পরেছে, হাতের ভাঁজে জ্যাকেট রেখে স্বল্প আলোকিত ডেকে পায়চারি করছে। রাতে জাহাজের এদিকটায় খুব কম মানুষই আসে। হ্যালেক ডান কানে ইয়ারপিস আটকে নিয়েছে, ব্রিজের কথাগুলো শুনছে পরিষ্কার।

‘হায় যিশু, কীসের মধ্যে পড়লাম!’ বললেন ক্যাপ্টেন। ‘একটু পর নাচ শুরু হবে ডান্সফ্লোরে, এদিকে...’

বিড়বিড় করে কী যেন বলল হ্যালেক, মনে হলো যেন নাটকের চরিত্রদের প্রমট করছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার কথা মত মেইনফ্রেম দেখেছে। ওখানে সব ঠিক আছে।’

হ্যালেকের ইয়ারপিসে হ্যারি ব্র্যাডলির কণ্ঠ শোনা গেল, ‘আমি সিমুসকে মেইনফ্রেমের ডায়াগনস্টিক দেখতে পাঠিয়েছিলাম। ওখানে সব ঠিকই আছে।’

কথাটা শুনে হেসে ফেলল হ্যালেক। সে যা ভেবেছে তাই বলছে এরা। পরের কথাগুলো কী হবে সেটাও বলে দিল সে, ‘আমাদের কারও ভুল হয়েছে। ডেকের আরেকদিকে চলে গেল সে, স্টিলের সিড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠতে শুরু করল।’

ক্যাপ্টেন ডানহিল খাড়া সিঁড়ি ভেঙে অভজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে উঠে এলেন, একটু অবাক হয়ে দেখলেন এক অফিসার আগেই ওখানে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত ন্যাভিগেটর অ্যাডামস, ভাবলেন তিনি -দ্রুত পায়ে অফিসারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ কালো। একটা নক্ষত্রও নেই।

‘আমরা এখনও কোর্স থেকে চার ডিগ্রি দুরে,’ বললেন ক্যাপ্টেন। ‘অ্যাডামস, তুমি স্যাটালাইট চেক করে দেখেছ?’

যে-লোককে ন্যাভিগেটর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হলো। ‘আপনি ব্রিজ ছেড়ে এখানে কী করছেন, ক্যাপ্টেন ডানহিল?’ স্ট্রাথার হ্যালেক টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি যদি ব্রিজে না থাকেন, তা হলে জাহাজ চালাবে কে শুনি? ওই ওরা, অ্যাঁ? ...না, ওদের ওপর

আমার ভরসা নেই, তাই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছি নিজ হাতে। জাহাজ চলছে এখন আমার নির্দেশে।'

কথাটা শুনে হতভম্ব হলেন ক্যাপ্টেন, সন্দেহ নেই বিস্মিত তিনি।

'কী বললেন? ...কে আপনি?'

'বছরের পর বছর ধরে এসব জাহাজের কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করেছি আমি,' বলল হ্যালেক। 'এ জাহাজের সিস্টেমটাও। কিন্তু যখন বিপদে পড়লাম, তখন সেভেন সি-র মালিকরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।'

'আপনি এসব কী বলছেন?' অবাক হয়ে লোকটাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন।

'বুঝতে পারেননি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যালেক। 'এ থেকে বুঝে নিন আমার অপমানের মাত্রাটা -আপনি জানেনও না আমি কী বলছি! ম্যানেজমেন্টের উপরমহল থেকে আমাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে! তাই প্রতিশোধ নেব বলে স্থির করেছি আমি, নিজ হাতে তুলে নিয়েছি জাহাজের কন্ট্রোল। কিন্তু এক জাহাজে তো দুই ক্যাপ্টেন থাকতে পারে না। নাকি পারে?'

হঠাৎই এক পা এগোল হ্যালেক, ক্যাপ্টেনকে দুহাতে ধাক্কা মেরে বসল। কাত হয়ে রেলিঙে গিয়ে পড়লেন ডানহিল। তাঁর পিছনেই থাকল হ্যালেক, পিঠে আরেকটা জোর ধাক্কা দিল। মানুষটার গতিকে কাজে লাগাল হ্যালেক। ক্যাপ্টেনের দেহ ডিগবাজি খেয়ে রেলিং পার হলো, সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

নেমে চলেছেন ক্যাপ্টেন, দু'হাতে রেলিঙ ধরল হ্যালেক, চেঁচিয়ে বলল, 'নিয়ম হচ্ছে ক্যাপ্টেন তার জাহাজের সঙ্গে ডুবে যাবে -ঠিক কি না?'

সত্তর ফুট উপর থেকে পড়লেন ক্যাপ্টেন ডানহিল । জাহাজের দু'পাশে বিক্ষুব্ধ সাগর! মানুষটি মুহূর্তে ঢেউয়ের নীচে উধাও হলেন! দ্রুতগতি প্রপেলার তাকে টেনে নেবে, পাখাগুলো কিমা করে ফেলবে গোটা শরীর!

হ্যালেক দেখল, প্ল্যাটফর্মে ক্যাপ্টেনের সোনালী সুতোওয়ালা ক্যাপটা পড়ে আছে। ওটা তুলে নিল সে, সিড়ির দিকে রওনা হবে, এমনসময় ওখান থেকে এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল।

'ক্যাপ্টেন?'

থমকে গেল স্ট্রাথার হ্যালেক।

দুই মহিলা এগিয়ে আসছে! মনে হয় যমজ দুই বোন। জুলি ও ক্যারল হাইন্স। কথা বলছে ক্যারল, 'ক্যাপ্টেন, একটু সময় দেবেন? আমার বোন আপনার সঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলতে চায়।'

দুই বৃদ্ধার দিকে চাইল হ্যালেক। এরা সম্ভবত কিছুই দেখেনি। নইলে হাউমাউ করে উঠত। পালিয়েও যেতে পারত। উল্টো এগিয়ে আসছে। এবারের মত বেঁচে গেছে সে! সৌভাগ্য এখনও তা হলে সঙ্গেই আছে!

চুপচাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যালেক, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ক্যাপ পরে নিল।

দুই বোন ওই ক্যাপের কারণে তাকে ক্যাপ্টেন বলে মনে করছে। ভুল ভাঙানোর প্রয়োজন নেই। জুলির পাশে চলে গেল হ্যালেক, একহাতে তার কাঁধ জড়িয়ে পোজ দিল। হাসছে!

ক্যারল হাইন্স টপাটপ কয়েকটা ছবি তুলল।

এদিকে হঠাৎ মাঝারি গতিতে বৃষ্টি নেমে এল। দু' বোন আর ডেকে থাকতে চাইল না, ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়েই আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল।

‘লেডিজ, ঝড় আসছে,’ পিছন থেকে বলল হ্যালেক। ‘জলদি গিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ুন!’

ইঞ্জিন রুম।

ইঞ্জিনিয়ারদের ওঅর্ক স্টেশনে কম্পিউটার মনিটরে একের পর এক ডেটা ফ্ল্যাশ হচ্ছে। কিন্তু এইমুহুর্তে ওঅর্ক স্টেশনে কোনও ইঞ্জিনিয়ার নেই। তারা এখন স্বাভাবিক ভাবেই মেইনটেন্যান্স ও মেশিনারিজ চেকআপ-এ ব্যস্ত। কম্পিউটারে যে প্রোগ্রামটা চলছে, সেটা কনফার্মেশনের জন্য থেমেছে। মনিটরের স্ক্রিনে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠেছে:

ডু ইউ উইশ প্রোগ্রাম টু কন্টিনিউ?

ওকে ক্যানসেল

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিরতি পড়ল। ইঞ্জিন রুমের কেউ কম্পিউটার ব্যবহার করছে না, কিন্তু কেউ অন্য কোথাও থেকে ‘ওকে’ বাটন টিপেছে। কাজেই কম্পিউটার প্রপগ্রাম কন্টিনিউ করল। কিন্তু ওই প্রোগ্রাম কয়েক মিনিট পর আবারও একই প্রশ্ন তুলল। থমকে গেছে ওটা। কনফার্মেশন চাইছে। কেউ ক্লিক করে ‘ওকে’ জানিয়ে দিল। প্রোগ্রাম আবারও নির্দেশ মত কাজ শুরু করল। মনিটরের স্ক্রিন খালি হয়ে গেল।

থ্রি-এ ইঞ্জিনের অয়েল লুব পাম্পের ভালভগুলো অফ পজিশনে চলে গেল।

হ্যালেকের কেবিনে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ডিজিটাল কাউন্টডাউন শুরু হলো: ১০:০০... ৯:৫৯... ৯:৫৮...

থ্রি-এ ইঞ্জিন চলছে কর্কশ আওয়াজ তুলে, থরথর করে কাঁপছে। শব্দ ও কাঁপুনি বাড়ছে ক্রমেই! মনিটরের স্ক্রিনে রশ্মির ঝিলিক উঠছে, সাবধান করবার জন্য ইলেকট্রনিক আওয়াজ শুরু হয়েছে। শব্দটা এমন, যে-কেউ চমকে যাবে। শুনলে মনে হয় ইঞ্জিন রুমে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে।

'যিযাস ক্রাইস্ট!' চেঁচিয়ে উঠল এক ইঞ্জিনিয়ার। 'কেউ ভি পাম্পগুলো বন্ধ করে দিয়েছে!'

আরেক ইঞ্জিনিয়ার রেডিও ট্রান্সমিটারে দ্রুত কথা বলছে, সামনের দিকে চেয়ে আছে-ইঞ্জিনের কয়েল থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। তার মনিটরের স্ক্রিনে লাল বাতি জ্বলছে একের পর এক! ওদিকে তাকালে মনে হয় ওখানে কেউ ক্রিসমাসের আলোকসজ্জা সাজিয়েছে।

এইমাত্র ব্রিজে বসা ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ব্র্যাডলি ও ন্যাভিগেটর জর্জ অ্যাডামসকে সাবধান করা হয়েছে। চমকে গেছে তারা। কে যেন দাবি করছে: জাহাজ এখন তার কন্ট্রোলে!

মনিটরের দিকে চেয়ে জানতে চাইল ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি, 'কী ঘটছে আসলে?' সে আশা করছে না কেউ জবাব দেবে। 'ঈশ্বর জানেন,' বলল ন্যাভিগেটর জর্জ অ্যাডামস।

'চিফ ইঞ্জিনিয়ার কোথায়?' বলল ফার্স্ট অফিসার। এবারও আশা করল না কেউ জবাব দেবে। জবাব পেলও না।

ইঞ্জিনিয়ারদের ওঅর্ক স্টেশনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও তার দুই কলিগ স্ক্রিনগুলোর ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখছে।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তিক্ত স্বরে বললেন, 'তিন আর চার নম্বর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন! ওখান থেকে সবাইকে সরিয়ে নিন!'

দেরি না করে তার নির্দেশ পালিত হলো। ক্রুরা কাঁপতে থাকা ইঞ্জিন দুটোর ভালভগুলো বন্ধ করল, বাটনগুলো অফ করে লিভারগুলো আটকে দিল। নিয়ম অনুযায়ী দ্রুত কাজ করে চলেছে সবাই, পরস্পরের দিকে খেয়াল রাখছে। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিন রুমের বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরে গেল তারা, আরও দূরে সরবার আগে রোল কল করা হলো। সবাই নিশ্চিত হলো কাউকে ফেলে আসা হয়নি।

ওদিকে স্ট্রাথার হ্যালেক তার কেবিনে। ক্যাপ্টেনের গোল্ড-ব্রেইড ক্যাপ পরে নিল সে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখল তাতে কি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রাখল, ওখানে কাউন্টডাউন চলছে: ৪:১৩... ৪:১২...

বলরুমে নাচছে অনেকে, শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে আলাপ করছে, বা ব্যাণ্ডের গান শুনছে। পুরুষরা বেশিরভাগ টুক্সেডো পরেছে। মহিলাদের পরনে নানান পোশাক। গোড়ালি ঢাকা গাউন থেকে শুরু করে মিনিও রয়েছে। আছে সি থ্রু ভাইনেল, কুচকুচে কালো থেকে শুরু করে বরফ-সাদা পোশাক বা রংধনু রঙেরও। ব্যাণ্ডের লিডার এক মহিলা, সন্ধ্যা থেকেই হারানো দিনের গানগুলো ধরেছে সে, রাত বাড়তেই ডিস্কোর দিকে চলে গেছে। ঠিক করেছে, অনুষ্ঠানের শেষদিকে নিজের কয়েকটা গান গাইবে।

নীল জর্জেট শাড়িতে সোহানাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। রানার পরনে কমপ্লিট সুট। সোফায় বসে গল্প করছে ওরা, সবাইকে নাচতে দেখছে।

‘আমাদের কালচারে এই একটা জিনিসের সত্যিই অভাব আছে, তাই না?’ বলল রানা, ‘আমরা বাঙালিরা এরকম নাচতে পারলে ভাল হতো... এই সোশ্যল ডান্সের কথা বলছি।’

হাসল সোহানা। ‘কথাটা আমাদের সমাজপতিদের কানে গেলে একেবারে কাঁইমাই করে উঠবে। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে গাল দেবে তোমাকে।’

‘যাই বলুক, এই নাচ-গান, ছেলে মেয়ের মেলামেশার সুযোগ, এসব আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের কালচারে একসময় ছিল এসব, আদিবাসীদের মধ্যে এখনও আছে...’

‘তার কারণ, ওদের মধ্যে বাইরের প্রভাব নেই বললেই চলে। আমরা নানান জাতের, নানার ধর্মের মানুষ মিলে নাচ-গান-ছবি-ভাস্কর্যকে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছি।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘আমরা যেন মেনেই নিয়েছি, আমরা খুব খারাপ; একটু সুযোগ পেলেই নষ্ট হয়ে যাব।’

একটু দূরে ন্যান্সির বাবা-মা নেচে চলেছে। উইন্ট্রি ও সিয়েরা মন থেকে রক্ষণশীল মানুষ। তাদের দিকে চেয়ে একটু অবাক হলো ওরা। নাচ থাময়ে হতভম্ব হয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে আছে তারা। ড্যান্স ফ্লোরের সামনে এসে থেমেছে ন্যান্সি, পরনে দীর্ঘ কিন্তু হালকা একটা জ্যাকেট। সোহানা ওর মা’র চোখে আতঙ্ক দেখল। মহিলা বোধহয় ভাবছে তার মেয়ে জ্যাকেটের নীচে কিছু পরেনি।

সিয়েরা ব্যস্ত হয়ে হাতের ইশারা করল। অভিমানে ন্যান্সির ঠোঁট ফুলে গেল, অন্যদিকে তাকাল সে। ধীরে ধীরে জ্যাকেট খুলছে! খুলেও ফেলল! নীচে

পরেছে লাল স্যাটিনের স্লিপ ড্রেস। বেশ সংক্ষিপ্ত পোশাক। ওর বাবা-মার চোখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে।

বাজনার উপর দিয়ে উইন্ট্রির কণ্ঠ শুনতে পেল সোহানা।

ভদ্রলোক দ্রুত হাতে ইশারা করছে, মেয়েকে কী যেন বোঝাচ্ছে। মুখেও বলল, ‘সরি, সোনা, ওই পোশাক এই অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত নয়।’ মেয়ের মনে কষ্ট দিতে চাইছে না। ‘ওই জ্যাকেট আবারও পরে নাও।’

ন্যান্সি পাল্টা ইশারা করল, বারবার মাথা নাড়ছে।

ভদ্রলোক ঠিক করছেন না, মনে মনে বলল সোহান। এখন জ্যাকেট পরে নেয়া মস্ত ভুল হবে। সবাই ন্যান্সির দিকে চাইতে শুরু করেছে। মেয়েটা নাচতে চাইলে কী ক্ষতি হবে! এখানে অনেক মহিলা ওর চেয়ে অনেক কম কাপড় পরেছে।

সিয়েরা ইশারা করছে, মুখেও বলছে, ‘ন্যান্সি তুমি কী চাও ক্যাপ্টেন তোমাকে এরকম নগ্ন অবস্থায় দেখুন?’

স্ত্রীর কণ্ঠে শক্ত ভাব দেখে আগের চেয়ে কড়া হলো উইন্ট্রি, ‘ন্যান্সি, তুমি এখনই নীচে যাবে, পোশাক পাল্টে আসবে।’

সোহানা ও রানার দিকে চাইল ন্যান্সি। চোখ সরিয়ে নিল ওরা, অন্যের পরিবারে নাক গলাবে না। ন্যান্সি ঝড়ের মত বাবা-মার পাশ কাটাল, একটানে বলরুমের ডাবল ডোর খুলে বেরিয়ে গেল। একহাতে জ্যাকেট, ওটার বেশিরভাগ মেঝেতে গড়াচ্ছে।

ওর বাবা-মা পিছন থেকে চোখ রাখল। বলরুম থেকে করিডোর, খানিক দূরে কয়েকটা এলিভেটর। একটার সামনে থামল ন্যান্সি।

উইন্ট্রি তার স্ত্রীর বাহুতে হাত রাখল। 'চিন্তা কোরো না। ও যাক। একটু পরই চলে আসবে।'

ওই এলিভেটর দেখছে তারা।

দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ন্যান্সি, কবাট বন্ধ হওয়ার আগেই রাগ করে জ্যাকেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলল।

এলিভেটর রওনা হয়ে যেতেই ন্যান্সির বাবা-মা নিজেদের নাচে মন দিল।

সোহানা মনে মনে বলল, 'আমি মা হলে নিজে এভাবে নাচতে পারতাম না।' আস্তে করে বলল ও, 'মেয়েকে এভাবে হতাশ না করলেই বোধহয়...'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বলল, 'কেবিনে ফিরবে? কিংবা কোনও ডেকে গিয়ে বসা যায়।'

'চলো ঘরে ফিরি,' বলল সোহানা।

উঠে পড়ল ওরা, এক পা এগোনোর আগেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ হলো। চমকে গেল সবাই। পুরো জাহাজ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বেশিরভাগ মানুষ হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ড্রিঙ্কের গ্লাসগুলো মেঝেতে পড়ে ভাঙছে। ব্যাণ্ডের গান আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই এ-ওর দিকে চাইল, বুঝতে চাইছে কী ঘটছে।

সোহানা পড়ে যাচ্ছে দেখে একহাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরলো রানা। ওর কানের কাছে বলল, 'চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।'

কিন্তু সুযোগ মিলল না।

আরও জোরে ঝাঁকি খেল জাহাজ, সি-স'র মত দুলতে লাগল বেদম! মনে হলো হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড়ের ঝাপটার মুখে পড়েছে বুঝি জাহাজটা!

বেশিরভাগ যাত্রী ভীষণ ভয় পেল। তার প্রধান কারণ: ক্যাপ্টেন চুপ -পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে একবারও তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল না।

যাত্রীরা জানে না ক্যাপ্টেন এখন আর জাহাজে নেই, আর কোনদিনই কাউকে সাহায্য করতে আসবেন না।

শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলো জলতরঙ্গের শব্দ তুলে টেবিল থেকে পড়ছে একের পর এক। পালিশ দেয়া মেঝেতে পড়ে যাওয়া মহিলাদের ইভিনিং গাউনে ছোপ লাগছে ড্রিঙ্ক ও খাবারের। সুদৃশ্য ছবিগুলো দেয়াল থেকে খসে পড়ছে। ব্যান্ড দল আবার বাজাতে শুরু করল। মানুষের মন অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া তাদের দায়িত্ব। কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে, সেটা ভাবেনি। এতক্ষণ কিছু লোক বিশেষ চিন্তা করেনি, কিন্তু ব্যাণ্ডের ভুতুড়ে আওয়াজ শুনে তারা ধরে নিল, নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে -জাহাজ এবার ডুবল বলে! সবাই এবার দ্রুত বলরুম ছেড়ে পালাতে চাইল।

রানা বাধ্য হয়ে সোহানাকে নিয়ে একপাশে সরে গেল।

পাশ থেকে 'হায়-হায়, গর্ডন,' বলে উঠল সোফিয়া, 'ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।'

'ভূমিকম্প হয় কী করে,' আপত্তি করল তার স্বামী।

'ঠিক আছে, ভূমিকম্প না হোক, জলকম্প তো...' সোফিয়া একটা টেবিলের দিকে রওনা হলো, 'কিংবা সুনামি! গর্ডন, এসো, কিছুর নীচে ঢুকতে হবে।'

জাহাজের ব্রিজটা থরথর করে কাঁপছে। ফার্স্ট অফিসার ব্রিজে বসে ইঞ্জিন রুমের ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখছে, টেলিফোনে জরুরি আলাপ করছে, 'ওগুলো

টিকবে না! ফিউল ভালভগুলো বন্ধ করুন!’ ব্রিজের অন্যদের বলল, ‘ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করো!’

হ্যারি ব্র্যাডলি ব্রিজে কথা বলছে, আর স্ট্রাথার হ্যালেক তার কেবিনে বসে স্ক্রিন দেখছে। ল্যাপটপে ফুটে উঠছে: ২:৩৪... ২:৩৩...

প্রকাণ্ড জাহাজ থরথর করে কাঁপছে, সেই সঙ্গে হ্যালেকের চেয়ার নড়ছে। ‘যা ভেবেছি তার চেয়েও কম সময় লাগল,’ বলল। হ্যালেক। ভাবছে, নিজের ক্ষমতা এত কম কেন মনে করত সে! চেস্ট অভ ড্রয়ারের মাথায় জোঁকের জার রেখেছে সে। ওটার দিকে তাকাল, ভিতরে পানির মধ্যে কিলবিল করছে জোঁকগুলো। ওদিকে চেয়ে আদরের ভঙ্গিতে বলল, ‘রক্তচোষার দল, আমার রক্তের বিষ টেনে তোরা সুখে থাক, আমিও টিকে থাকি! পুরো জাহাজ কাঁপিয়ে দেব আমি! তারপর সবাই বুঝবে কীসে কী হয়!’

আরাম করে ইযি-চেয়ারে বসল হ্যালেক। শেলফ ও চেস্ট অভ ড্রয়ার থেকে একের পর এক বোতল পড়ছে। ওষুধগুলো কোনও কাজের না! ওগুলো ধরল না সে, সব কেবিনের মেঝের উপর আছড়ে পড়ল। কিন্তু যখন সে বুঝল এবার জোঁকের জার পড়বে, লাফিয়ে গিয়ে ওটা রক্ষা করল। জার নিয়ে ফিরে এসে ইযি-চেয়ারে বসল, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল ল্যাপটপের দিকে।

ডিজিটাল কাউন্টডাউন শেষ হয়ে আসছে: ০:০২... ০:০১...

হ্যালেক নিশ্চিন্তে চোখ বুজল, পরমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

লাভ অ্যাট সি’র সব ক’টা ইঞ্জিন খেপে উঠেছে। ডায়ালগুলো রেড জোনে পৌঁছে গেছে। ইঞ্জিন রুমের হুটারগুলো বিকট আওয়াজ করছে। চিফ

ইঞ্জিনিয়ার নিজে বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরে এসে এদিকের ফায়ার ডোরগুলো পরীক্ষা করেছেন। সব বন্ধ করা আছে। দুর্ঘটনা হলে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে! এরপর যাই ঘটুক সব তার আওতার বাইরে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই কথাগুলো ভাবছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই তিনি চেয়ারসহ ছাতের দিকে রওনা হলেন। বিস্ফোরণের ধাক্কা চেয়ারটাকে তিনফুট উপরে তুলল, তারপর মেঝেতে আছড়ে ফেলল।

থ্রি-এ ইঞ্জিনের টেম্পার করা স্টিলের প্লেট ছিটকে উড়ে গেল। তপ্ত বাতাস ইঞ্জিন রুম ও ইঞ্জিনিয়ারদের ওঅর্ক স্টেশনের দেয়াল উড়িয়ে দিল।

ইঞ্জিনের পার্টসগুলো আর্টিলারি শেলের মত ছুটল সবদিকে । যেখানে গিয়ে লাগছে, সেখানটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে। আগেই ইঞ্জিন রুম ত্যাগ করায় ইঞ্জিনিয়ার ও ক্রুরা আহত হলো না। ইঞ্জিন রুমের একটা অংশ প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো।

একটা ইঞ্জিন বিস্ফোরিত হওয়ায় গোটা জাহাজ একপাশে কাত হয়ে গেল। এই ঘটনায় বেশিরভাগ যাত্রী যা বুঝবার বুঝে নিল। বলরুমের মেঝে হঠাৎ করেই দেয়াল হয়ে গেল। বল্টু আটকানো চেয়ার-টেবিলগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে দেয়ালে ঝুলছে। ওগুলোর উপর যা ছিল, ছিটকে নীচে পড়েছে। যাত্রীরা সোফা বা অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে হেঁচড়ে নেমে চলেছে। সোহানাকে নিয়ে এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালের গায়ে পিছলে নামল রানা।

সবার পেটের মধ্যে গা গুলানো অনুভূতি, ভাবছে জাহাজ এবার এক গড়ান দিয়েই উল্টে যাবে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড এভাবে স্থির থেকে জাহাজ এবার ফিরতি পথে কাত হতে লাগল। আসবাবপত্র আগের জায়গায় ফিরছে।

প্রকাণ্ড ঝাড়বাতিটা সিলিং থেকে খসে পড়ল। যাত্রীরা উঠে দাঁড়াচ্ছে। তাদের পায়ের নীচে পড়ে ভাঙছে ক্রিস্টাল। ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছে অনেকে, দরজার দিকে ছুটল। এ-ওকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল।

সোহানাকে নিয়ে উঠে পড়েছে রানা, সরে গিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের পাশে দাঁড়াল। এক্সিট ডোরগুলো দেখছে ওরা।

বিরাট বলরুমে কেউ কেউ চিৎকার করছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'জাহাজ আইসবার্গে ধাক্কা খেয়েছে!'

যারা টাইটানিক সিনেমা দেখেছে, তাদের অনেকে গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ ছাড়ল।

পাঁচ

ইঞ্জিন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেই চোখ বন্ধ করল হ্যালেক, দু'হাতে জোঁক ভরা জার নিয়ে বসে থাকল। শুরু হলো জাহাজের দুলুনি। একবার এদিকে কাত হয়, আবার ওদিকে। একটু পর পরিবেশ খানিকটা শান্ত হলে চোখ খুলল হ্যালেক, নিজেকে আয়নায় দেখল -ঠোঁটে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। জোঁকের জার চেস্ট অভ ড্রয়ারের মাথায় রাখল সে, ল্যাপটপের কাছে চলে গেল। দ্রুত আঙুলে কী-বোর্ড টিপল, নতুন একটা প্রোগ্রাম চালু করল, নতুন করে ডেটা দিতে শুরু করল। স্ক্রিনে জাহাজের ব্রিজের গ্রাফিকাল ছবি ফুটে উঠল।

বিদ্যুৎপ্রবাহ কমে যাওয়ায় জাহাজে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তবে বেশিরভাগ অপারেশন মোটামুটি ঠিকই থাকল। ভল্ট রুমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বদলে যাওয়ায় অ্যালার্ম সিস্টেম কাজ শুরু করল, ভল্টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমেরিকার হীরা ব্যবসায়ীদের রত্ন সম্ভার এখন নিরাপদ, কোনও লুটেরা চাইলেও ওগুলো কেড়ে নিতে পারবে না।

যে তারগুলো এলিভেটরে শক্তি দেয়, সেগুলো আর বিদ্যুৎ দেবে না- ন্যান্সির কপাল খারাপ। ওর বাবা-মা ওকে নীচে গিয়ে কাপড় পাল্টে আসতে বলেছে, কিন্তু এলিভেটর মাত্র একতলা নেমেই থামল। নয়জন পূর্ণবয়স্ক মাতাল হুড়মুড় করে এলিভেটরে উঠল। যখন বুঝল লিফট উপরে যাবে না, একজন বোতাম টিপে বেরিয়ে যেতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

মাতালদের মধ্যে আলাপ শুরু হলো, কেউ কেউ বলল এলিভেটর নীচে চলেছে। কিন্তু একজন জোর গলায় জানাল এলিভেটর উপরেই উঠবে। সে বুড়ো আঙুল দিয়ে ছাদ দেখাল। দলের সবাই দ্বিধায় পড়ে গেল। তাদের কেউ কেউ জানেও না তারা আসলে এলিভেটরে উঠেছে।

একজন ন্যান্সির উপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিতে চাইল। ওরই বলতে হবে এলিভেটর কোনদিকে যাবে। এক গাধা সকালে ন্যান্সিকে ইশারায় কথা বলতে দেখেছে। সে ফিসফিস করে সঙ্গীদের বলতে লাগল, হাত তুলে ন্যান্সিকে দেখিয়ে দিল -এই মেয়েটা প্রতিবন্ধী। ঠোঁট দেখে বুঝতে হলো না ন্যান্সির, এমনিতেই আন্দাজ করে নিল। এদের একজন ওর দিকে চেয়ে হাসল, বুঝতে পেরেছে তারা ঠিক করছে না। প্রায় একইসঙ্গে সবাই বুঝে গেল এলিভেটর নীচেই চলেছে। যে-লোক লিফট উপরে যাবে বলছিল, সে এখনও সঙ্গীদের সঙ্গে তর্ক করছে, কিন্তু সবার সঙ্গে নেমে গেল।

ন্যান্সি এখন লিফটে একা। ওর মনে হলো মাতালগুলো কয়েক ঘন্টা ধরে হুলস্থুল করছিল। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল, এলিভেটর মসৃণ গতিতে নামতে শুরু করল। বড় করে শ্বাস নিল ন্যান্সি, বাঁচা গেছে -ওর পোশাকের ব্যাপারে লোকগুলো কোনও টিটকারি দেয়নি!

কিন্তু ঠিক তখনই লিফট বন্ধ হয়ে গেল! ওটা কোনও এক তলার মাঝখানে আটকেছে! কী দুর্ভাগ্য আমার, ভাবল ন্যান্সি। বাটন টিপল ও, নীচের তলায় নামতে চাইল। কিছুই হলো না। উপরের তলায় উঠতে চাইল। বাটন টিপেও কোনও লাভ হলো না। লাল রঙের ইমার্জেন্সি বোতামটা টিপতে পারে ও, কিন্তু টিপল না। ভাবল, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই! নিজেকে বলল, আমি শিশু নই, দু'তলার মাঝখানে আটকে গেছি বলে কান্নাকাটি করব কেন!

ঠিক তখনই এলিভেটরের বাতিগুলোও নিভে গেল!

লিফটে ও একদম একা। চারপাশে রয়েছে শুধু নৈঃশব্দ -এটার সঙ্গে ন্যান্সি অভ্যস্ত -কিন্তু চারপাশ একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। ও জানে, শ্রবণশক্তি নেই বলে বেশিরভাগ তথ্য থেকে ও বঞ্চিত -কিন্তু এখন দৃষ্টিশক্তি না থাকায় অন্য সব তথ্যও মিলবে না। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখল ন্যান্সি। ইমার্জেন্সি বাটন জোরে টিপে রাখল, ওকে শেখানো হয়েছে ওটা টিপলে অনেক আওয়াজ হয়। এতক্ষণে কর্তৃপক্ষ জেনে গেছে একটা এলিভেটর আটকে গেছে। অভিমানে ঠোঁট ফুলে গেল ন্যান্সির, ওর যা খুশি হোক না, মা-বাবা বুঝবে এবার! তাদের কি উচিত ছিল না সুন্দর লাল কাপড়টা ওকে পরতে দেয়া? ও নিজের পয়সা দিয়ে কিনেছে ওটা! কিন্তু ওরা ওকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। কাপড় পাল্টে ওখানে ফিরতে হবে? ও

যদি এখন মরেই যায়, তো কী ক্ষতি হবে? সারাজীবন ধরে ওরা কষ্ট পাবে এই ভেবে যে ওকে জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে শুরু করল লিফট! এদিক-ওদিক ছিটকে সরছে ওটা! এবার সত্যিই ভীষণ ভয় পেল ন্যান্সি, গলা থেকে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার!

ব্রিজের কম্পিউটার স্ক্রিনগুলোর ডিসপ্লে থেকে ডিজিটাল আলো ছিটকে বেরিয়ে আসছে, দেখলে মনে হয় বড় কোনও শহরের আলো। কফি ভরা বড়সড় একটা পট ফ্লোরের টাইলে আছড়ে পড়ল। খয়েরী পানীয় জাহাজের সঙ্গে এদিক-ওদিক নড়তে লাগল। ওটার দিকে একবারও তাকাল না অফিসাররা -এর চেয়ে অনেক জরুরি কাজে ব্যস্ত তারা। ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি ও ন্যাভিগেটর অ্যাডামস ফোনে অন্যদের নির্দেশ দিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে নিজেরা জটিল বিষয়ে আলাপ করছে।

'অক্সিলারি ম্যালফাংশান!' ডেটা দেখে এক অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, আঙুল তুলে স্ক্রিন দেখাল। পরমুহূর্তে আরেকটা স্ক্রিনের দিকে হাত তাক করল। 'স্ট্রাকচারাল ট্রমা! মনিটরগুলো দেখুন, প্লিজ!'

'জাহাজের সবখানে পাওয়ার হারাচ্ছি আমরা,' বলল অ্যাডামস, ফোন নামিয়ে রাখল। 'ইঞ্জিন কন্ট্রোলের ওরা ওখানে বসে বসে কী করছে!'

'আমি চাই ইমার্জেন্সি টিমগুলো যার যার পজিশনে থাকবে,' নির্দেশ দিল ব্র্যাডলি। 'কোস্ট গার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

ঠিক তখনই জাহাজের কমিউনিকেশনস রুমে জোরাল একটা আওয়াজ হলো -নানান যন্ত্রপাতির যতরকমের কেইবল ছিল, তার মূল কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটল।

ব্রিজে দাঁড়ানো এক অফিসার ফোনে কথা বলছিল, থমকে গিয়ে হাতে ধরা রিসিভারটা দেখল সে। 'ফোনের লাইন ডেড!' ফার্স্ট অফিসারের দিকে তাকাল। 'কী ঘটছে, স্যর?'

প্রশ্নের জবাব দিল না ব্র্যাডলি, 'লো ফ্রিকোয়েন্সিতে চেষ্টা করুন।'

কয়েক সেকেণ্ড আগে একাজ করেছে অ্যাডামস। মাথা নাড়ল। 'কোনও সিগন্যাল নেই। কিছুই নেই!'

বলরুমের সবকিছুর কাঁপাকাঁপি বন্ধ হয়েছে। আসবাবপত্রগুলো আর আগের মত একা একাই নড়ছে না। ছাদ ও দেয়াল থেকে আর কিছু খসে পড়ছে না। কিন্তু মানুষের ভয় দূর হয়নি।

এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর লিলি ল্যাংট্রি সবাইকে নানা কথায় মুগ্ধ করতে চাইল। কিন্তু মানুষ অত বোকা নয়, তারা বুঝে গেছে মহা বিপদে পড়েছে। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে এখন যেকোনও মুহূর্তে।

ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে উঠে মাইক্রোফোন নিয়েছে ল্যাংট্রি, ততক্ষণে বাজনদাররা উধাও হয়েছে। জোর গলায় বলে চলেছে ল্যাংট্রি, 'আমার মনে হয় আসলে এটা একটা ড্রিল ছিল।' সবার দিকে চেয়ে হাসছে সে, কিন্তু হাসিটা অত্যন্ত মলিন। আবারও বলল, 'আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে সব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

বলে চলেছে ল্যাংট্রি, কিন্তু ততক্ষণে বলরুমের বেশিরভাগ লোক বেরিয়ে গেছে। যারা আছে, তাদের অনেকে শারীরিক ভাবে বা মানসিক ভাবে অসুস্থ, ফলে তারা এখনও সরে পড়তে পারেনি। কিছু লোক রয়ে গেছে হতভাগ্যদের সাহায্য করবার জন্য। তাদের মধ্যে রানা ও সোহানাও আছে। ওরা বয়স্ক ভদ্রলোক ও মহিলাদের উঠে বসতে সাহায্য করছে, আহতদের সান্ত্বনা দিচ্ছে -সাহস দিচ্ছে।

‘এখানে যেটা দেখলেন সেটা আসলে আমাদের একটা ড্রিল,’ কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলেছে লিলি ল্যাংট্রি। ‘কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।’

এক বয়স্কা মহিলা পড়ে আছে দেখে তুলে বসাল রানা। বেচারি ভয়ে কাঁপছে এখনও, কিন্তু হুঁশ ঠিক আছে। বলল, ‘উন্মাদ বেটির মাথাটা গেছে!’

রানা দূর থেকে সোহানার দিকে চাইল। সোহানা এক বৃদ্ধ লোককে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

আরও দু’জন অফিসার দ্রুত পায়ে ব্রিজে ঢুকল। তারা জেনে গেছে ব্রিজে হুলস্থুল চলছে, ক্যাপ্টেন ওখানে নেই। ফার্স্ট অফিসার পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন।

‘আমরা কী করতে পারি, স্যর?’ একজন জানতে চাইল।

‘ইঞ্জিন রুমের সঙ্গে একটা লিঙ্ক ধরে রাখুন,’ নির্দেশ দিল ব্র্যাডলি। ‘প্রত্যেক ক্রুর জন্য রেডিও ইস্যু করুন। আর দয়া করে কেউ ক্যাপ্টেনকে খুঁজে আনুন!’

ব্রিজের রেডিও ইউনিট দু’বার আওয়াজ করল।

স্পিকার-ফোনের বাটন টিপে বলল ব্র্যাডলি, ‘বলুন?’

'মিস্টার ব্র্যাডলি, লাভ অ্যাট সি তো ভাল ভাবে চলছে না,’ বলে উঠল এক পুরুষ কণ্ঠ। ‘আপনাদের বোধহয় দ্রুত জাহাজ ত্যাগ করা উচিত।’

‘কে আপনি?’ জানতে চাইল ব্র্যাডলি। হাতের ইশারায় অন্য অফিসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। বুঝে গেছে এ লোক জরুরি কিছু বলবে।

‘আমি এমন এক লোক, যার কথামত চললে আপনাদের উপকার হবে,’ বলল হ্যালেক। আমি চাই আপনারা এখনই ইভ্যাকিউয়েশন অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবেন। আপনাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই!’

‘আমি জাহাজ থেকে কাউকে নামিয়ে দিতে পারি না,’ কড়া স্বরে বলল ব্র্যাডলি। ‘ওটা শুধু পারেন ক্যাপ্টেন। তিনি না আসা পর্যন্ত এ-ব্যাপারে আপনি...’

‘ক্যাপ্টেন মারা গেছে,’ মিস্টার ব্র্যাডলি, ‘কাজেই জাহাজের সবাইকে রক্ষা করবার দায়িত্ব এখন আপনার উপর বর্তেছে।’

কথাটা শুনে জাহাজের সবকজন অফিসার হতভম্ব হয়ে গেল।

ব্রিজের অ্যাড্রেস সিস্টেমে হ্যালেকের কণ্ঠ ভেসে এল, ‘কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না, বা কোনও কোডে এসওএস পাঠাবেন না -তাতে কোনও লাভ হবে না। দুনিয়ার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগের পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।’

‘এক মিনিট!’ থমকে গিয়ে বলল ব্র্যাডলি। বুঝতে পারছে একদল ভয়ঙ্কর টেরোরিস্ট জাহাজে উঠেছে। নরম স্বরে বলল সে, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না... আমার সে অধিকার নেই! মেরিটাইম রেগুলেশনে বলেছে...’ মনে মনে

ভাবছে এরপর কী করতে পারে সে। লাভ অ্যাট সি ক্রুজ জাহাজ, ডিফেন্সের প্রায় কোনও পথই নেই।

কড়া স্বরে বলল হ্যালেকের, 'জাহাজের দায়িত্ব এখন আপনার ওপর, মিস্টার ব্র্যাডলি। ভুল করবেন না এই জাহাজের কর্তৃত্ব এখন আপনার হাতে।' কিন্তু ফোনে ওদিক থেকে কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর কী-বোর্ডে টাইপ চলল। কয়েক সেকেণ্ড পর হ্যালেক বলল, 'ফার্স্ট অফিসার, আমি চাই আপনি ইমার্জেন্সি ফায়ার ডিসপ্লে দেখুন।'

দ্রুত পায়ে মনিটর স্ক্রিনের কাছে চলে গেল ব্র্যাডলি ও অ্যাডামস।

কর্কশ কণ্ঠস্বর বলে চলেছে, 'পোর্টের দিকে বি-ডেক দেখুন, ওটা আপনার ডিসপ্লে-তে সেকশন দুইশো বারো।'

সময় আদায় করতে জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলি, 'আপনি কী করতে চাইছেন?'

ব্রিজে দাঁড়ানো অফিসাররা জানে না গলফ বল আকৃতির একটা স্মোক গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে। ওটা বি-ডেকের বামদিকে এয়ারকণ্ডিশনিং গ্রিলের ভিতর। বোমার কারণে কোনও ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি করছে ওটা। ভেন্ট থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোল ধোঁয়া, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মোক ডিটেক্টরগুলো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

ব্রিজের ইমার্জেন্সি ফায়ার ডিসপ্লে-তে দুইশো বারো সেকশনটা জ্বলজ্বল করে উঠল।

'যাহ!' স্পিকার-ফোনে হাসি-হাসি ভাব হ্যালেকের। 'মিস্টার ব্র্যাডলি, আপনি কি বুঝতে পারছেন না আমাকে কী করতে বাধ্য করছেন?'

‘এক মিনিট, স্যর!’ বাধ্য হয়ে বলল ব্র্যাডলি। তার কণ্ঠে সময় প্রার্থনার সুর ফুটে উঠল, ‘স্যর, এক মিনিট!’

‘এবার ক্রু-ডেকের সামনের সেকশন, বো-থ্রাস্টারের দুদিকেই,’ লোকটার কণ্ঠে পাগলামির লক্ষণ, যে-কোনও সময়ে হো-হো করে হেসে উঠবে। ‘সেকশন এক শ’ এগারো, সেকশন তিন শ’ একচল্লিশ, পাঁচ শ’ পঁয়ত্রিশ, দু’ শ নিরানব্বই...’

ক্রু-ডেকে গলফ বলের গ্রেনেড ফাটছে একের পর এক, কুয়াশার মত ভারী ধোঁয়া করিডোরগুলো ভরে তুলছে।

ব্রিজের ইমার্জেন্সি ফায়ার ডিসপ্লে-তে অনেকগুলো বাতি জ্বলজ্বল করছে -যেন জোনাকির দল আলো জ্বেলেছে! ধোঁয়া চারপাশের এলাকা গ্রাস করছে, একের পর এক ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে। ডিসপ্লে-তে জ্বলে উঠছে নতুন নতুন বাতি। প্রিন্টারগুলপ খটর-খটর করে চলছে, দ্রুতগতিতে কাগজ বেরিয়ে আসছে -ফায়ার অ্যালার্মের রেকর্ড বাক্সগুলোতে গিয়ে জমছে। ব্রিজে দাঁড়ানো অফিসারদের মনে হলো তারা পেট্রলে ভেজা কাঠের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এবার ওটার উপর ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে দেবে কেউ।

একবার চারপাশ দেখল ব্র্যাডলি, ওর মন বলল নাকে ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। ‘হায় ঈশ্বর...’ বিড়বিড় করে বলল ব্র্যাডলি, কী করা উচিত বুঝতে পারছে না।

স্পিকার-ফোনে আবার সেই উন্মাদটা, কণ্ঠে অশুভ সুর, বলে উঠল, ‘এসব আগুন ফায়ার ডোরের আড়ালে আছে, আমি ওগুলো নিয়ন্ত্রণ করছি -প্রয়োজনে দরজাগুলো খুলে দেব। বোমা জাহাজের সবখানে আছে। এরপর সবগুলো ফাটিয়ে দেব।’

জাহাজের ইভ্যাকিউয়েশন অ্যালার্ম বাটনের দিকে তাকাল জর্জ অ্যাডামস, ভুলে গেল নিচু স্বরে কথা বলা উচিত, ব্র্যাডলির উদ্দেশে দ্রুত স্বরে বলল, 'স্যর, আমার মনে হয় ইভ্যাকিউয়েশন বাটন টিপে দেয়া উচিত এখন আপনার।'

ইমার্জেন্সি ফায়ার ডিসপ্লের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি, নিচু স্বরে বলল, 'সম্ভব নয়। ভুলে গেছেন, জাহাজ যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ ওটা ত্যাগ করা যায় না।'

স্পিকার-ফোনে শীতল কণ্ঠে কড়া নির্দেশ এল, 'ঠিক তিন মিনিট পর জাহাজ থেমে যাবে। তোমাদের আমি ঠিক পনেরো মিনিট দেব, এর মধ্যে চলে যেতে হবে। এবার অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও, নইলে আগুন ধরিয়ে গোটা জাহাজ পুড়িয়ে দেব আমি।'

চট করে জর্জ অ্যাডামসের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি, তারপর ইভ্যাকিউয়েশন অ্যালার্ম বাটনটা দেখল।

নিচু স্বরে বলল অ্যাডামস, 'স্যর, আমার মনে হয় বাটন টিপে দেয়াই উচিত।'

রানা ও সোহানা এখনও বলরুম থেকে লোক সরিয়ে দিচ্ছে। যারা এখনও হতভম্ব হয়ে আছে, বা কানে কম শুনছে, তারা এবার চমকে গেল -প্রচণ্ড জোরে কয়েকবার জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠল। তারপরই একটানা দীর্ঘ কানফাটা সাইরেন।

জাহাজের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে হ্যারি ব্র্যাডলির কণ্ঠ ভেসে এল, 'ফার্স্ট অফিসার বলছি। সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও ক্রু, আপনারা দয়া করে মাস্টার ডেকে চলে আসুন। এটা কোনও ড্রিল নয়! ...এটা কোনও ড্রিল নয়!

...আমাদের লাভ অ্যাট সি ছেড়ে নেমে যেতে হবে! আপনারা মাস্টার ডেকে চলে আসুন!’

রানার চোখে চাইল সোহানা, ভুরু কুঁচকে গেছে।

শ্রাগ করল রানা। ‘চলো, সবার সঙ্গে যাওয়া যাক।’

স্পিকারে ব্র্যাডলির কণ্ঠ আবারও ভেসে এল, ‘এটা কোনও ড্রিল নয়! দয়া করে শান্ত থাকুন!’ কথাগুলো শুনে প্রথমবারের মত খানিকটা শান্ত হলো যাত্রীরা। ‘ক্রুরা এখন লাইফবোটের দিকে নিয়ে যাবে যাত্রীদেরকে। সমস্ত ক্রু, যাত্রীগণ শুনুন... আপনারা একে একে জাহাজ ত্যাগ করবেন। দয়া করে কেউ কেবিনে ফিরবেন না। হাতে সময় নেই, ওখানে যাই রেখে থাকুন, দেরি না করে আপনারা মাস্টার ডেকের দিকে...’

ছয়

অফিসার ও ক্রুরা পুরো জাহাজ ঘুরেছে, প্রতিটি কেবিনের দরজায় থাবা দিয়েছে, লাউঞ্জগুলোতে গিয়ে যাত্রীদের জড় করেছে। কাউকে নিজস্ব জিনিস নিতে দেয়া হয়নি, বলা হয়েছে হাতে মোটেই সময় নেই। সবাই জানে প্রাণ বাঁচাতে চাইলে কর্তৃপক্ষের কথা শুনতে হবে। প্রতিমুহূর্ত ঘণ্টি বাজছে, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বারবার ঘোষণা আসছে।

ফ্লাড-লাইটের নীচে মাস্টার ডেকে হাজির হয়েছে যাত্রীরা। গাঢ় অন্ধকার সাগরের দিকে চেয়ে আছে অনেকে, চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। সাগর এইমুহুর্তে শান্ত, কিন্তু যেদিকে চোখ যায়, একটা আলো নেই। কোথাও কোনও

জমিন নেই! একটা জাহাজ যদি কাছাকাছি থাকত এখন! চারদিক ঘুটঘুটে কালো, চারপাশে কিছু নেই। প্যাসেঞ্জার ভরা লাইফ-বোট ধীরে ধীরে সাগরে নামানো হচ্ছে। এক-এক করে বোট নামার ফলে পানিতে থপাস্- থপাস্ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে সাগর লাফিয়ে উঠছে। ক্রুরা নিজেদের জন্য ধাতব ড্রাম থেকে রাবারের ইনফ্লেটেবল রাফট বের করেছে, ওগুলো রেইলিঙের বাইরে নিয়ে ফেলছে। আরেক দল ইতিমধ্যে জাহাজের বিভিন্ন ডেক থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিয়েছে। ওগুলো সাগরে গিয়ে পড়েছে। অফিসাররা বলেছে, চিন্তা করবার কোনও কারণ নেই, যাত্রীদের লাইফবোটে তুলে দেয়া হবে -দড়ি ও মই রাখা হয়েছে বাড়তি সতর্কতার জন্য।

ভিক্টর হিগিন্স ও রুবি লম্বা একটা করিডোর পার হলো, দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে তারা। সামনেই বাঁক নিয়ে থামতে হলো তাদের। একটু দূরে এক ডজন মানুষ দাঁড়িয়ে -তাদের সামনে বন্ধ একটা ফায়ার ডোর। এ দলের সঙ্গে রয়েছে লিলি ল্যাংট্রি, দু বোন জুলি ও ক্যারল, নতুন দম্পতি অ্যানিটা ও য্যাঙো এবং ক্যাভিস গর্ডন ও তার স্ত্রী সোফিয়া। শেষের এই দম্পতিকে দেখলে মনে হয় তাদের জামাকাপড় থেকে আভিজাত্য ছিটকে বেরিয়ে আসছে। অবশ্য এদের তর্কের বিরাম নেই।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইল ব্যাণ্ড লিডার রিটা ডেলটন। এখন তার স্টার হওয়ার সেই আত্মবিশ্বাস উধাও। ভীত স্বরে বলল, ‘আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।’

‘এ দরজা খুলবে না,’ বলল য্যাঙো, কাঁধ ঝাঁকাল। এখনও পৌরুষ হারিয়ে বসেনি সে।

‘আমি একটা শর্টকাট পথ চিনি,’ বলে উঠল ল্যাংট্রি। চেহারা দেখে মনে হলো আরও বহু পথঘাট চেনে সে। ইচ্ছে করলে আপনারা আমার হাত ধরে বাঁচতে পারেন।’

‘বাজে কথা বাদ দাও, লিলি,’ কড়া স্বরে বলল রিটা ডেলটন। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে তার। ‘পথ দেখাও।’

সবাই ল্যাংট্রির পিছু নিল, আরেকটা করিডোরে চলে এল তারা। সামনের বাঁক নিতেই দেখা গেল বিশ ফুট দূরে ধাতব এক দরজা। খুব ধীরে পালাদুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! ওটার দিকে দৌড়ে গেল ক্যাভিস গর্ডন।

পিছন থেকে স্বামীকে উৎসাহ দিল সোফিয়া, ‘দু’হাতে ধরে ফ্যালো, গর্ডন!’

ভদ্রলোক দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। দুই পালার মাঝখানে সামান্য জায়গা এখনও খোলা। বন্ধ হয়ে এল প্রায়! ক্যাভিস কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল, তারপর ভয় পেল। দরজা যদি হাত সহ আটকে যায়। চিন্তা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে তার, কিছুই আর ধরা হয়ে উঠল না -ধাতব শব্দ করে কবাট বন্ধ হয়ে গেল। এবার চেষ্টা করল ক্যাভিস, তাতেও কিছুই হলো না।

এ দল কয়েকটা ফায়ার ডোরের মাঝখানে আটকা পড়েছে। দরজাগুলো এখন আর খোলা যাবে না।

‘হায়, ঈশ্বর!’ ককিয়ে উঠল রুবি হিগিন্স। ‘আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি!’

‘আমার একটা সিগারেট দরকার, গর্ডন,’ কাঁপা স্বরে বলল সোফিয়া। ‘একটা সিগারেট! ...খুব দরকার।’

বাতাসে ধোঁয়ার স্তর ভাসছে, অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে মাস্টার ডেকের দিকে এগিয়ে চলেছে রানা ও সোহানা।

'আমরা যখনই বেড়াতে বেরোই...' চুপ হয়ে গেল সোহানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'জাহাজের ব্রোশারে পড়েছি বিপদ হতে পারে ভেবে হাজারখানেক স্প্রিংলার রেখেছে এরা। আরও আছে বিশেষ গ্যাস, মুহর্তে আগুন নিভিয়ে দেবে।'

কথাটা শুনে চমকে গেছে রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল। আরেকবার বাতাস শুঁকল। এখন ও জানে এতক্ষণ কী কারণে মন খচখচ করছিল। সোহানার দিকে চাইল রানা। 'গন্ধক! টের পেয়েছ তুমি? এ তো সালফারের গন্ধ!'

'তাই তো!' অবাক হয়ে বলল সোহানা। 'আগে খেয়ালই করিনি।'

যাত্রীরা দ্রুত পায়ে মাস্টার ডেকের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সোহানার কনুই স্পর্শ করল রানা, 'তুমি এদের সঙ্গে এগিয়ে যাও। চোখ-কান খোলা রেখো। আমি চারপাশটা দেখে নিয়ে মাষ্টার ডেকে আসছি। কিছু ব্যাপারে খুব খটকা লাগছে।'

'আমারও,' বলল সোহানা। 'মাঝরাতে বলছে জাহাজ ছেড়ে খোলা সাগরে গিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু অফিসাররা একবারও বলছে না আগুন এত ছড়িয়ে গেছে যে, লাইফ-বোট করে সরে যেতে হবে।'

'মাস্টার ডেকে গিয়ে নজর রেখো,' বলল রানা। 'অন্যদের পিছু নাও।'
'তোমার কি বেশি দূরে যাওয়া উচিত হবে?' উদ্বিগ্ন চোখে চাইল সোহানা। বলতে গেলে তো আমরা জাহাজের কিছুই চিনি না। হারিয়ে গেলে?'

‘পাগলি! সারাক্ষণ ওর হিরোর জন্য দুশ্চিন্তা করবে,’ মনে মনে বলল রানা। মৃদু হেসে ফেলল। ‘চিন্তা কোরো না। পনেরো মিনিট পর দেখা হবে।’ এবার জোরেশোরে তাড়া দিল ও, ‘জলদি দৌড় দাও তো!’

দাঁড়িয়ে রইল সোহানা, চোখে উদ্বেগ।

দ্রুতপায়ে করিডোরের সামনের মোড়ে পৌঁছে গেল রানা, আরেক প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল।

গাঢ় অন্ধকার। এলিভেটর দুই তলার মাঝখানে আটকে আছে, নড়ছে না। ইস্পাতের বাক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ন্যান্সি। দু’হাতে যতগুলো বাটন পেয়েছে, বারবার টিপেছে। লাল রঙের ইমার্জেন্সি বাটনের কথা মনে রেখেছে, ওটা অন্যগুলোর চেয়ে বড়। ওর আঙুল আবারও ওটা খুঁজে নিল, এ-পর্যন্ত অন্তত বিশবার টিপেছে।

এলিভেটরের দুলুনি থামবার পর নিজেকে সামলে নিয়েছে ন্যান্সি, মন থেকে সমস্ত আতঙ্ক দূর করতে চেয়েছে। যতক্ষণ ভয় পেয়েছে, ভেবেছে শাফটের গভীরে গিয়ে পড়বে এলিভেটর -আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে ও। কিন্তু আপাতত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে -তার পরও বুকের মধ্যে কু ডাকছে।

ন্যান্সি জানে, ও আসলে সাহসী মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক দৃঢ় ও, চট করে ভেঙে পড়ে না। প্রকৃতি মানুষের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিলে বদলে সবসময়ই অন্য কিছু দেয়।

ওর ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই, ও অন্ধকারকে ভয় পায় না, বুদ্ধি খাটাতে পারে, কখন কী করতে হবে সেটা বুঝতে পারে। সেজন্য মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে শুরু করল।

ও জানে ওকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একটা লিফটের মধ্যে আছে ও, ওটা নষ্ট হয়ে আটকে গেছে। আগে হোক বা পরে, লোকজন বুঝতে পারবে এই লিফট নষ্ট হয়েছে, তার উপর অ্যালার্ম তো বাজবেই।

ন্যান্সির এটা জানা নেই যে, এলিভেটর-সমস্যার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে জাহাজে-ওর বাজানো অ্যালার্ম আরও অনেক অ্যালার্মের সঙ্গে মিশে হারিয়ে গেছে।

অন্ধকার এলিভেটরের ভিতর দু'হাতে চারপাশ হাতিয়ে দেখছে ন্যান্সি। তিক্ত মনে ভাবছে, ও যেন একইসঙ্গে বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভাগা। এদিকে মনের কোণে মাঝে মাঝেই ভয় এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

উইন্ট্রি ও সিয়েরাকে লাইফ-বোটের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে এক অফিসার, কিন্তু তারা দু'জন আপত্তি তুলল।

'আমরা আমাদের মেয়েকে খুঁজে পাইনি,' তরুণ অফিসারকে বলল উইন্ট্রি। 'কেবিনে নেই ও। কেবিন নম্বর ৭৯৪৫।'

'ওটা বি ডেকে, সবাইকে ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' বলল অফিসার। 'কোনও চিন্তা করবেন না।'

'কিন্তু আমাদের মেয়ে কানে শোনে না,' বলল সিয়েরা। 'আমরা যদি ওকে খুঁজে দেখি...'

‘আমরা ওকে সরিয়ে নিয়েছি, চিন্তা করবেন না,’ আবারও বলল অফিসার। ‘আমি নিজে ওই ডেক থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়েছি। যোগ্য লোকের হাতেই আছে ও। ওকে পেতে হলে আপনাদের মাস্টার ডেকে যেতে হবে।’ সামনের করিডর দেখাল সে। ‘পরের দরজা দিয়ে মাস্টার ডেকে যেতে হবে।’

তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে উইন্ট্রি ও সিয়েরা, কয়েকটা এলিভেটর পাশ কাটাল তারা। ওখানে একটা লিফটের দরজায় টিপটিপ করে লাল বাতি জ্বলছে। চারপাশে অসংখ্য অ্যালার্মের আওয়াজে কান ঝালাপালা।

ব্রিজে জর্জ অ্যাডামস একা, এখনও জাহাজের অটো-পাইলটের কাছ থেকে স্টিয়ারিং ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ও জানে, কাজটা ওর সাধ্যের বাইরে, তবুও কম্পিউটারকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। প্রত্যেকটা আদেশ অমান্য করছে কম্পিউটার। তবুও নতুন সব প্রোগ্রাম দিয়ে চেষ্টা করছে সে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো কাজ হবে। কিন্তু সেটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর কম্পিউটার আবারও তথ্য নেওয়া বন্ধ করল।

‘হায় যিশু!’ হতাশ হয়ে বিড়বিড় করল অ্যাডাম্স। ‘লোকটা আবারও আমাদের ঠেকিয়ে দিয়েছে!’

ঠিক তখনই দড়াম করে পিছনের দরজা খুলে গেল। দৃশ্যত কুঁকড়ে গেল অ্যাডামস। কাতর হয়ে বলল, ‘দয়া করে আমাকে মারবেন না!’

‘আমি আপনাকে খুন করতে আসিনি, অফিসার,’ বলল যুবক। ‘জরুরি কিছু ব্যাপার জানতে এসেছি।’

কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল অ্যাডামস, এগিয়ে আসা যুবককে চিনতে পারল, ডাইনিং হলে দেখেছে -তার মন বলল, এ খুনি নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'স্যর, লাইফবোটে গিয়ে উঠুন। যেকোনও সময় লাইফবোট ছেড়ে দেবে। আপনি কর্তৃপক্ষের সময় নষ্ট করছেন।'

'আমি একজন সরকারি ইনভেস্টিগেটর,' ব্রিজের চারপাশ দেখা হয়ে গেছে রানার। ওর চোখ ইমার্জেন্সি ফায়ার ডিসপ্লের উপর স্থির হলো। ওখানে জ্বলজ্বল করছে বেশ কিছু বাতি, নীরবে বলছে কী ঘটেছে।

'কী বললেন?' বলল অ্যাডামস। 'ইনভেস্টিগেটর? এখানে ইনভেস্টিগেশনের কিছু নেই, স্যর। আপনি...'

'একটা আগুনও কি কনফার্ম করা হয়েছে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'সবাইকে লাইফবোটে তুলছি আমরা,' বলল অ্যাডামস, 'এর বেশি আর কী জানতে চান আপনি?'

ব্রিজের জানালার ভিতর দিয়ে ন্যাভিগেটিং বাতি দেখা গেল, এরই মধ্যে জাহাজ থেকে কিছু বোট নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলো দূরে সরে যাচ্ছে।

জাহাজের পেটে শুধু একটা কেবিনে প্যাসেঞ্জার রয়েছে। অর্ধেক ভরা বাথটাবে সামান্য উষ্ণ পানি, আঙুল দিয়ে ওটা পরখ করল হ্যালেক। চলবে। পানি গরম বা ঠাণ্ডা নয়। এবার জোঁকগুলো বাথটবে ছেড়ে দিল। ওগুলো কিলবিল করে নানাদিকে রওনা হলে। ভালবাসা নিয়ে কীটগুলোর দিকে তাকাল হ্যালেক, বিড়বিড় করে বলল, 'খারাপই লাগছে যে তোদের সঙ্গে নিতে পারছি

না। কিন্তু চিন্তা করিস না, জাহাজ ডুবে গেলেও তোরা সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাতে পারবি।'

হ্যালেক জানে, অনর্থক মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে সে ওই উপকারী রক্তচোষাগুলোকে সাগরের লোনা পানির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সবকটা।

মাস্টার ডেকে ফ্লাডলাইটের আলোয় মহা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে জাহাজের ফটোগ্রাফার, একের পর এক লাইফ-বোট নামিয়ে দেয়া হচ্ছে, আর সে পটাপট ছবি তুলছে।

'সাত নম্বর বোট নামাও!' নির্দেশ দিল ফার্স্ট অফিসার হ্যাডলি।

যাত্রীদের আগেই বোটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, এবার ইলেকট্রিক উইঞ্চগুলো জাহাজের পাশ দিয়ে যাত্রীদের নামাতে শুরু করল। মসৃণ গতিতে নেমে চলেছে বোট, কিছুক্ষণ পর শোনা গেল ঝপাস করে শব্দ। বোটের বো ও স্টার্ন থেকে উইঞ্চ কেইবলের হুকগুলো খুলে দেয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে বোটের ইঞ্জিন গর্জে উঠল -জাহাজ থেকে সরে গেল অনেকটা দূরে।

'জলদি!' নির্দেশ দিল ব্র্যাডলি, 'এটাই শেষ বোট, সবাই উঠে পড়ুন!'

অবশিষ্ট যাত্রীরা লাইফ-বোটে গিয়ে বসল, তবে সোহানা উঠছে না। মরলেও যাবে না, রানার জন্য অপেক্ষা করছে। আরও দু'জন বোটে এখনও ওঠেনি। তারা ন্যান্সির বাবা-মা। দুশ্চিন্তায় কাঁপছে সিয়েরা, উইন্ট্রি বারবার চারপাশ দেখছে, কী করবে বুঝতে পারছে না।

'সোহানা, ন্যান্সি কেবিনে ছিল না,' সোহানার কনুই আঁকড়ে ধরল সিয়েরা।

মুখ চেনা ছিল, একটু আগে ওরা পরিচিত হয়েছে। ‘পুরো জাহাজ খুঁজেছি আমরা,’ বলল উইন্ট্রি।

‘ওকে ছাড়া বাঁচব না আমরা,’ সিয়েরার কণ্ঠ থেকে হাহাকার বেরিয়ে এল।

ডেকের দিকে তাকাল সোহানা, রানাও তো ফিরছে না। সিয়েরাকে সান্ত্বনা দিল ও, ন্যান্সি নিশ্চয়ই অন্য বোটে উঠেছে।’

হ্যারি ব্র্যাডলি এগিয়ে এল, ‘আপনারা আসুন, দেরি করবেন না!’

ঠিক তখনই ডেকের ওদিকে রানাকে দেখল সোহানা, দৌড়ে আসছে। হাঁপ ছাড়ল সোহানা, চেঁচিয়ে ডাকল, ‘রানা! জলদি! এটাই শেষ বোট!’

রানা আসতেই সিয়েরা বলল, ‘ন্যান্সিকে পাচ্ছি না। আপনি কি ওকে দেখেছেন?’

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা, হ্যারি ব্র্যাডলির দিকে তাকাল। ‘আপনারা যাত্রীদের গুনে বোটে তোলেননি?’

‘স্যর, আপনারা কিন্তু দেরি করছেন!’ কড়া স্বরে বলল ব্র্যাডলি। ‘জাহাজের সমস্ত যাত্রীর জন্য আমি দায়ী থাকব, আপনারা বোটে উঠুন!’

‘উঠব না হয়, কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা জেনে নিন,’ গম্ভীর স্বরে বলল রানা। ‘আপনাদের ব্রিজে ফায়ার-বোর্ডে যে ফ্ল্যাশ দেখেছেন, ওগুলো নকল আগুনের । জাহাজে যে ধোঁয়া তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো সালফার-বেজড -সব ফ্ল্যাশ গ্রেনেড, ধোঁয়ার ক্যানিস্টার। ...যে আগুন নিয়ে ভয় পাচ্ছেন, সেটা বাস্তবে নেই। ...এবার একটু খুলে বলুন তো জাহাজে কী ঘটছে?

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি, বুঝতে পারছে এ লোক সব না শুনে থামবে না। এখানে কী ঘটছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সে। তার জানা আছে, আতঙ্কিত হওয়ার জন্য মাত্র দুটো বিষয়ই যথেষ্ট হবে। প্রথম কথা, তাদের জাহাজে একের পর এক মেকানিকাল দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং সেগুলোর জন্যে দায়ী এক উন্মাদ লোক। ...আর দ্বিতীয় কথা, হাতে মোটেই সময় নেই। মাত্র পনেরো মিনিট দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে। নইলে... সম্ভবত ভয়ঙ্কর কোনও উপায়ে তাদের মারা হবে।

'আমাদের হাতে সময় নেই!' ব্যাখ্যা শেষে বলল ব্র্যাডলি, চট করে ঘড়ি দেখল। 'ওই উন্মাদ আরও কী করবে, তা আমরা জানি। তবে এটুকু বুঝে গেছি, জাহাজ থেকে আমাদের নেমে যেতে হবে।'

কেবিন থেকে একটা খালি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে হ্যালেক। নির্জন করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে। একটু পর ব্যাঙ্কের সামনে থামল, একহাতে ধরা পাম কম্পিউটার -ওটা দরজার দিকে তাক করল। ভিতরে রয়েছে প্রকাণ্ড ভল্ট রুম। দ্রুত তর্জনি দিয়ে কীবোর্ডে টোকা দিল সে, কয়েকটা সিরিজের কমাণ্ড টিপল -এর ফলে দরজার তালায় কিরকির শব্দ শুরু হলো। দু সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজা। অফিসে ঢুকে ভল্টের সামনে দাড়াল সে, কম্পিউটারে আরেক সেট কমাণ্ড দিল। ভল্টের ভিতর থেকে হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল, কয়েক সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে ভারী দরজা খুলে গেল। হ্যালেক জানে, ভল্ট বন্ধ ও খুলবার জন্য বিদ্যুতের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে -ওটা জাহাজের বিদ্যুৎ প্লান্ট থেকে শক্তি ধার করে না।

ভিতরটা দেখল হ্যালেক, ভল্টের মেঝে ও দেয়ালে রংচঙা রশ্মি দিয়ে নকশা তৈরি হয়েছে। ওই চৌকো নকশাগুলোর একটাও যদি ভেঙে যায়, মুহূর্তে কয়েকটা অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এই ঘরে আরও রয়েছে অদৃশ্য ইনফ্রা-রেড, হিট ও মুভমেন্ট সেন্সর -ওগুলোও অ্যালার্মের কাজ করবে। চওড়া হাসি হাসল হ্যালেক। ভল্টের সবক'টা অ্যালার্মের আওয়াজ জাহাজের অন্যান্য অ্যালার্মের সঙ্গে মিশে যাবে। অনেক দূরে কোথাও আছে একটা কনসোল, সেটার স্ক্রিনে বাতি জ্বলে উঠবে। কিন্তু এখন আর ওসব দেখার জন্য কেউ নেই, কাজেই চিন্তাও নেই। দ্রুত পায়ে ভল্টে ঢুকল হ্যালেক, জাগিয়ে দিল অ্যালার্মগুলোকে।

ভল্টের তাকের ওপাশে রয়েছে তালাবদ্ধ লকার, ওগুলোর পেটে ঘুমিয়ে আছে নামকরা আমেরিকান জুয়েলারদের সেরা হীরাগুলো। ওগুলো এ জাহাজে এসে সুন্দরী মডেলদের ট্রে-তে স্থান পেয়েছিল। হীরাগুলো আর কখনও ওভাবে কালো মখমলে পড়ে থাকবে না। মৃদু হাসল হ্যালেক, ওগুলো এখন ওর। কেবল হাতে তুলে নিতেই বাকি, ব্যস, সব ওর! এ দিয়ে ওর চিকিৎসা হবে।

কম্পিউটার থেকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরোতে সচেতন হলো হ্যালেক, খুদে স্ক্রিনে চোখ রাখল। লেখা আছে: 'ইভ্যাকিউয়েশন প্রোগ্রামের কাজ শেষ হয়েছে।'

মাথা দোলাল হ্যালেক, সবাইকে পনেরো মিনিট দিয়েছে সে, এরই মধ্যে জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে। না হলে... হ্যাঁ, গাধার দল যদি এরপরও জাহাজ থেকে না নেমে থাকে, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ছুটে যাবে। সেজন্য তো আর সে দায়ী নয়!

কী-বোর্ডে তর্জনী রাখল হ্যালেক, এন্টার টিপল -কিছুক্ষণ পর স্ক্রিন কালো হয়ে গেল। পরমুহূর্তে এলো আরেকটা মেসেজ ‘নোয়াজ বোট প্রোগ্রাম চালু করা হবে?’

দ্রুত হাতে কী-বোর্ডে কিছু লিখল হ্যালেক। স্ক্রিনে ফুটে উঠল আরেকটা প্রশ্ন: ‘আপনি কি নিশ্চিত?’

কী-বোর্ডে আবারও ঝড় তুলল হ্যালেক, জানিয়ে দিল, সে। নিশ্চিত। লেখাটা স্ক্রিনে কয়েক সেকেণ্ড ভেসে থাকল, তারপর কম্পিউটারের ক্রিনে ফুটে উঠল, ‘ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। নোয়াজ বোট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হলো, শুরু করা হলো কাজ।’

হ্যালেকের অনেক নীচে, জাহাজের নির্জন ইঞ্জিন রুমে কেউ নেই, কিন্তু হঠাৎ প্রকাণ্ড ডিজেল ইঞ্জিনগুলো গর্জে উঠল।

ভল্ট থেকেও ইঞ্জিনগুলোর কম্পন টের পেল হ্যালেক। কর্কশ স্বরে হেসে উঠল, সত্যিকার বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, ‘তা হলে রওনা হয়ে গেলাম!’

সাত

মাস্টার ডেক-এ ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি শেষপর্যন্ত ন্যান্সির বাবা-মাকে রাজি করিয়েছে, ঠিক হয়েছে তারা লাইফ-বোটে উঠবে। এদিকে কয়েকবার সোহানাকে অনুরোধ করেছে রানা, যেন ও-ও লাইফবোটে ওঠে। বলেছে, সম্ভবত কয়েকজন সন্ত্রাসী জাহাজ দখল করতে চাইছে। তাদের ঠেকাতে

পারলেই আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তখন আবার যাত্রীদের তুলে নেয়া হবে।

পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে সোহানা, আর সে-কারণেই ওর আপত্তি। রানা যে-ধরনের কাজ করে, সেই একই কাজ তো ও-ও করে। অস্ত্রহীন রানা যদি থেকে যায়, ওরও তো থেকে যাওয়াই উচিত -যতই বানা ওকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করুক। কথাটা জানিয়ে দিল ও রানাকে। সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছে, রানা যদি ওর সঙ্গে লাইফবোটে ওঠে, হাসতে হাসতে চলে যাবে ও। নইলে, থাকছে।

রানা বুঝেছে, এই মেয়েকে জোর করে লাইফ-বোটে তুলে দেয়া যাবে না। বোটের দিকে একবার তাকাল ও, এখন ওটা উইঞ্চ কেইবল, থেকে জাহাজের পাশে ঝুলছে। সাগর ঠিক চল্লিশ ফুট নীচে। ঢেউ এসে জাহাজের খোলে বাড়ি মারছে। সাগরের চিরন্তন শোঁ-শোঁ আওয়াজ কানে আসছে।

ন্যান্সির বাবা-মা লাইফ-বোটে উঠেছে, পাশাপাশি দুটো সিটে বসে পড়ল।

'আপনি যাচ্ছেন না?' সোহানার দিকে তাকাল ব্র্যাডলি।

মাথা নাড়ল সোহানা। 'না।'

নির্দেশ দিল ব্র্যাডলি, সঙ্গে সঙ্গে উইঞ্চ চালু হলো। লাইফবোট নামতে শুরু করল।

ঠিক দশ সেকেণ্ড পর জাহাজের সবাই জোর ঝাঁকি খেল। লাভ অ্যাট সি নতুন করে রওনা হয়েছে! এবার টের পেল ওরা, নীচে লাইফবোটে কী যেন গোলমাল হয়েছে। রেলিং থেকে ঝুঁকে নীচে তাঁকাল রানা। যাত্রীরা একে অপরকে জাপটে ধরেছে, কেউ কেউ লাইফ-বোটে গানেল আঁকড়ে আছে! মহিলারা আর্তচিৎকার করছে! সবাই মিলে বোটের ভিতর থাকতে চাইছে!

উইঞ্চের দায়িত্বে যে অফিসার, তার দিকে ছুটল রানা। লোকটার হাতে রিমোট কন্ট্রোল, মনে হলে কী করবে বুঝতে পারছে না। তারপর বাটনগুলো টিপতে শুরু করল।

'ওদের তুলে আনুন!' দ্রুত নির্দেশ দিল রানা।

'চেষ্টা করছি!' বলল অফিসার। 'কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল কাজ করছে না!'

জাহাজের গতি বাড়ছে।

ডেক থেকে সবাই যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে পেল। অন্ধকারে দেখা গেল বেশ নীচে লাইফবোট। ওটা উইঞ্চের কেইবল থেকে ঝুলছে। তারপর খুদে নৌযান আরও দুলতে শুরু করল। পরমুহূর্তে জাহাজের গায়ে এসে গুঁতো দিল।

লাভ অ্যাট সি আরও দ্রুত ছুটছে।

উইঞ্চ ও বোটের কেইবলগুলো অনেক বেশি নড়ছে এখন! লাইফ-বোট জাহাজের গায়ে এসে আবারও আছড়ে পড়ল! সাহায্য পাওয়ার আশায় চেঁচাচ্ছে যাত্রীরা!

সরু কেইবলগুলো দেখছে সিয়েরা, বুঝতে পারছে না ওই জিনিস কীভাবে বোট ধরে রাখবে। 'আমরা তো সাগরে পড়ে যাব!' তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে।

'আমাদের জাহাজে তুলে নিন!' লাইফ-বোটে থাকা এক ক্রু চেঁচিয়ে জানাল।

'পারছি না!' উঁচু স্বরে পাল্টা জানাল অফিসার। 'উইঞ্চ জ্যাম হয়ে গেছে!'

বোটের সিটে যতক্ষণ যাত্রীরা বসে ছিল বিপদ হয়নি, বোট ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কিন্তু এখন ওটা বারবার জাহাজের পাশে এসে বাড়ি মারছে।

যাত্রীরা ভয়ে একপাশে সরে গেছে। এর ফলেই আসল বিপদ দেখা দিল, সাগরের দিকে কাত হলো বোট -সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়তে গেল কয়েকজন। হাতের কাছে তারা যে যা পেল, আঁকড়ে ধরল। যাদের ধরল, তারাও ভয়ে মরণ চিৎকার দিল। একে অপরকে ধাক্কা দিতে লাগল। সবাই ভাবছে আমি মরব কেন, অন্য কেউ জাহাজে বাড়ি খেয়ে মরুক। হাতাহাতি মারামারি শুরু হয়ে গেল প্রায়। বোট এমনিতেই দুলছে, যাত্রীদের হুড়োহুড়িতে ওটা আরও বেশি কাত হলো। আগের চেয়ে জোরে জাহাজের খোলে গুঁতো মারছে।

রেলিঙে ঝুঁকে নীচে চেয়ে আছে রানা, জানে ওদের বাঁচাতে হলে দ্রুত কিছু করতে হবে। কেউ পানিতে পড়লে মুহূর্তে জাহাজের নীচে ঢুকবে, সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবে তাকে প্রপেলার।

পাশে দাঁড়ানো ব্র্যাডলিকে বলল রানা, যেভাবে হোক জাহাজ থামাতে হবে। কেইবলগুলো যে-কোনও সময়ে ছিড়বে।’

আস্তে করে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। ‘জাহাজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই আমাদের! উইঞ্চের উপরও না!’ উইঞ্চের দিকে পা বাড়াল সে।

ডেকের চারপাশ দেখল রানা, তারপর রওনা হয়ে গেল -রেলিঙের খানিক দূরে দড়ির একটা মই আছে। ওটা উপরে তুলল না ও, দড়ির মাথা দুটো খুলে এদিকের রেলিঙে এনে নতুন করে বাঁধল। দেরি করল না, রেলিং টপকে নামতে শুরু করল।

ওদিকে অফিসাররা ব্যস্ত হয়ে উইঞ্চ মেরামত করতে চাইছে। রানা কী করছে দেখে হঠাৎ থমকে গেল তারা।

ব্র্যাডলি অন্তরে বুঝল, সাহসের তুলনা নেই ওই বেপরোয়া মানুষটার। মনে মনে বলল, ‘মিস্টার রানা, দেখো তুমি কিছু করতে পারো কিনা; ঈশ্বর

তোমার সঙ্গে থাকুন!' অফিসারদের উইঞ্চের কাজ করতে বলে রেলিঙে সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল সে, বলল, 'উনি কী করবেন ভাবছেন?'

'জানি না,' বলল সোহানা। নীচের অন্ধকারে চেয়ে আছে ও।

যাত্রীরা দড়ির মইয়ের শেষমাথা শক্ত করে ধরেছে।

'নড়বেন না আপনারা!' চেঁচিয়ে বলল রানা। যত দ্রুত সম্ভব মইয়ের ধাপে পা ফেলে নামছে।

'যেভাবে হোক জাহাজে আমাদের তুলে নিতে হবে!' এক পুরুষ যাত্রী চিৎকার করে বলল, কণ্ঠে হিস্টিরিয়ার আভাস।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন,' বলল রানা। বোটের পাটাতনে স্থির হয়ে দাঁড়ান। আপনারা একজন একজন করে উঠে যাবেন।'

মনে হলো না কেউ রানার কথা পাত্তা দিল। দ্রুতগতি জাহাজের কারণে মই সর্বক্ষণ দুলছে, আছড়ে পড়ছে খোলের গায়ে। লাইফ-বোট ঠিক ওখানে গিয়েই বাড়ি মারছে! মই বেয়ে ওঠা অসম্ভব!

আরও নীচে নামেনি বলে রানা বেঁচে গেল, দড়ির মই জাহাজের গায়ের দু'হাত দূরে এসে ফিরতি পথ ধরল। নেমে চলেছে রানা, আরও খানিকটা নামতেই বুঝল, বোটে নামা খুব কঠিন হবে। তীব্র বাতাস আর জাহাজের দ্রুতগতি মইকে এদিক-ওদিক নিয়ে ফেলছে। ঠিক তখনই মই রানাকে নিয়ে উড়াল দিল, লাইফবোটের অনেকটা উপর দিয়ে উড়ে গেল -অনেক নীচে অন্ধকার সাগর দেখল রানা। মই আবারও দুলতে দুলতে ফিরতি পথ ধরল, মনে হলো জাহাজই উল্টো ধেয়ে আসছে! শক্ত হাতে মই ধরল না, মনে মনে বলল, 'জাহাজে বাড়ি লাগার সময় দেহটাকে শিথিল রাখতে হবে।' পরমুহূর্তে

বুঝল, তাতে হবে না, জাহাজের শক্ত খোলে সরাসরি আছড়ে পড়বে ও ঠিক একতাল ময়দার মত, এক বাড়িতে ওকে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে!

দড়াম করে সংঘর্ষ হলো! পা দুটো মইয়ের ঘাট থেকে ছুটে গেল, এখনও দু'হাতে একটা ঘাট ধরে ঝুলছে! মুঠো দুটো জাহাজের গায়ে ঘষা খেল, সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ছিলে গেল। জাহাজে এমন ভাবে বাড়ি খেয়েছে যে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড চেষ্টার পর শ্বাস টানতে পারল। নীচের ঘাটে দু'পা ভরে দিল, বুঝে গেছে মই আরেকবার বাতাসে উড়াল দেয়ার আগেই লাইফ বোটে নামতে হবে।

যত দ্রুত সম্ভব নেমে চলেছে রানা। কিছুক্ষণ পর লাইফ-বোটের দু'ফুট উপরে পৌঁছে গেল। কি ঠিক তখনই সিয়েরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল -সিট থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, দৌড়ে এসে মই ধরতে চাইল।

'ও এখনও জাহাজে!' তীক্ষ চিৎকার ছাড়ল। আমি জানি! 'ন্যান্সি ওখানেই আছে!'

'সিয়েরা, এ কী করছ।' দু'হাতে স্ত্রীকে ধরতে চাইল উইন্ট্রি, কিন্তু পারল না। 'ফিরে এসো।'

চোখের কোণে থরথর করা কেইবলগুলো দেখল রানা। প্রায় ধমকে উঠল ও, 'নড়বেন না! কেইবল ছিড়ছে।'

হুঁশ নেই সিয়োরার, বো'র দিকে ছুটছে সে, কয়েকটা সিট টপকে এগোল, অন্য যাত্রীদের মাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। কয়েকজন মিলে তাকে আটকাতে চাইল, কিন্তু এর ফলে ভয়ঙ্কর ভাবে দুলে উঠল বোট। মইয়ের কাছে পৌঁছে গেল সিয়েরা, খামচি দিয়ে রানাকে নামিয়ে দিতে চাইল -তাকে উঠে যেতে হবে, জাহাজে ন্যান্সি আছে!

ধাক্কাধাক্কি-হুড়োহুড়িতে অনেকে বোর দিকে সরে গেছে, এরা কেউ রানার হুঁশিয়ারি মনে রাখেনি। বো'র দিকের তারটা হঠাৎ করে ছিটকে কুণ্ডলি পাকাল! পরমুহূর্তে কেইবল সড়সড় করে পিছলে নামতে শুরু করল, সঙ্গে বোটের বো' নিয়ে চলেছে। বামহাতে সিয়েরাকে জাপ্টে ধরল রানা, ডানহাতে মই ধরে ঝুলে থাকল। যাত্রীরা বোটে যা পেল, দু'হাতে ধরে সামলাতে চাইল। বো'র দিকে দুই যাত্রী দাড়িয়ে পড়েছিল -এক মহিলা ও এক লোক -বোট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল তারা। মানুষগুলো নীচে অন্ধকার সাগরের দিকে রওনা হলো -তাদের করুণ আর্তনাদ চারতলা সমান উচ্চতা থেকে শোনা গেল। সবার মনে তারা দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল। সবাই জানে ক্যারিবিয়ান সাগর হাঙরের জন্য কুখ্যাত!

একটু আগে সবাই হাউমাউ করছিল, কিন্তু মানুষ দুটোর মৃত্যু তাদের একদম চুপ করিয়ে দিল। রানা সিয়েরাকে মই থেকে বোটে নামিয়ে দিল। যাত্রীরা মহিলার দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চুপ হয়ে গেছে সিয়েরা, রানার নির্দেশে সিটে গিয়ে বসে পড়ল। কেউ আর কোনও অভিযোগ তুলল না, নিজেদের দুশ্চিন্তায় ডুবে গেছে। বোট বো'র দিকে অনেক ঢালু হয়ে গেছে, সাগরের দিকেও কাত হয়েছে -কেইবলগুলো এখনও থরথর করে কাপছে, বোট বারবার গিয়ে জাহাজের খোলে বাড়ি মারছে। দুনিয়ার কোনও অ্যামিউজমেন্ট পার্ক কাউকে কখনও এরকম রাইড দিতে পারবে না!

কেইবল কেন পিছলে গেল, বা এরপর কেন আর পিছলে যায়নি, জানে না রানা -মই থেকে কেইবলটা ভাল করে দেখল। কেইবলের যতটুকু দেখা গেল, সরু তারে অসংখ্য চিড় তৈরি হয়েছে। ফ্লাডলাইটে মাস্টার ডেকের ফ্যাকাসে মুখগুলো দেখল ও, সোহানা ও ব্র্যাডলিকে চিনল।

ওরা এত উপরে, একটু থমকেই গেল রানা। যাত্রীদের দিকে একবার তাকাল, তাদের আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে না। সবাই যদি আবার হুড়োহুড়ি করে, হয়তো সবাই মরবে। কিন্তু উপরের ডেকের সবাইকে না জানালে চলবে না, কাজেই শান্ত স্বরে বলল ও, 'এই কেইল অনেকক্ষণ টিকবে না, আমাদের আরেকটা কেইবল দরকার।' ওর কণ্ঠ শুনলে মনে হতে পারে, ও আসলে আরেক কাপ চা চাইছে।

উপর থেকে ব্র্যাডলি হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল, তারা আরেকটা কেইবলের ব্যবস্থা করছে। ক্রুদের নিয়ে কাজে নেমে পড়ল সে। রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে চেয়ে আছে সোহানা। দুলন্ত মই রানাকে নিয়ে আবারও সাগরের উপর চলে গেছে, ফিরলে জাহাজে বাড়ি দেবে। চমকে গেল সোহানা, নিশ্চয়ই রানা ভেবেছে সামলে নেবে -কিন্তু ওই বোট সরছে সাগরের দিকেই! মই রানাকে নিয়ে আগে ফিরছে, কিন্তু পিছন পিছন আসছে বোট! জাহাজ আর বোটের মাঝখানে পড়বে এবার রানা, চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে!

অতি সতর্ক রানা জাহাজের দিকে চেয়ে আছে, জানেই না পিছন থেকে এগিয়ে আসছে ভারী বোট!

'রানা!' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'পিছনে বোট!'

ওই মিষ্টি কণ্ঠ চেনে রানা, সাবধান করবার জন্য কী যেন বলেছে ও! আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা, বিপদ বুঝতে চারপাশে চাইল। পরমুহূর্তে বুঝে গেল কী ঘটতে চলেছে! ভারী বোট ওর পলকা মইয়ের চেয়ে দ্রুত আসছে! মইয়ের উপর কাত হয়ে গেল রানা, বোটের বো'র উপর দু'পায়ে লাথি বসাল। তারপরই পা দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে নিল। ভারী নৌকার গতি কমল না,

জাহাজের প্লেটের উপর আছড়ে পড়ল। আরেকটু হলে বোটের গানেল রানাকে দু টুকরো করে দিত! একবার মুখ তুলে সোহানাকে দেখল রানা, পরক্ষণে জাহাজের প্লেটে গিয়ে ধাক্কা খেল। কয়েক সেকেণ্ড পর মইসহ সরে যেতেই সামনে তাকাল ও।

লাইফ-বোট বা রানা এবারের মত সামলে নিয়েছে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর টিকবে না! ডেক থেকে অফিসাররা কী যেন বলছে। উপরে তাকাল রানা, এইমাত্র বোটের পাশে একটা কেইবল নামিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কেইবলটা শক্ত করে ধরুন।' তাগাদা দিল ও।

ভুল বক্তব্য দিয়েছে ও, যাত্রীদের অনেকে লাফ দিয়ে গিয়ে কেইবল ধরতে চাইল। এর ফলে বোট আরেকটু হলে উল্টে যেত। এক লোক কেইবল ধরেছে, শক্ত করে ধরে রাখল। লোকটাকে চিনল রানা, জাহাজের ফটোগ্রাফার সে -নাম ব্রায়েস। এই লোকই সোহানা আর ওর পোট্রেইট করবে বলে ছবি তুলেছিল। আপাতত সব ঠিকই ছিল, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর সব বদলে গেল –বোট নড়েচড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফস্কে গেল ব্রায়েসের পা। তার কপাল ভাল দু'হাতে কেইবল ধরেছে। জাহাজের উল্টো দিকে কাত হলো বোট, সঙ্গে সঙ্গে ব্রায়েস খসে পড়ল -বা বলা উচিত তার দেহের নীচের অংশ বোট থেকে পড়ে গেল। মাথা, কাঁধ ও পাঁজর এখনও বোটে।

'লোকটা পড়ে যাবে তো!' উপর থেকে ভেসে এল সোহানার কণ্ঠ।

একই কথা ভেবেছে রানা, দেরি না করে মই থেকে লাফ দিয়ে বোটে নেমে পড়ল ও।

'হায় আল্লাহ্!' উপর থেকে সোহানার কাতর উক্তি শোনা গেল। ও ভাবতে পারেনি রানা ওভাবে বোটে লাফিয়ে পড়বে।

লাইফ-বোটের পাটাতনে পড়ে ক্রল শুরু করেছে রানা, সবাইকে নিয়ে উল্টে সাগরে গিয়ে পড়তে চায় না। ব্রায়েসের এক কব্জি গায়ের জোরে চেপে ধরল, নীচে বিক্ষুব্ধ সাগর। 'হাত ধরে থাকো!' ব্রায়েসকে যতটা না বলল, তার চেয়ে নিজেকে শোনাল।

কয়েকজন যাত্রী রানাকে সাহায্য করতে নড়ে উঠেছে, এর ফলে বোট আরও বেশি কাত হলো।

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা সবাই পড়ে যাব!;'

'নড়বে না কেউ!' চাপা স্বরে ধমক দিল রানা।

ব্রায়েসের কজি ধরে টেনে তুলতে চাইল ও। দশ সেকেণ্ড পর লোকটার আরেক কব্জি হাতে পেল। গায়ের জোরে টানল রানা, ধীরে ধীরে নিজে পিছিয়ে চলেছে। গতি শামুকের মত। দেড় মিনিট পর লোকটার দেহ বোটে উঠে এল।

উপর থেকে সোহানা দেখল এ-ঘটনার ফলে আস্তে আস্তে বোট একদিকে আরও কাত হয়ে পড়ছে। কাউকে কিছু বললেই...

ব্যস্ত হয়ে চারপাশ দেখল সোহানা, কিছু যদি পাওয়া যেত যেটা কাজে লাগবে! অন্ধকারে আগে দেখেনি, এবার চোখে পড়ল লাইফবোট থেকে খানিকটা নীচে, জাহাজের পাশে আটকে রাখা হয়েছে ধাতব গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক। দ্রুত ভাবল সোহানা, উইঞ্চ যদি লাইফবোট তুলতে না-ই পারে, ওই চওড়া গ্যাংপ্ল্যাঙ্কটা তো নামিয়ে দিতে পারে? পরিকল্পনাটা দেরি না করে ফাস্ট অফিসারকে জানাল ও।

ব্র্যাডলি কেইবল সিকিওর করতে ব্যস্ত, অন্য অফিসারদের বলল, 'ইনি যা বলছেন, করো!'

দু’এক কথায় মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দিল সোহানা । লোকগুলো দৌড়ে গেল জাহাজের পাশে আটকে রাখা চল্লিশ ফুটি গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের কাছে।

ব্রায়েসকে বোটে টেনে তুলেছে রানা, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না; কারণ, কয়েক সেকেণ্ড পর ওরা সবাই সাগরে গিয়ে পড়বে!

সবাই বুঝতে পারছে এবার বোট উল্টে যাবেই। নীচে চেয়ে আছে তারা। কিন্তু ঠিক তখনই দেখল বোটের নীচে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক পেতে দেয়া হয়েছে!

কিন্তু যে-কেউ এখনও সাগরে গিয়ে পড়তে পারে! কেইবল নিয়ে ক্রল করে বো’র কাছে চলে গেল রানা, কেইবলটা ঠিক জায়গায় আটকে দিল- এবার উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদের উদ্দেশে হাতের ইশারা করল।

তারা ধীরে ধীরে লাইফ-বোটটা গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের উপর নামিয়ে দিল।

সবাই এবার উঠে দাঁড়াল, গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে নামার জন্য ব্যস্ত।

‘আপনারা একজন একজন করে নামুন!’ নির্দেশ দিল রানা। একটু চমকে গিয়ে ভাবল, ওর গলা বস-এর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের মত লাগল না। মনে মনে বলল, ওরে ব্যাটা, তোর আর বুড়ো বাঘের মত হতে হবে না!

আট

ন্যান্সি যে এলিভেটরে আটকা পড়েছে, সেটার তিনদিকে ধাতব হ্যাণ্ডরেইল আছে, মেঝে থেকে চার ফুট উপরে। লিফটের দেয়াল স্বভাবতই মসৃণ। ন্যান্সি যতবার হ্যাণ্ডরেইলে উঠতে চেয়েছে, ততবারই পিছলে পড়েছে। দু’হাতে রেইল ভালভাবে ধরা যায় না। এমনিতে কোনও কাজ করতে না পারলে

ন্যান্সি বাচ্চাদের মত অধৈর্য হয়ে ওঠে -কিন্তু এই অন্ধকারে ও যেন নতুন এক মানুষ হয়ে উঠল। বারবার হাতলে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে গেল। ভাল করেই জানে, পা রাখবার কোনও জায়গা নেই, তবে এটাও জানে হাল ছাড়লে চলবে না। একবারও ভাগ্যকে অভিশাপ দিল না ও।

বিশেষ কোনও পরিকল্পনা নেই ওর, তবে সঙ্কল্পই এখন চালিকা শক্তি -যে-করে হোক, হাতলের উপর উঠতেই হবে ওকে! অন্তরে বুঝে গেছে, মনকে এখন যে-কোনও কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে, নইলে আতঙ্ক চেপে ধরবে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হ্যাণ্ডরেইলে এক হাঁটু তুলে দিল, তারপর দু'দিকের দেয়াল দু'হাতের তালু দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। পুরো দেহ স্থির করল, একইসঙ্গে দ্বিতীয় হাঁটু হ্যাণ্ডরেইলে তুলে নিল। এখন ওর প্রধান সমস্যা উল্টে পড়া ঠেকানো। পড়লে চলবে না। দু'হাতে দু'দিকের দেয়ালে চাপ বাড়াল, এবার আস্তে আস্তে এক পায়ে ভর দিয়ে টলমল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। একইসঙ্গে দ্বিতীয় পা সোজা করে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যাণ্ডরেইলে উঠে দাঁড়াতে পারল ন্যান্সি। দেয়াল থেকে এক হাত সরিয়ে নিয়ে এলিভেটরের ছাদে রাখল। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমল।

ন্যান্সির মাথা ছাত থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নীচে। ঝুঁকে আছে ও। দু'পা শক্ত করে হ্যাণ্ডরেইলে রাখল, এক হাতে ছাতের ট্র্যাপডোর খুঁজতে চাইল। টিভি বা সিনেমার লোকজন সবসময় লিফটের ছাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। ন্যান্সি জানে না এলিভেটর-শাফটে পৌঁছলে কী হবে -ওখানে যাবে ভাবতেই কাঁপতে শুরু করল বুক।

নিজেকে বলল, আমি শুধু এই ইস্পাতের কৌটা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। ও জানে ট্র্যাপডোর ছাতেই থাকে, ওখান দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। হোক না জায়গাটা কোনও এলিভেটর-শাফট, তবুও এই আঁধার বাক্সের চেয়ে অনেক ভাল।

ছাতে চৌকো একটা পাত সত্যিই খুঁজে পেল ন্যান্সি –ওটা তিন বাই দু'ফুট। ওই ইস্পাতের পাতে হাতের চাপ বাড়াল ও, সরতে শুরু করল জিনিসটা। ওর মনে হলো, কপাল এতক্ষণে খুলতে শুরু করেছে। ছাতের এই ট্র্যাপডোর যদি লিফটের মাঝখানে থাকত? ও তো দুহাতে ধরতেই পারত না! ওর ভাগ্য ভাল, এদিকের হ্যাণ্ডরেইলে উঠেছে, নইলে ওটা খুঁজেই পেত না!

হাতের জোরে পাত উঁচু করল ন্যান্সি, একপাশে সরিয়ে দিল। বাইরের কিছু দেখবার আগেই শীতল নোনা হাওয়া ওকে স্পর্শ করল। এ মুহূর্তে ওই লোনা গন্ধই ফুলের চেয়ে মিষ্টি লাগল।

কোমর সোজা করে এলিভেটর শাফটের দিকে চাইল, উপরে জ্বলজ্বলে আলো। শাফটের অনেক উপরে কাচের ছাত। বিভিন্ন তলার এলিভেটরে আলোর আভা রয়েছে। দরজাগুলোর তলা দিয়েও আলো আসছে। একটু অবাক হলো ও, অন্যান্য লিফট ওঠা-নামা করছে না। এরকম তো হওয়ার কথা নয়! ও যেটায় আছে, সেটার চেয়ে অনেক নীচে লিফটগুলো। সবগুলো নষ্ট হয়ে গেল নাকি? আন্দাজ করল, মিস্ত্রিরা এলিভেটরগুলো মেরামত করতে ব্যস্ত। কিন্তু ওর এলিভেটর খুলবে কখন?

ন্যান্সি এখনও জানে না, যা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বড় বিপদে পড়েছে। যদি জানত বেশিরভাগ যাত্রী জাহাজ ত্যাগ করেছে, রয়ে গেছে শুধু একটা লাইফবোট আর ওটার যাত্রীরা, ভয়ে কলজে শুকিয়ে যেত ওর।

ন্যান্সি বুঝতে পারছে, বেশিক্ষণ হ্যাণ্ডরেইলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাই বলে আবারও ওই বদ্ধ কারাগারে নেমে যাবে? অসম্ভব! দরজা খোলার পথ খুঁজে পেয়েছে ও! মনে অন্য একটা চিন্তা এল, ও যদি এলিভেটরের ছাতে উঠে যায়? ওখানেই চুপচাপ বসে থাকবে-মিস্ত্রিরা যখন দরজা খুলবে, দেখবে ও ট্র্যাপডোর খুলে আরামসে বসে আছে ছাতে। কেউ তখন বলতে পারবে না ও একটা অসহায় মেয়ে, ওকে উদ্ধার না করলে আটকা পড়েই থাকত।

চিন্তাটা পছন্দ হলো ন্যান্সির।

লিফটের ছাতে উঠে যেতে হলে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে -হয় সফল হবে, নইলে এলিভেটরের মেঝেতে আছড়ে পড়বে। ছাতে উঠবার চেষ্টা করতে তো দোষ নেই! আস্তে আস্তে ট্র্যাপডোরের দুদিকে হাত রাখল ন্যান্সি, শক্ত করে কিনারা ধরল। হাঁটু একটু ভাজ করে তৈরি হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর দেহ সোজা করে নিয়েই উপর দিকে লাফ দিল। এক ঝাঁকিতে উঠে গেল অনেকটা। ট্র্যাপডোরের ফাঁক গলে বুক পর্যন্ত উঠেই দু’কনুই, বাহু ও পাঞ্জা দু’পাশে ফেলল। ওর কোমর এখনও লিফটের ভিতর। নিজেকে ভাবতে দিল না, শুধু মনে রাখল, যেমন করে হোক শরীরটা ছাতের উপর টেনে তুলতে হবে। নিজেকে বোঝাল: দেখলে, আসলে ভয়ের কিছুই নেই! দু’হাতের জোরে উঠে যেতে চাইল, পা দুটো পাগলের মত বাতাসে ছুঁড়ল। মুহূর্ত পর ডান হাঁটু ছাতে উঠে এল। এরপর বাম পা-ও। হাঁপাতে হাঁপাতে সারে বসল, পা দুটো ট্র্যাপডোরের ভিতর টেনে নিল। ওর একটু বিশ্রাম দরকার। মনে মনে বলল, ‘এখন উদ্ধার করতে আসুক না কেউ! আমি তৈরি!’

লাল রঙা পোশাকটার কথা মনে পড়ল ওর। বাবা-মা এটা পছন্দ করেননি। কিন্তু ও তো নিজের পয়সায় কিনেছিল এটা! পছন্দ হয়েছিল বলেই না। ইশশ, একদম নষ্ট হয়ে গেল! লিফটের ছাত গ্রিজে মাখামাখি, তার সঙ্গে মিশেছে ধুলো! কাপড়টা কয়েক জায়গায় ফড়াৎ ফড়াৎ করে ছিড়েছে। মনে মনে আফসোস করল ন্যান্সি, ওর বাবা-মা এরকম মানুষ কেন? অন্য ছেলে-মেয়েদের বাবা-মা তো এমন না। ওরা কত সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে!

ছাতের উপর উঠে দাঁড়াল ন্যান্সি, শাফটের চারপাশ দেখতে শুরু করল। সব এলিভেটরের সঙ্গে মোটা কেইবল থাকে, ওগুলো অনেক উপরে চলে যায়। শাফটের ছাত থেকে আলো আসছে। চিন্তাই করা যায় না কোনও কেইবল বেয়ে উঠে যাওয়া সম্ভব। সেটা ও পারবে না। কিন্তু অন্য কিছু তো করা যায়। পাশের এলিভেটরের কেইবল ধরে সরসর করে নেমে গেলে? পাশের এলিভেটর অনেক অনেক নীচে। কিন্তু ও সহজেই কেইবল বেয়ে নেমে যেতে পারবে।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে ছাতের কিনারা খুঁজল ন্যান্সি, পেয়েও গেল। আবছা আলোয় দেখল, ও যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার ঠিক এক ফুট দূরে ছাত শেষ । পড়লে ওখান থেকে অনেক নীচে গিয়ে পড়বে। শিউরে উঠল ন্যান্সি। এই অন্ধকারে দূরের কোনও এলিভেটরের কেইবল ধরা -অসম্ভবও তো ! আর সুপার উয়োম্যান নয়!

জাহাজের এলিভেটরগুলো খুব বেশি বড় নয়। শাফটের উপর দিকে আলো, সেই আলোয় মনে হয় ওর নিজের এলিভেটরের কেইবল খুব কাছেই থাকবে। অন্ধকারে চেয়ে রইল ন্যান্সি। কিছুক্ষণ পর আঁধারে কী যেন একটু চকচক করে উঠল। কেইবল? হয়তো!

দাঁড়িয়ে থেকে অদৃশ্য ছাতের কিনারা দেখল ন্যান্সি, পাশের এলিভেটরটাও। অনেক নীচে ওটা। ওই এলিভেটরের উপর কেইবল থাকবে। ওটার উপরের দিকে চাইল ন্যান্সি, খুঁজে নিল কেইবল। ওটা অনুসরণ করল ওর চোখ, তার নেমে গেছে এলিভেটরের দিকে। আবারও নজর বোলালো উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। বুঝতে চাইল ওটা ঠিক কোন জায়গা দিয়ে গেছে। কোনও সন্দেহ নেই, চারফুট দূর দিয়েই....

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল ন্যান্সি, পরমুহূর্তে এলিভেটরের ছাত থেকে পাশের কেইবলের দিকে ঝাপ দিল!

ব্র্যাডলি ও অ্যাডামস রেইডার স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ঘন কুয়াশার কোনও স্তর,' বলল অ্যাডামস। 'কিন্তু ওটা নড়ছে না।'

'হায় ঈশ্বর!' আঁৎকে উঠল ব্র্যাডলি। কী বলা হয়েছে বুঝেছে। 'মন্টসেরেট!' নাইট ভিশন বিনকিউলার দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকাল সে। দ্বীপটা দেখা গেল না।

'লোকটা মনে হয় ওটার বন্দরে জাহাজ থামাবে,' অনিশ্চিত স্বরে বলল অ্যাডামস।

'কোথায় চলেছে?'

'ব্যাসটেয়া বন্দরের দিকেই।'

'না,' এককথায় নাকচ করে দিল ব্র্যাডলি। 'আমরা বেইলিফ ক্লিফে গিয়ে আছড়ে পড়ব।'

'ক্লিফ? ওই দেয়ালে নিয়ে ফেলবে আমাদের?'

'আমরা কতক্ষণ পর ক্লিফে গিয়ে ধাক্কা দেব?' দুই অফিসারের পিছন থেকে জানতে চাইল একটা পুরুষকণ্ঠ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ব্র্যাডলি ও অ্যাডামস। বদ্ধ উন্মাদটা নয়, দাঁড়িয়ে আছে সেই দুঃসাহসী বাঙালি যুবক, মাসুদ রানা।

রানার দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। ভাবছে, সন্দেহ নেই মাসুদ রানা সাহসী মানুষ, কিন্তু জাহাজ কর্তৃপক্ষকে পাত্তা দিতে চায় না। তার হয়তো ধারণা হয়েছে সে ওদের চেয়ে বেশি বোঝে।

'যান, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে থাকুন,' বলল ব্র্যাডলি। খানিক পর আমরা আপনাদের নিরাপদ একটা ডেকে সরিয়ে নেব।'

'কতক্ষণ পর ইমপ্যাক্ট?' আবারও জিজ্ঞেস করল রানা। কণ্ঠে দৃঢ়তা।

বিরক্ত হলো ব্র্যাডলি, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে, আমি জাহাজের ফার্স্ট অফিসার। যাত্রীদের ভালমন্দের জন্য আমি দায়ী থাকব, আপনি নন। মনে হয় এটাও ভুলে গেছেন যে, আপনি আমাদের কর্তৃপক্ষের কেউ নন।'

'আমি কর্তৃপক্ষের লোক নই, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন,' অদ্ভুত শান্ত স্বরে বলল রানা।

নতুন উৎসাহ নিয়ে শুরু করল ব্র্যাডলি, 'দেখুন মিস্টার রানা...'

'বলুন তো আপনারা কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন?' রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা। মিষ্টি মুখটা রাগে লাল হয়ে আছে। 'আপনারা হয়তো ভেবেছেন মিস্টার রানা অখ্যাত এক দেশের সাধারণ এজেন্ট। আসলে উনি রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির মালিক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বড় বড় শহরে ওঁর এজেন্সির শাখা আছে। আপনাদের সরকারের হোমরা চোমরা-প্রত্যেকে ওঁকে এক ডাকে চেনে এবং মানে। ওঁকে যদি তুচ্ছ কেউ ভেবে

থাকেন, তো মস্ত ভুল করেছেন। এরকম পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার স্পেশাল ট্রেইনিং আছে মাসুদ রানার!'

সুন্দরী মহিলা এমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছে যে একটু থমকেই গেল ব্র্যাডলি । ওর মন বলল, এ মহিলা একফোঁটা মিথ্যে বলেনি। এখনও কটমট করে চেয়ে আছে। ব্র্যাডলি কী বলবে ভাবতে শুরু করল।

তাকে ভাববার সময় দিল না রানা, বলল, 'আপনারা তো অটোপাইলট - নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, কিন্তু জাহাজে এমন কোনও হার্ডওয়্যার থাকতে বাধ্য, যেটা ইঞ্জিন কন্ট্রোলকে অন্যদিকে যেতে বাধ্য করবে।'

কড়া দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি। কিছুক্ষণ যেতেই বুঝে গেল, চোখের যুদ্ধে তারই হার হবে। লোকটার চোখে তাকালে অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে!ব্যাটা আবার হাসে !

মেয়েটার চাহনিও কঠোর হয়ে উঠেছে।

হারা উচিত হবে না, কিন্তু চট করে অ্যাডামসের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি।

ওস্তাদকে উদ্ধার করতে অতি দ্রুত বলল অ্যাডামস, 'স্যর, আমার মনেহয় মিস্টার রানার সঙ্গে আলাপ করা যায়।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ,' বলল ব্র্যাডলি, পুরো জাহাজ চলে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। এমন কিছু নেই, যেটা...'

'আমরা ওই লোকের রিমোট কন্ট্রোলটা খুঁজে বের করতে পারি,' বলল সোহানা। 'তখন ধোঁয়া বন্ধ করবারও ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

'স্টান গ্রেনেড আর স্মোক ক্যানিস্টার রাখা হয়েছে এয়ার ডাক্টে,' বলল রানা। 'ওগুলো গলফ বল আকৃতির হবে।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে দ্রুত বলল, 'কে এসব করছে সেটা আমি জানি। তার নাম স্ট্রাথার হ্যালেক।

আপনারা তার কেবিন নম্বর খুঁজে বের করুন। আমরা একটু তৎপর হলেই সে হয়তো ধরা পড়বে।’

‘আমাদের কাছে কোনও অস্ত্র নেই,’ বিড় বিড় করে বলল অ্যাডামস। তারপর চাইল রানার দিকে, ‘আপনি যখন আপনাদের সরকারের একজন এজেন্ট, নিশ্চয়ই আপনার কাছে পিস্তল...টিস্তল কিছু-’

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘কোনও অ্যাসাইমেন্ট নিয়ে নয়, ক্রুজ শিপে উঠেছি আমরা স্রেফ ছুটি কাটাতে। অস্ত্র নেই আমাদের কাছে। তবে চিন্তা করবেন না, আপনাদের কাছেই আছে বন্দুক, আপনাদের স্কিট গান। ওটা সংগ্রহ করে নেব আমরা।’ সোহানার দিকে তাকাল, ‘তুমি, প্লিজ, যাত্রীদের দিকে খেয়াল রাখো। আমরা হ্যালেকের কেবিনে ঢুঁ দিতে যাচ্ছি।’

আপত্তি করতে চাইল সোহানা, তারপর মেনে নিল সিনিয়রের কমাণ্ড।

দুই ফায়ার ডোরের মাঝখানে, করিডোরে আটকা পড়েছে যাত্রীরা। চেঁচামেচি করছে। ‘সবাই মাথা ঠাণ্ডা রাখুন!’ অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠল রুবি হিগিন্স। মস্ত ভূঁড়ির কারণে গলায় তার অসম্ভব জোর। ‘আমার ভিক্টর কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা করত, ও আপনাদের পথ খুঁজে দেবেএকটু অপেক্ষা ! করুন, একটু ধৈর্য ধরুন, ভিক্টর আমাদের সবাইকে উদ্ধার করবে!’

অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে চাইল ভিক্টর, গলা নামিয়ে বলল, ‘আমার ওপর সত্যিই তুমি এতটা ভরসা করো, রুবি? অনেক-অনেক ধন্যবাদ।’

‘তুমি পারবে, সুইটি,’ স্বামীর দিকে নরম চোখে চাইল রুবি।

চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকাল ভিক্টর, সবাই আশা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। ভাবছে, সে হঠাৎ করে এমন একটা বুদ্ধি বের করবে যে

সবাই উদ্ধার পেয়ে যাবে। মানুষ তার উপর নির্ভর করছে বলে ভাল লাগল ভিক্টরের। রুবি গর্ববোধ করছে, ওর স্বামী এখন সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, মাথায় তো কিছুই আসছে না! মানুষগুলো চারপাশ থেকে দেখছে তাকে, চোখে আগ্রহ -আর সেজন্যই হয়তো গুলিয়ে গেছে মাথাটা। কোনও বুদ্ধিই তো আসছে না!

রুবি বরাবরের মতই বুঝেছে ভিক্টরের মনে কী খেলছে। নরম স্বরে বলল সে, 'নিশ্চয়ই ছাতের কথা ভাবছ?'

ছাতের ফায়ারপ্রুফ ইনসুলেশন টাইলগুলো দেখল ভিক্টর। ওগুলো ধাতব ফ্রেমে বসানো। ওদিকে মনোযোগ দিলে ক্ষতি কী? লোকের ড্যাবড্যাবে চোখ অন্তত এড়ানো যাবে। 'আপনাদের মধ্যে কে সবচেয়ে হালকা?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ভিক্টর। 'আমি তাকে কাঁধে তুলে নেব, সে কয়েকটা টাইল খুলবে।' তার চোখ পড়ল চিকন-চাকন রিটা ডেলটনের উপর।

জাহাজের গায়িকা স্বেচ্ছাসেবী হতে এগিয়ে এল। রুবিকে পাশ কাটানোর সময় হাসল সে, নিচু স্বরে বলল, 'আপনি বোধহয় জানেন না, 'আমি স্কার্টের তলায় আণ্ডারওয়্যার পরি না!'

ফোঁস করে উঠল রুবি, রাগে চোখ সরু হয়ে গেছে। 'সেক্ষেত্রে আপনি ভিক্টরের ঘাড়ে উঠবেন না!' ভারী দেহ নিয়ে এক দৌড়ে রিটাকে হারিয়ে দিল রুবি, স্বামীর পিছনে চলে গেল। 'অ্যাই যে, ভিক্টর, তুমি হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসো তো!'

করুণ চোখে স্ত্রীকে দেখল ভিক্টর,' হামাগুড়ি দিয়ে বসতে হবে?'

'আলবৎ!' ধমকে উঠল রুবি।

স্বামী তার নির্দেশ পালন করতেই বিরাট একটা শ্বাস ফেলল রুবি। এবার রিটা ডেলটন বেটি যত খুশি পিঠের উপর উঠুক দেখি!

হিল খুলে ফেলল রিটা, না দাঁড়িয়ে চট করে পিঠে হাঁটু মুড়ে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে ককিয়ে উঠল ভিক্টর, 'ওরেব্বাপ রে!' দ্রুতই সামলে নিল, 'আপনি অন্তত হাইহিলের জুতো খুলতে পারতেন!'

'খুলেছি তো,' বলল রিটা। এগুলো আমার হাঁটু।'

নালিশের সুরে বলল ভিক্টর, 'আমার পিঠ চিরতরে জখম হয়ে গেছে! আপনার হাড় এত শক্ত কেন! হাঁটুতে একটুও কি মাংস নেই?'

'আপনার ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না,' আহত স্বরে বলল রিটা। 'আমার এই হাঁটুর সমান যোগ্যতাও রাখেন না আপনি!' এবার পিঠে উঠে দাঁড়াল সে, ছাত থেকে পটাপট কয়েকটা টাইল খসিয়ে কাত করে নামিয়ে আনল।

উপরে শুধু পাইপ ও তার। তার উপরে লোহার ছাত।

পিঠ থেকে নেমে পড়ল রিটা।

'ভাল করে দেখো তো, ভিক্টর,' বলল রুবি। ভিক্টরের অভিজ্ঞ চোখ হয়তো কিছু দেখবে, যেটা তাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।

'আমার কোমর গেছে, সেটা আগে দেখো।' গুঙিয়ে উঠল ভিক্টর। 'আমি উঠতেই পারছি না! আপনারা আর কেউ কখনও আমার পিঠ উঠবেন না।'

'এটা অ্যাকটিং করার সময় নয়, ভিক্টর,' কড়া স্বরে বলল রুবি। 'এখন আমাদের সাহায্য দরকার।'

'ওহো হো! অ্যাকটিং নয়,' ব্যথায় চোখ বন্ধ করল ভিক্টর, ধীরে ধীরে উঠতে চাইল, শেষপর্যন্ত দু'হাতে কোমর ধরে দাঁড়াতে পারল। উপরের দিকে

চোখ তুলল। ধূর! ওখানে আছে শুধু পাইপ, অসংখ্য তার ও লোহার ছাত। বউকে নালিশ করল সে, ‘ছাত মেরামত করতে পারি তা ঠিক, কিন্তু আমি তো আর ইলেকট্রিশিয়ান নই!’

ভিক্টর বুঝে গেছে এইবার চারপাশ থেকে টিটকারি আসবে। দেরি না করে করিডোরের আরেকদিকে চলে গেল সে। এরপর কী করা উচিত ভাবতেও রাজি নয়। না হয় সে কোনও বুদ্ধি বের করতে পারেনি, কিন্তু অন্যরাও তো পারছে না -কিন্তু ওরা তার পরেও ওকে নিয়ে মশকরা করবে। ফাজলামো! ওই লোহার ছাতে এমন কিছু নেই, যেটাকে ভাল কোনও ছাত বলা যায়!

উল্টোদিক ফিরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল ভিক্টর। দ্বিতীয়বারের মত এয়ার-কণ্ডিশনিং ভেন্টের দিকে চাইল। তার কোনও ভুল হলো না তো!

ভেন্ট থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে, সেটা ঘন সাদা কুয়াশার মত! হ্যাঁ, ধোঁয়াই তো! করিডোরে বেরিয়ে আসছে! দেখতে ঠিক সত্যিকারের ধোঁয়ার মতই, তবে মন বলছে ওটা কোনও ক্যান থেকে বেরোচ্ছে -ঠিক যেন হুইপার মেশিনের নকল ক্রিম। সিনেমার মত! আরও দূরে চাইল ভিক্টর, ওদিকের একটা ভেন্ট থেকেও একই জিনিস!

হঠাৎ সবার কণ্ঠস্বর শুনল, সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে। ঘুরে তাকাল ভিক্টর, ওদিকের ভেন্ট থেকেও ধোঁয়া আসছে! এবার জটলার দিকে পা বাড়াল সে।

ওর দিকে ছুটে এল রুবি, চেঁচিয়ে বলল, ‘ভিক্টর, কার্পেটটা মেঝে থেকে তোলো!’ চোখ চকচক করছে তার। বুঝে গেছে এবার টিটকারির হাত থেকে বাঁচা যাবে। আমরা ওটা দিয়ে ধোঁয়া ঠেকাব!’

রানা, ব্র্যাডলি ও অ্যাডামস দ্রুত পায়ে করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ একটা কেবিনের সামনে থমকে দাড়াল। ইশারায় দুই অফিসারকে দু'পাশে দাঁড়াতে বলল রানা, নিজে শটগান হাতে। সামনে দাড়াল -পরমুহূর্তে কবাটে প্রচণ্ড লাথি বসাল।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। বন্দুক হাতে কেবিনে ঢুকে পড়ল রানা, এক সেকেণ্ডে চারপাশ দেখা হয়ে গেল -ভিতরে কেউ নেই। এক লাথিতে বাথরুমের দরজা খুলে গেল। বাথরুম ফাকা। কেবিনের ডেস্কে একটা ল্যাপটপ, ওটা চলছে। দুই অফিসার কেবিনে ঢুকছে -হাতের ইশারায় মানা করল রানা। থমকে গেল তারা। কান পাতল রানা, বিল্ট-ইন ক্লজিট থেকে আওয়াজ আসছে! ডানহাতে বন্দুক তাক করল রানা, এক মোচড়ে ডোর নব ঘুরিয়েই দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে মমির মত একটা দেহ বেরিয়ে এল, দরজা পেরিয়ে মেঝেতে ধপ করে পড়ল। মানুষটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পা দিয়ে উল্টে দিল রানা। এবার তাকে চেনা গেল, হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, মুখের ভিতর মোজা, কিন্তু লোকটা ওদের স্টুয়ার্ড -জেসন। মুখ থেকে মোজা বের করে নিল রানা, ওটা দিয়ে মুখ ভরা রক্ত মুছল। মানুষটা চোখ মেলল।

'সবাই মিলে আমাকে খুন করতে চাইছে কেন?' আপত্তির সুরে বলল জেসন।

হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিল রানা, এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল। দুই অফিসার কেবিনে ঢুকে পড়েছে, ন্যাভিগেটর অ্যাডামস ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দুমিনিট চেষ্টা করে বুঝে গেল, অটো-পাইলট সরাতে পারবে না। 'ওভাররিড করা যাবে না, হতাশ হয়ে বলল। লোকটা সমস্ত কোড বদলে ফেলেছে।'

বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ব্র্যাডলি, বাথটাবের পানিতে অনেকগুলো জোঁককে সাঁতার কাটতে দেখে চমকে গেল। তিক্ত স্বরে বলল, 'যিশু! লোকটা বদ্ধ-উন্মাদ! মানসিক রোগী!'

'প্রায় ঠিক তা-ই,' কে যেন জোর গলায় বলে উঠল!

বন্দুক হাতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, কিন্তু হ্যালেক কোথাও নেই। কণ্ঠস্বর বলে চলেছে, ল্যাপটপ থেকে ভেসে আসছে, 'একটু ভুল বলেছ! আমি মানসিক রোগী নই, কিন্তু শারীরিক ভাবে অসুস্থ! আমি যদি আনন্দেই থাকতাম, তা হলে তোমাদের এখানে আসতাম? তা হলে তো তোমাদের অকৃতজ্ঞ মালিক পক্ষের জন্য কাজই করতাম!'

ল্যাপটপের সঙ্গে খুদে একটা ভিডিও ক্যামেরা লক্ষ করেছে। রানা, ওটার দিক থেকে অন্যদিকে সরল ও, নিঃশব্দে ব্র্যাডলি, অ্যাডামস ও জেসনকে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে বলল।

বুঝেছে তারা, নীরবে বেরিয়ে গেল।

ল্যাপটপের মুখোমুখি হলো রানা, শান্ত স্বরে বলল, 'আমি চিনি তুমি কে।'

'তাই?' আমিও তোমাকে চিনি।' এক মিনিট পেরিয়ে গেল। হ্যালেক ভল্টের সব হীরা ব্যাগে পুরে ছোট্ট কম্পিউটারের মনিটরে রানাকে দেখল। নিঃশব্দে তিক্ত হাসল। তুমি শালা সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে মৌজ করবে, আর আমি শালা একা মরব? কীবোর্ডে বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ করল সে, কয়েকটা নির্দেশ পাঠিয়ে দিল। কাজটা শেষ করে বলল, 'দেখো রানা, আমি এই পুরো অটো-পাইলট সিস্টেম আবিষ্কার করেছি। এই জাহাজের মালিক যে কোম্পানি, আমি সেখানে কাজ করতাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি ওদের

তিন শ’ জাহাজে কম্পিউটার সেট করেছি। পানির মত সহজ করে দিয়েছি ওদের এত বড় ব্যবসা। কিন্তু সেই আমিই যখন অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ওরা সামান্য ক’টা টাকা ধরিয়ে দিয়ে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিল!’

রানার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে, আস্তে আস্তে পিছিয়ে চলেছে। এক পলকে চারপাশ দেখল।

‘আমার কিছুই করার ছিল না, ওরা আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিল,’ বলে চলেছে হ্যালেক। ‘কাজেই... আমি ঠিক করলাম, প্রতিশোধ নেব, আমার কম্পিউটার দিয়েই আক্রমণ করব ওদের কম্পিউটার সিস্টেমকে।’

হ্যালেকের ছোট্ট কম্পিউটারের স্ক্রিনে একের পর এক ডেটা ভেসে উঠছে, তারপর সব থেমে গেল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল, ‘আমি তৈরি।’

কেবিনে সন্দেহ করবার মত কিছু দেখছে না রানা। কিন্তু খচখচ করছে মন, ঘাড়ের ছোট রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

মনে মনে হাসছে হ্যালেক, ধীরে ধীরে বলল, ‘বলো তো, মাসুদ রানা, কখনও কি তোমার মন বলেছে, তুমি নিরাপদ, কোনও বিপদে নেই?’

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চোখ চলে গেল রানার। ওখানে কী যেন ফুটে উঠছে। তারপর দেখা গেল, মাত্র দুটো শব্দ: ‘গুড-বাই, রানা!’

মুহূর্তে রানা বুঝে নিল কোনও ট্রিগার টেপা হয়েছে, আর সেটার কারণে মৃত্যু ঘটতে চলেছে ওর!

দেরি না করে সামনের মেঝেতে ঝাপিয়ে পড়ল রানা।

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলো কেবিনকে ভাসিয়ে দিল -প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো ল্যাপটপ! আগুনের শিখা ছুটল চারপাশে! বাইরের করিডোর আলোকিত হয়ে উঠল!

নয়

খানিকক্ষণ পর লেলিহান আগুন নিভে গেল। ব্র্যাডলি, অ্যাডামস ও জেসন দৌঁড়ে কেবিনে ঢুকল। ধোঁয়ার কারণে চারপাশ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তারই ফাঁকে রানাকে দেখা গেল, মেঝেতে পড়ে আছে। তিনজন মিলে ওকে তুলে করিডোরে নিয়ে এল।

রানার শরীরে দুই-এক জায়গায় সামান্য চোট লেগেছে, এ ছাড়া সব ঠিকঠাক। অবশ্য কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না।

'জিযাস ক্রাইস্ট!' খেপে গিয়ে চেঁচাল ব্রাডলি। রানা আস্ত আছে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পরক্ষণে বলল, 'বলুন তো আপনি কী ধরনের গোয়েন্দা! আপনি তো, মনে হচ্ছে, আমাদের সবাইকে খুন করাবেন!'

'ওই বুদ্ধিটা হ্যালেকের, আমার নয়' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'এবার বলুন ইঞ্জিন কন্ট্রোল কোনদিকে।'

'আপনি কখনও শিক্ষা নেবেন না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যাডলি। 'চলুন ব্রিজে যাওয়া যাক।' জেসনকে বলল, 'তুমি যাত্রীদের কাছে যাও, সবাই উপরের ডেকে।'

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল জেসন।

'আমরা আগে জাহাজ থামাব, তারপর হ্যালেককে ধরব,' বলল রানা। 'ইঞ্জিন কন্ট্রোল আমি নিজেই খুঁজে নেব। আপনারা ব্রিজে থাকুন।'

চমকে গেল ব্র্যাডলি -উন্মাদ লোকটা বলে কী! ক্লান্ত স্বরে বলল সে, 'মিস্টার অ্যাডামস, আপনি এঁর সঙ্গে যান।'

ব্র্যাডলির কানের কাছে ফিসফিস করে বলল অ্যাডামস্, 'স্যর, এ লোকের মগজে সিরিয়াস সমস্যা, কী যে করবে ঈশ্বর জানেন'

'আপনি এ জাহাজের অফিসার,' জোর দিয়ে বলল ব্র্যাডলি, 'আপনি দেখবেন মিস্টার রানা যেন কিছু নষ্ট না করেন।'

বন্দুক হাতে রওনা হয়ে গেছে মাসুদ রানা। লোকটা নিজেকে বলে গোয়েন্দা, আসলে কী -কে জানে! অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার পিছু নিল অ্যাডামস।

এক বৃদ্ধার কাঁধে শাল জড়িয়ে দিল সোহানা। বেচারি এখনও থরথর করে কাঁপছেন। একটু আগে যাত্রীদের অবজার্ভেশন ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

সোহানার পাশে এসে বসল সিয়েরা, তিক্ত স্বরে বলল, 'সোহানা, ন্যান্সির জন্য ওরা সার্চ পার্টি বের করবে না। কিন্তু আমি জানি ন্যান্সি লাইফ বোটে যায়নি। ও জাহাজেই আছে, কিন্তু কোথায় জানি না।'

বারবার করে একই কথা বলছে সিয়েরা, তার কণ্ঠের উপর দিয়ে একটা আওয়াজ পেল সোহানা। ঠিক যেন দূর থেকে দরজা বন্ধ করবার মত। তারপর শোনা গেল কয়েকজন মানুষের গলায় চাপা হৈ-চৈ। 'আওয়াজটা কীসের?' বলল সোহানা।

স্টেয়ারওয়েলের দিক দেখাল ব্রায়েস। 'আওয়াজটা নীচ থেকে আসছে।'

স্টেয়ারওয়েলের দিকে রওনা হয়ে গেল সোহানা। ক্যামেরা হাতে পিছু নিল ব্রায়েস। বোট থেকে সাগরে পড়তে পড়তেও বেঁচে গেছে সে ঠিক সময় মত এই মেয়েটির বন্ধু তাকে ধরে ফেলায়। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে অনেকক্ষণ মুখ কালো করে নিজের অন্তরের গভীরে ডুব দিয়েছিল সে, জাহাজের ডেকে উঠে আসার পর আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে তার, আবার জেগে

উঠেছে। প্রফেশনাল দায়িত্ববোধ। স্টেয়ারকেসের শেষমাথায় গিয়ে থামল সোহানা, কান পাতল। সামনে সিল করা ফায়ার ডোর, কিন্তু ওপাশ থেকে কোনও আওয়াজ নেই। দরজায় থাবা দিল ওরা।

এবার ওপাশ থেকে জোরাল আওয়াজ পেল।

'ওখানে কে?' জোরে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'আমরা এখানে বন্দি!' একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল।

গলা চিনল সোহানা। সোফিয়ার স্বামী, ক্যাভিস গর্ডন।

'এখান থেকে আমাদের বের করুন!' ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের গায়িকা রিটা ডেলটনের রিনিঝিনি কণ্ঠে করুণ আকুতি।

এদের জন্য অত চিন্তিত নয় সোহানা, যতটা ন্যান্সির কথা ভেবে। আপনাদের সঙ্গে ছোট কোনও মেয়ে আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এখানে কোনও বাচ্চা মেয়ে নেই, এখানে শুধু বড় মেয়েলোক আর পুরুষমানুষ!' বিরতি নিল লোকটা, তারপর হেসে উঠল, 'হেঃ-হেঃ-হেহ! সরু-মোটা, সব সাইজের!' এ কণ্ঠ মোটা ভিক্টর হিগিন্সের। 'আমাদের এবার বের করুন প্লিজ!'

'আমরা চেষ্টা করছি!' প্রায় হুঙ্কার ছাড়ল ব্রায়েস।

দরজা খুলতে চেষ্টা করল সে। সঙ্গে হাত লাগাল সোহানা। কাঁধ দিয়ে কাটে ঠেলা দিল ওরা। কাজ হলো না। মিনিটদুয়েক চেষ্টার পর সোহানা থেমে যাওয়ায় ব্রায়েসও থামল।

'এখানে ভেন্ট থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে!' একটু দূর থেকে লিলি ল্যাংট্রির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল। 'আর আপনারা দেরি করছেন!'

ব্রায়েস ও সোহানা পরস্পরের দিকে চাইল। সন্দেহ নেই, এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর আটকা পড়েছে। কিন্তু গলাবাজি একটুও কমেনি। ভেন্টের কথা মনে রেখেছে ব্রায়েস, পাল্টা চেঁচাল সে, 'ওগুলো আপনারা বন্ধ করার চেষ্টা করুন।'

সত্যিই কয়েকটা ভেন্ট থেকে করিডোরে ধোঁয়া ঢুকছে।

ভেন্টগুলো বন্ধ করতে হবে? রুবি দেরি না করে ব্লাউজ খুলতে শুরু করল।

'রুবি!' আহত হয়ে বলল ভিক্টর। 'এ কী করছ তুমি?'

'ধোঁয়া ঢোকা বন্ধ করতে হবে,' বলল রুবি।

'না, এক মিনিট!' আপত্তি তুলল সোফিয়া। কাছের ভেন্টের কাছে চলে গেছে সে। ধোঁয়ার মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিল, তারপর বড় করে শ্বাস নিল।

'সোফিয়া, না?' আঁৎকে উঠল ক্যাভিস গর্ডন।

অ্যানিটা বুঝতে পারছে না কী ঘটছে। স্বামীর বাহুতে হাত রাখল সে, অবাক হয়ে বলল, 'উনি ধোঁয়া গিলছেন কেন!'

'একটু অপেক্ষা করুন!' ওপাশ থেকে বলল সোহানা। 'আমরা আপনাদের বের করে আনব?'

'কী করে?' ওর পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল ব্রায়েস। 'আমরা কী করব যার ফলে ওরা বেঁচে যাবে?'

'এখনও জানি না কী করব,' বলল সোহানা। দ্রুত চারপাশ দেখল, ওর চোখে পড়ল ভাঙা ফায়ার-বক্স। ওটার ভিতরে একটা ক্রো-বার পড়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এল সোহানা, ফিরে এসে ব্রায়েসের হাতে তুলে দিল। বলল, 'এটা দিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা করুন!'

‘কোনোই কাজ হবে না!’ বলল ব্রায়েস। ‘ইস্পাতের দরজা!’

‘চেষ্টা তো করুন!’ দৃঢ় স্বরে বলল সোহানা। ‘আমি অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে আসছি!’

দীর্ঘ দুটো মুহূর্ত ন্যান্সির মনে হলো ও গাঢ় অন্ধকারে শূন্যে ভাসছে, কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে! তারপর কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। ওগুলো পাশের এলিভেটরের কেইবল! দুহাতে জাপ্টে ধরল ন্যান্সি ওটা, দু’হাঁটু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল । কেইবলগুলপ ভারী গ্রিজ মাখানো, বুঝল পিছলে নামছে ও! দু’হাত ও হাঁটু দিয়ে পতন ঠেকানো যাবে না! কয়েক সেকেণ্ড ভয়ঙ্কর ভয় পেল ন্যান্সি। তারপর বুঝল, কেইবল জোরে চেপে ধরলে আস্তে আস্তে নামা যাবে। এর বেশি আর কী চাই!

ওর মনে হলো সারাজীবন ধরে নামছে তো নামছেই! একটু পর বুঝল ও আছে সাব-সাব-বেজমেন্টে। কখনও ভাবেনি জাহাজে এরকম জায়গা থাকবে। নেমে চলেছে ও, ভাল, মানুষগুলো হঠাৎ কোথায় গেল! কেন কেউ বুঝতে পারছে না। এলিভেটরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে! তাও ভাল, বাবা! এলিভেটর যদি হঠাৎ সাঁইসাঁই করে উঠে যেত? ও তো শাফটের শেষে কাঁচের ছাতে গিয়ে বাড়ি খেত! মরেই যেত!

কিছুক্ষণ পর এলিভেটরের ছাতে ধপ করে নামল ন্যান্সি। শাফটের মধ্যে মৃদু আওয়াজ হলো। ন্যান্সি মনে মনে ভাবল, আমি তো রীতিমত এলিভেটর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছি! দু’হাতে ছাতের প্যানেল খুলে ফেলল, আস্তে করে নেমে পড়ল এলিভেটরে।

লিফটের দুই দরজা প্রায় বন্ধ, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে ফাঁকটা গলে বেরিয়ে গেল ও। একটু নেচে নিল, মুক্তি পেয়ে গেছে! পরমুহূর্তে বুঝল, চারদিকে মানুষজনের ভিড় নেই। জাহাজ তো এমন হয় না! এ জায়গা ফ্যাক্টরির ওয়্যারহাউসের মত। সিনেমায় দেখেছে। জায়গাটা ঠিক সেই রকম? চারপাশে অসংখ্য ক্রেট! দেখলে মনে হয় ওগুলো গুদামে এনে রাখা হয়েছে।

নিজের দিকে চাইল ন্যান্সি। সারা শরীর গ্রিজে মাখামাখি। সাবান দিয়ে ধুয়ে এসব দূর করা যাবে কি না কে জানে! ওর সুন্দর পোশাকটা গেছে! দেখলে মনে হয় ন্যাকড়া! গাড়ির মিস্ত্রিরা এগুলোতে দু'হাত মোছে! তাতে কী? মন ভাল হয়ে গেল ন্যান্সির, একটা জামা নষ্ট হয়েছে তো কী হয়েছে - নিজের চেষ্টায় খাঁচার ভিতর থেকে মুক্তি পেয়েছে, এটাই কি কম?

ক্রুদের সিড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে চলেছে রানা ও অ্যাডামস, জাহাজের নীচের অংশে চলে এল। ইঞ্জিন কন্ট্রোল-এর ডাবল দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। জায়গাটা দেখতে হিউস্টনের নাসা স্পেস প্রোগ্রামের মিশন কন্ট্রোলের মত, চারদিকে অসংখ্য কন্ট্রোল প্যানেল ও ডিজিটাল ডিসপ্লে। একটা কম্পিউটারের সামনে বসল অ্যাডামস, ডেটা দিতে শুরু করল।

'এগুলোর মধ্যে কোনটা অটো-পাইলট নিয়ন্ত্রণ করে?' জানতে চাইল রানা।

'আমি ঠিক জানি না,' চট করে একবার রানাকে দেখে নিয়ে কাজে মন দিল। ব্যস্ত, কিন্তু তারই ফাঁকে বলল, 'আজকাল তো সবকিছুই চালায় কম্পিউটার। বেশিরভাগ জিনিস আমাদের অপারেট করতে হয় না। অটো-পাইলট যে ঠিক কোনটা আমার জানা নেই।'

লোকটার দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর সামনের টেবিল থেকে বড় একটা রেঞ্চ তুলে নিল। ‘এই প্যানেলও তো হতে পারে?’ বলেই ধাই করে মারল ওটায় রেঞ্চ দিয়ে। মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল প্যানেল।

তাড়াতাড়ি করে রেডিও চালু করল অ্যাডামস, জরুরি স্বরে বলল, ‘স্যর, আমি অ্যাডামস, ইঞ্জিন কন্ট্রোল থেকে বলছি! মিস্টার রানা আমাদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট ভাঙছেন!’

এবার রেঞ্চের দুই বাড়িতে কম্পিউটার স্ক্রিন ও ডিজিটাল ডিসপ্লে চুরমার হয়ে গেল।

বিধ্বস্ত ইলেকট্রনিক্সগুলো দেখল অ্যাডামস, এখনও রেডিওতে নিচু স্বরে বলে চলেছে, ‘মিস্টার ব্র্যাডলি, শুনছেন? কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?’

‘এমন কিছু থাকতে বাধ্য যেটা কম্পিউটারের সঙ্গে জড়িত নয়!’ বলল রানা। অলস ভঙ্গিতে রেঞ্চ দোলাল। কাঁধে ঝুলছে শটগান।

‘অনেক কিছুই আছে,’ বলল অ্যাডামস । ‘কিন্তু এমন কিছু নেই, যেটা এই বিপদে আমাদের কাজে লাগবে।’

‘ওই সুইচগুলো কীসের?’ ডেস্কে বসানো সুইচগুলোর দিকে আঙুল তুলল রানা। পরমুহূর্তে লেবেল পড়ে বলল, ‘ওপেন ব্যালাস্ট রিলিজ...’

‘ধরবেন না ওটা!' চমকে গেল অ্যাডামস। কাতর সুরে বলল, ‘আপনি কি জাহাজের নীচের অংশ বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চান? ওই সুইচগুলো ব্যালাস্টের দরজা খুলে দেবে। ওটা আমাদের কোনও কাজে লাগবে না।’ ডানদিকের একটা ভিডিও মনিটর দেখাল অ্যাডামস। স্ক্রিনে দেখা গেল মস্ত এক দরজা। ‘আমরা এখানে বসে কিছুই করতে পারব না। স্ট্রাথার হ্যালেক

আমাদের সবদিক দিয়ে আটকে দিয়েছে। আমরা না পারব থামতে, না পারব জাহাজ অন্যদিকে সরিয়ে নিতে।'

'আপাতত,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমাদের গতি কমাতে হবে।'

'গতি কমানো?' রানার দিকে তাকাল অ্যাডামস। চেহারা দেখে মনে হলো রানাকে বদ্ধ উন্মাদ মনে করছে। 'আপনি কী ভেবেছেন, মিস্টার রানা? এটা জাহাজ, গাড়ির মত চাকা নেই যে বাতাস বের করে দেবেন।'

'ঠিক,' বলল রানা, মৃদু হাসছে। 'আপনার কথাই মেনে নিলাম।'

'বাতাস তো ছাড়তে পারব না, কিন্তু ব্যালাস্ট ডোর খুলে দেব। জাহাজ পানিতে ভরে উঠুক!'

সুইচগুলোর দিকে পা বাড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল অ্যাডামস। 'আপনি কী করবেন ভাবছেন?' মনে মনে ভাবল, যতক্ষণ পারা যায় আপত্তিকর লোকটাকে বাধা দেবে।

'আপনিই বলেছেন আমরা যদি দরজা খুলে দিই, জাহাজের তলার অংশ ডুবে যাবে,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'এতে জাহাজের গতি কমতে বাধ্য।'

'আমি তা বলিনি!' তাড়াতাড়ি করে বলল অ্যাডামস। গলা চড়ে গেল, 'পানি যদি বেশি ঢুকে যায়, জাহাজ ডুবে যাবে।'

মৃদু হাসল রানা, কোনও কথা নেই।

অ্যাডামস নতুন করে আরেকবার রেডিওতে বলতে শুরু করল, 'অ্যাডামস বলছি, ব্রিজের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওখানে কি...'

এক থাবায় রেডিওটা কেড়ে নীল রানা, অ্যাডামসকে সুইচগুলো দেখাল। নির্দেশের সুরে বলল, 'দেরি না করে ব্যালাস্ট ডোর খুলে দিন!'

করিডোরে আটকে যাওয়া সমস্ত মহিলা-পুরুষ তাদের ব্লাউজ ও শার্ট দান করেছে এয়ার ভেন্ট বন্ধ করতে। পোশাকগুলোর কারণে এখন করিডোরে খুব বেশি ধোঁয়া ঢুকছে না। তবে পুরোপুরি ঠেকানোও যায়নি।

স্বামীর দিকে তাকাল রুবি। 'ভিক্টর, তোমার প্যান্ট খুলে দাও।'

'আমার প্যান্ট?' চমকে গেল ভিক্টর। করুণ স্বরে বলল, 'আর কেউ তো তাদের প্যান্ট খোলেনি!'

'আমি আমার প্যান্ট দিয়েছি,' বলল য্যাঙো, নিজের অ্যাথলেটিক পা দেখাল। জকি শর্টস পরেছে সে। শার্ট-প্যান্ট খুলবার ফলে বেশিরভাগ লোককে এখন পুরুষালী দেখাচ্ছে।

'দেখো, আমার বাবা মেথোডিস্ট সাধু ছিলেন,' বলল ভিক্টর। 'আমি চাইলেই তো প্যান্ট খুলে দিতে পারি না! বাপের সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা...'

সোফিয়া একটা ভেন্টে নাক প্রায় গুঁজে দিল। বিরাট হাঁ করে ধোঁয়া গিলছে। এরই ফাঁকে কথা শুনে হেসে ফেলল। তার মুখ থেকে ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে এল।

সেগুলো আবার গিয়ে পড়ল লিলি ল্যাংট্রির চোখে-মুখে, তীক্ষ্ণ স্বরে আপত্তি তুলল সে, 'ধোঁয়া আপনি অন্যদিকে ছাড়ুন! মানুষ এখানে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে!'

সোফিয়ার স্বামী ভেন্টে তার শার্ট গুঁজে দিয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে বলল, 'ধোঁয়া তার পরও আসছে!'

'তোমার প্যান্ট, ভিক্টর!' কড়া স্বরে বলল রুবি। 'এক্ষুনি তোমার প্যান্ট চাই!'

রিটা ডেলটনের দিকে আঙুল তাক করল ভিক্টর। 'আমি জানতে চাই এই মহিলা কেন কিছুই খুলল না!'

'কারণ আমি যে পোশাকের নীচে আণ্ডারওয়্যার পরিনি!' বলল রিটা।

ভীষণ হতাশ হলো ভিক্টর, 'বাধ্য হয়ে প্যান্ট খুলছে।'

অ্যাডামসের দু'হাত থরথর করে কাঁপছে, একের পর এক সুইচ টিপছে সে। ওগুলোর উপর লেখা: কার্গো ওপেন।

'আরও তাড়াতাড়ি করুন,' তাড়া দিল রানা।

'জাহাজে আগে কখনও লাখ লাখ গ্যালন পানি ঢুকাইনি,' আপত্তির সুরে বলল অ্যাডামস। 'একটু সময় দিন।'

এক ও দুই নম্বর কার্গো দরজা খুলে দিয়েছে সে। ঘরে অনেকগুলো মনিটর চলছে, সেগুলোর মধ্যে দুটো স্ক্রিনে দরজাগুলো দেখা গেল। আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে, সাগরের পানি। হুড়মুড় করে ঢুকছে ভিতরে!

'পানি বাড়ছে,' বলল অ্যাডামস। 'এবার আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে!'

শেষবারের মত সারি সারি মনিটরের দিকে চাইল রানা, পানি ঠিক মত উঠে আসছে কি না দেখবে। হঠাৎ একটা মনিটরে চোখ আটকে দেখল ওর। এইমাত্র মনিটরে এসেছে ন্যান্সি। হেঁটে চলেছে ও। পরের মনিটরে চলে গেল। ভীষণ চমকে গেছে রানা। সাগরের তীব্র স্রোত জাহাজে ঢুকছে, কিন্তু মেয়েটা ওই আওয়াজ পাবে না! ও জানেই না কী ঘটতে চলেছে! যখন পানির ঢেউ দেখবে, ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে!

‘ব্যালাস্ট ডোর বন্ধ করুন!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। ‘বন্ধ করুন জলদি!’

‘কী বললেন?’ জানতে চাইল অ্যাডামস। এখনও মনিটরে ন্যান্সিকে দেখেনি সে। এইমাত্র আপনিই তো বললেন ওগুলো খুলতে। রানার চোখ অনুসরণ করল সে, পরক্ষণে দৌড় দিল সুইচগুলোর দিকে। যেভাবে হোক ভুল শুধরাতে হবে! দরজা দুটো সাগরের পানির বিরুদ্ধে যুঝছে। আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে!

এখনও রানার পরনে সুট, কাঁধে বন্দুক -ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ও, দৌড়ের গতিতে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আন্দাজ করে নিয়েছে এই সিঁড়ি ওকে কার্গো হোল্ডে পৌঁছে দেবে। পঁচিশ সেকেণ্ড পর বুঝল ভুল হয়নি, স্ট্যাক করা কার্গোর ভিতর দিয়ে ছুটল ও। সামনের কোথাও থেকে গড়গড়ার আওয়াজ শুনল, মস্ত কার্গো হোল্ডে হুড়মুড় করে ঢুকছে পানি। ন্যান্সির ওকে দেখতে হবে, অথবা ন্যান্সিকে দেখতে পেতে হবে ওর -নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে!

ছুটতে ছুটতে বাঁক নিল রানা, আশপাশে ন্যান্সি নেই! আরেকটা বাঁক নিল ও। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে। আরেকটা বাঁক নিয়েই মেয়েটাকে দেখল। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছে ন্যান্সি। রানার দিকে পিছন ফিরে কী যেন দেখছে সামনে। চোখ তুলেই দেখতে পেল রানা, পানির বিশাল এক পাহাড় ধেয়ে আসছে ওদের দিকে!

কয়েক লাফে ন্যান্সির পাশে চলে গেল রানা, একহাতে ওকে ঘুরিয়ে দিল -কাঁধে তুলে নিয়েই ফিরতি পথে দৌড়াতে শুরু করল।

বাঁকগুলো পেরিয়ে এল রানা। কিন্তু পানির বেগ অনেক বেশি। ভয়াবহ কল কল শব্দ চলে এসেছে একেবারে কানের কাছে। পরমুহূর্তে পিছন থেকে আছড়ে পড়ল ঢেউ, প্রচণ্ড স্রেত ওর পা দুটো টেনে সরিয়ে নিতে চাইল। ডুবে গেল ও, তারপরও হোঁচট খেয়ে কয়েক পা এগোল। পানির নীচে হাবুডুবু খাচ্ছে ন্যান্সি। ওকে মাথার উপর তুলে নিতে গিয়ে বাম কনুইয়ে কী যেন ঠেকল। খপ করে ধরল ওটা। দু'সেকেন্ড পর বুঝল, ওটা সিঁড়ির রেলিং। প্রাণপণে ওটা ধরে রাখল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর ওদের ছেড়ে এগিয়ে গেল পানির তোড়। এখন কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে রানা। ন্যান্সিকে সিঁড়ির প্রথম ধাপে নামিয়েই তাড়া দিল। কাশতে কাশতে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ন্যান্সি। পিছু নিল রানা। একবার পিছনে তাকাল, কার্গো হোল্ডে বাড়ছে পানি। ন্যান্সিও বুঝেছে, দ্রুত সিঁড়ি বাইল।

হ্যালেকের পাম কম্পিউটার থেকে বিদঘুটে আওয়াজ বেরল। স্ক্রিনের দিকে তাকাল হ্যালেক, জাহাজের গ্রাফিক-এ একটা জায়গা দেখানো হয়েছে লাল তীর দিয়ে। এলাকাটা জাহাজের নীচের এক অংশ। স্ক্রিনে ভেসে উঠল:

'সেকশন ৯বি ফ্লাডেড, প্রোগ্রাম বদলে গেছে।'

তিন সেকেণ্ড স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল হ্যালেক ভুরু কুঁচকে। পরিষ্কার বুঝতে পারল এটা রানার কাজ -জাহাজের গতি কমাতে চাইছে হারামিটা। দাঁড়াও! হীরা ভরা ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল হ্যালেক, কী-বোর্ডে নতুন কিছু ডেটা দিল। স্ক্রিনে উঠল:

'নতুন প্রোগ্রাম ইন্সটল করা হবে?'

কম্পিউটারকে আরও কিছু ডেটা দিল হ্যালেক।

পোশাক যতই গুঁজে দেয়া হোক, এয়ার ভেন্ট থেকে এখনও ধোঁয়া আসছে। বন্দি মানুষগুলোর জন্য টিকে থাকাই কঠিন হয়ে উঠছে। দু'দিকের দুই দরজা খুলছে না কেউ। অর্ধ-উলঙ্গ যাত্রীরা ধোঁয়ার কাছ থেকে সরে থাকতে চাইছে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালে নাকে ধোঁয়া একটু কম লাগে।

কাশতে কাশতে সরে এল সোফিয়া, 'যথেষ্ট হয়েছে। আর ধোঁয়া চাই না। আমি আর জীবনেও স্মোক করব না।'

'আমি শ্বাস নিতে পারছি না!' জোরাল স্বরে বলল লিলি।

দরজার কাছে গিয়ে চেঁচাল ভিক্টর, 'তাড়াতাড়ি করুন! আমি প্যান্ট না পরা অবস্থায় মরতে চাই না!'

মোটা লোকটার প্যান্টের জন্য হা-হুতাশ শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে রেগেই গেল ক্যাভিস গর্ডন, বলল, 'খোদার দোহাই লাগে, আপনারা কেউ লোকটার প্যান্ট ফেরত দিন!'

স্টিলের বিরাট দরজার ওপাশে আছে ব্রায়েস, ক্রো-বার দিয়ে কোনও সুবিধা করতে পারছে না। সে যখন দেখল সোহানা ম্যাডাম কোত্থেকে যেন একটা চেইন স' নিয়ে আসছে, বুঝে উঠতে পারল না খুশি হবে, না হতাশ হবে। সে নিজে ক্যামেরা ছাড়া আর কোনও যন্ত্র চালাতে জানে না। তবে সোহানা ম্যাডামকে দেখে মনে হচ্ছে সব পারে, পুরুষের কাজেও কোনও আপত্তি নেই। যদিও এত সুন্দরী মহিলাকে করাত হাতে মানায় না, সন্দেহ নেই, ছবির সাবজেক্ট হিসেবে চমৎকার হবে!

'হয়তো এটা দিয়ে কাজ হবে,' বলল সোহানা। স্টার্টারে টোকা দিল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল চেইন স'।

এক লাফে সরে গেল ব্রায়েস। যন্ত্রটা নিজের সামনে ধরল সোহানা, দরজার পাশে, দেয়ালের দিকে এগোল। চ্যাঁ...ও আওয়াজ তুলে দেয়াল কাটতে শুরু করল। জলদি করে ক্যামেরা তুলে পজিশন নিল ব্রায়েস, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ফটো তুলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই ফুট বাই এক ফুট একটা অংশ কাটা হয়ে গেল। স্টিলের পাত একটু ফাঁক হতেই জায়গাটা দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

'পুরো দেয়াল কাটতে হবে নাকি,' আনমনে বলল সোহানা।

'থামবেন না!' উৎসাহ নিয়ে চেঁচাল ব্রায়েস, ক্রো-বারের বদলে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করছে বলে খুশি। 'চালিয়ে যান! চুরমার করে দিন দেয়াল!'

যে জায়গা কেটেছে, সেটার পাশে আরেকটা একই সমান গর্ত করছে সোহানা। দুটো এক সঙ্গে যুক্ত করে দিলে বড়সড় খোঁড়ল তৈরি হবে। পাঁচ মিনিট পর থামল ও। 'এবার আপনারা বেরতে পারবেন?'

খোঁড়লের ভিতর দিয়ে মাথা বের করল গর্ডন, দেখল অপরূপা মেয়েটা সামনেই, হাতে চেইন স' -ওটা এখনও বিপজ্জনক গুঞ্জন ছাড়ছে!

'আপনি ওটা একটু সরালে চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল ক্যাভিস।

রানা ও ন্যান্সি যখন সিঁড়ির উপরের ধাপে পা রাখল, পানির স্রোত ততক্ষণে ওদের কোমর ডুবিয়ে দিয়েছে। নীচের গোডাউন আগেই তলিয়ে গেছে। বুঝতে পারছে রানা, হাতে আর সময় নেই, কিন্তু নিরাপদ কোথাও পৌঁছুনো হলো না! পানি দ্রুত বাড়ছে, কোমর পেরিয়ে বুকের দিকে উঠছে! ছলবল-ছলবল আওয়াজ বাড়ছে আরও। পিছন থেকে বড় কোনও ঢেউ আসছে! বোঝা গেল, জাহাজের এ তলাতেও কোনও ব্যালাস্ট ডোর খোলা আছে!

একহাতে ন্যান্সিকে ধরে দৌড়াতে চাইল রানা। সামনে লম্বা করিডোর, শেষমাথায় চওড়া এক দরজা। ওটার দিকে ছুটতে চাইছে ওরা, কিন্তু পিছন থেকে কেউ এসে আছড়ে পড়ল! মুহূর্তে ডুবে গেল ওরা! মেয়েটার হাত ছাড়ল না রানা, মনে মনে বলল, তা হলে খেলা শেষ? এবার পানিতে ভরে যাবে করিডোর?

ঢেউ ওদের ছেঁচড়ে নিয়ে চলেছে, দরজাটার দিকেই! কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর কীসের সঙ্গে বাড়ি খেল ওরা। জোরে কোনও আঘাত পেল না। ন্যান্সিকে নিয়ে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে নানা। ঢেউয়ের প্রথম ধাক্কায় দরজা খুলে গেছে, ওটা পেরিয়ে গেল ওরা। প্রচণ্ড স্রোতের টানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে রানা।

পানির গভীরতা মুহূর্তে কমে গেল, কোমর পানিতে সোজা হয়ে চারপাশ দেখল রানা -ওরা আছে বিশাল একটা ঘরে। পানির ধাক্কার ফাঁকে চারদিক আরেকবার দেখল! ঘর ভরা ওয়াশিং মেশিন ও ড্রায়ার। ওর চোখ কিছু খুঁজছে দ্রুত। এমন কিছু, যেটা শক্ত করে ধরা যায়। এরপরের ঢেউ ওদের মেশিনগুলোর উপর নিয়ে ফেলবে। মাথায় আঘাত লাগলে জ্ঞান হারিয়ে ডুবে মরবে ওরা!

উপরের দিকে একটা কনভেয়ার লাইন দেখল রানা, ওটা মস্ত লন্ড্রি ব্যাগগুলো নিয়ে যায়। স্রোতে পা পিছলে যেতে চাইছে... বুঝে গেল, নতুন ঢেউ আসছে! ওটা আসবার আগেই যা করার করতে হবে! ন্যান্সিকে ইশারায় বলল, ও যেন পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে। রানা পিছন ফিরতেই ওর কাঁধ ধরল ন্যান্সি, পরমুহূর্তে গলা পেঁচিয়ে ধরল।

সামনের একটা ব্যাগ ধরল রানা, দু'হাতে ওটা বেয়ে উঠতে চাইল। একেকবারে ছয় ইঞ্চির বেশি উঠতে পারছে না। পঁচিশ সেকেণ্ড পর ব্যাগের পেটের কাছে পৌঁছে গেল, আর খানিকটা উপরে কনভেয়ার বেল্ট। আরেকটু উঠল রানা, পেটমোটা ব্যাগ টান খেয়ে কাত হলো -অসংখ্য মোজা আর আণ্ডারওয়্যার পড়তে লাগল নীচে। ব্যাগ আরও কাত হলো, যে-কোনও সময়ে কনভেয়ার বেল্টের হুক থেকে খসে পড়বে! আর সেক্ষেত্রে পানিতে ভেসে যাবে ওরা! পানির উচ্চতা ও স্রোত দ্রুত বাড়ছে!

পর্বতারোহীদের মত উঠে চলেছে রানা, পনেরো সেকেণ্ড পর ব্যাগের মাথা পেরিয়ে গেল -বামহাতে কনভেয়ার বেল্ট আঁকড়ে ধরল, আরেক হাতে ব্যাগটা খুলে ফেলল হুক থেকে। এবার ডানহাতে ন্যান্সিকে জাপ্টে ধরল, কয়েকবার চেষ্টা করার পর লাল পোশাকের ঘাড়ে হুক আটকাতে পারল। অসহায়ের মত ঝুলে থাকল ন্যান্সি। দেরি না করে কনভেয়ার বেল্ট দু'হাতে ধরে এগিয়ে চলল রানা। পানির খানিকটা উপরে বড় একটা সুইচ দেখেছে ও। কিছুক্ষণ পর ওটার কাছে পৌঁছে গেল, পা দিয়ে টিপে দিল সুইচ। কনভেয়ার বেল্ট কাঁপতে কাঁপতে রওনা হয়ে গেল। ওটার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ন্যান্সি।

দ্রুত হাতে ওর দিকে রওনা হলো রানা, কিন্তু ন্যান্সির কাছে পৌঁছুনোর আগেই কনভেয়ার বেল্ট ওকে নিয়ে উপর তলায় চলে গেল।

নীচতলা থেকে কনভেয়ার বেল্টের সঙ্গে উপরের তলায় চলে এল রানাও, দেখল খানিক সামনে ন্যান্সি -একটু দূরে কনভেয়ার বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে রাবারের লম্বা, চ্যাপ্টা স্ট্রিপ। কয়েক সেকেণ্ড পর ন্যান্সি ওগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়ল, গায়ে খসখসে রাবারের ঘষা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

নীচের দিকে চাইল রানা, এটাও বড়সড় একটা ঘর, কিন্তু মেঝে শুকনো। ঝুলতে ঝুলতে দেখল, সামনে বোধহয় সমস্যা রয়েছে। ওর সমস্যা নেই, কিন্তু ন্যান্সির বোধহয় আছে। কনভেয়ার বেল্টের হুকগুলো অটোমেটিক। ওগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মাল ফেলছে।

চেয়ে রইল রানা, ওই বিশাল বিনটা কি নোংরা কাপড়ের?

ওটার উপর পৌঁছে গেল ন্যান্সি। পরমুহূর্তে খুলে গেল হুক। ন্যান্সির কণ্ঠ থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ধুপ করে বিনের ভিতরে গিয়ে পড়ল ও।

না, ব্যবহৃত প্যান্টি, ব্রা বা তোয়ালের মধ্যে গিয়ে পড়েনি ন্যান্সি। নেমেছে মোলায়েম পরিষ্কার তোয়ালের উপর।

হাত থেকে কনভেয়ার বেল্ট ছেড়ে দিল রানা, ঝপ করে নেমে এল মেঝেতে।

দশ

ধোঁয়া আক্রান্ত যাত্রীদের এইট্রিয়ামে নিয়ে এসেছে সোহানা ও ব্রায়েস। তবে পোশাকগুলো আর চেষ্টা করেও এয়ার ভেন্ট থেকে বের করা যায়নি। যাত্রীরা সবাই এখন প্রায় উলঙ্গ।

'ব্যাপারটা কী?' বলল লিটা, চারপাশ দেখছে। 'জাহাজ ছেড়ে নেমে যাওয়া থেমে গেল?'

'নেমে যাওয়া?' বলল গর্ডন। 'আমরা তো এটাও জানি না হঠাৎ কী শুরু হয়েছিল!'

রুবি চমকে উঠল। ‘আমরা ডুবছি?’

‘আমাদের সঙ্গে ফ্লোটেশন কুশন আছে,’ সান্ত্বনা দিল ভিক্টর। ‘আমরা লাইফ-বোটে উঠতে না পারলেও, জাহাজ থেকে লাফিয়ে নেমে যাব।’

‘বিশ নট গতিতে?’ বলল ব্রায়েস, ‘নীচের পানি হবে শক্ত সিমেন্টের মত। যদি না-ও মরি, প্রপেলারগুলো আমাদের কেটে কুচি কুচি করবে।’

শুনে চুপ হয়ে গেল ভিক্টর। ‘যেভাবে হোক, মরব সবাই?’ ভ্রু কুঁচকে বলল রিটা।

‘আমরা কেউ মরব না,’ বলল ব্রায়েস, এদের কথা শুনে ধৈর্য হারাতে চলেছে, ‘আপনারা মাথা ঠাণ্ডা রাখুন!’

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সিয়েরার চেহারা, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। চেঁচিয়ে উঠল, ‘ন্যান্সি! ওই তো আমার ন্যান্সি।’

ন্যান্সিকে এইট্রিয়ামে ছেঁড়া পোশাকে দেখে চমকে গেল সবাই। তার সঙ্গে ভেজা, নোংরা সুট পরা মাসুদ রানা, কাঁধে ঝুলছে বন্দুক!

প্রায় একইসঙ্গে ন্যান্সির কাছে দৌড়ে গেল উইন্ট্রি ও সিয়েরা। মা’র বাড়ানো দু’হাতের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল ন্যান্সি। তিনজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। দম্পতির খেয়াল নেই ন্যান্সি গ্রিজে মাখামাখি।

এইমাত্র ওদিকে চেয়েছে সোহানা, রানাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। ‘রানা!’ মুখ তুলে চাইল, ‘কী হয়েছে তোমার?’

দু’হাতে আলতো করে সোহানার মুখ ধরল রানা, মৃদু হাসছে। ‘কিছুই না, সোহানা ডিয়ার!’

‘মিথ্যুক,’ সবাই চেয়ে আছে দেখে চট্‌ করে পিছিয়ে গেল সোহানা, গাল দুটো লাল হয়ে গেল। ছলছল করছে চোখ। আমি তোমাকে চিনি। হ্যালেক স্ট্রাথার আরও কিছু করেছে!'

‘তেমন কিছু না।’ অর্ধ-উলঙ্গ মানুষগুলোর দিকে তাকাল রানা, হেসে ফেলল। ‘এদের এই করুণ অবস্থা হলে কী করে?’ নিজের পোশাকের করুণ অবস্থার কথা ভুলে গেছে।

রানার হাসি দেখে হেসে ফেলল সোহানাও। লিলি ল্যাংট্রির অনুকরণে বলল, ‘কারণ সবাই “বিংগো বিংগো” আনন্দে ছিল।’

‘চলো, সবাইকে উপরের ডেকে নিয়ে যাই,’ বলল রানা।

‘অন্যরা টপ লাউঞ্জে,’ বলল সোহানা। ‘ফার্স্ট অফিসার বলেছে সবাই যেন একইসঙ্গে থাকি।’

‘ঠিক আছে, তাই করা যাক,’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ওর দৃঢ় কণ্ঠ শুনে তাকাল সবাই। ‘আপনারা আসুন, আমরা এখান থেকে সরে যাব।’

রানা ও সোহানার পিছু নিল যাত্রীরা। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল সবাই। বামে পড়ল ব্যাঙ্ক অফিস, ভিতরে চোখ গেল রানার -ভল্টের দরজা হাঁ হয়ে আছে। আন্দাজ করল, ‘জাহাজ থেকে বোটে ওঠার আগেই জুয়েলাররা তাদের হীরাগুলো নিয়ে গেছে। নিয়ে গেলেই ওর কী, আর না নিলেই কী -এখন ওর দায়িত্ব এই মানুষগুলোকে সরিয়ে দেয়া। তারপর অন্য কাজ আছে।

ব্যাঙ্ক অফিস পেরিয়ে গেল রানা, পরের বাঁক পেরিয়ে থমকে দাড়াল। ব্যাঙ্ক ভল্টের দরজায় লাল বাতি দেখেছে ও, সেইসঙ্গে বেজে চলেছে অ্যালার্ম! এ ধরনের ভল্ট সম্বন্ধে জানা আছে ওর। বাতি ও অ্যালার্ম বলছে, ভল্টের ভিতরে এখনও কেউ আছে!

রানা আন্দাজ করতে পারছে ওখানে কে থাকবে। ‘হ্যালেক ভল্টের ভিতরে,’ সোহানাকে বলল, ‘সবাইকে টপ-ডেকে নিয়ে যাও। আমি এক্ষুনি আসছি।’

‘না-ই বা গেলে,’ রানার বাহুতে হাত রাখল সোহানা।

যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাহসী যুবক-যুবতী কী যেন বলছে, কিন্তু মিষ্টি এই ভাষা তারা চেনে না।

‘আমি শুধু যাব আর আসব।’ সোহানার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। ‘তোমরা এগোও।’ কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে নিল।

একবার বন্দুক দেখল সোহানা, দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল মুখ। আস্তে করে মাথা দোলাল। হাঁটতে শুরু করবার আগে যাত্রীদের বলল, ‘আপনারা পা চালান! আমরা উপরের ডেকে চলেছি!’

একমুহূর্ত ওদের দিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর ফিরতি পথ ধরল - দ্রুত পায়ে ব্যাঙ্কের দিকে চলেছে। বন্দুকের চেম্বারে কার্তুজ ভরে প্যাসেজের বাঁক নিল, সামনে ফাঁকা করিডোর। খানিকটা দূরে একটা স্টেয়ারওয়েলের দরজা বন্ধ হলো! দৌড়ে ব্যাঙ্ক পেরিয়ে গেল রানা, একেকবারে সিঁড়ির চার ধাপ টপকে উঠে এল। উপর তলায় পাশাপাশি দুটো করিডোর। দুটোই খালি। ধোঁয়া ভরা। একটু থামল রানা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে বামে যাও। তাই করল ও, বামদিকের করিডোর ধরে দৌড়াতে শুরু করল।

করিডোর শেষ হলো একটা গেম রুমে। দরজা খোলা। করিডোরের দেয়াল ঘেঁষে ঘরের ভিতর দেখল, মনে হলো না ওখানে কেউ আছে। দৌড়ের বেগে ঢুকল রানা, চারপাশ দেখা হয়ে গেল -ওপাশে একটা দরজা! ধীরে বন্ধ হচ্ছে! না থেমে বাঁক নিল রানা, ছুটল। কয়েক ফুট যেতে না যেতেই পা

পিছলে গেল, কোমর লাগল একটা পিনবল মেশিনের সঙ্গে। মেঝেতে দড়াম করে পড়ল মেশিন। ওটার ইলেকট্রনিক বেলগুলো বেজে উঠল, সঙ্গে জোর শিসের আওয়াজ -লাল বাতিগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল। পিনবলের স্পিনিং কাউন্টার বলছে, রানা প্রচুর স্কোর করেছে!

ফেলে আসা ওই ঘরে পিনবল মেশিন আছড়ে পড়েছে, কান পেতে শুনল হ্যালেক। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল -করিডোরের ওদিক ধোঁয়ায় ভরা! কিন্তু মাসুদ রানা আসছে! কাছে চলে এসেছে লোকটা! কিন্তু ও যদি লোকটাকে না দেখে, ওই শালাও তো ওকে দেখবে না! এখন জরুরি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। রানা শালা কোনও না কোনও করিডোরে ভুল পথ নেবে। এই বিশাল জাহাজে ওর নিজের জন্য লুকানোর জায়গার অভাব নেই।

দৌড়াতে শুরু করল হ্যালেক, করিডোরের শেষে প্রকাণ্ড একটা জায়গা। ভিতরে ঢুকে পড়ল। থমকে গিয়ে বুঝতে পারল না কোথায় আছে -চারপাশ ভরে আছে ধোঁয়ায়। আগে এখানে যাত্রীদের যত্রতত্র হাঁটতে দেখেছে। এখন অন্যরকম। চারদিক ধোঁয়া ভরা, ঘোলাটে এই স্তরগুলো কার্পেট থেকে শুরু হয়েছে । চোখ বেশি দূরে যায় না। সে-কারণেই সে গ্লাস টপড় কফি টেবিলে হোঁচট খেল, ব্যথায় কাতরে উঠল। মুহূর্তে রেগে টং হয়ে গেল, টেবিলের কাঁচের উপর জোরে পা নামিয়ে আনল। ঝনঝন করে ভাঙল পুরু কাঁচ!

হ্যালেকের জানা নেই যখন কুয়াশা পড়ে নাবিকরা একে অন্যকে এড়াতে চেঁচায়।

করিডোরের ধোঁয়া পেরিয়ে লাউঞ্জে এসে থমকে দাড়িয়েছে রানা, কাঁধে বন্দুক তুলল। দূরে হ্যালেককে দেখে ধমকে উঠল, 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, হ্যালেক!'।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল হ্যালেক, চোখ দুটো আর সরল না নলের উপর থেকে।

রানার মনে হলো লোকটা বন্দুক দেখেই মুগ্ধ হয়েছে। দু'জনের দূরত্ব চল্লিশ ফুট। ধোঁয়ার কারণে হ্যালেককে আবছা দেখল। 'দুই হাত মাথার উপরে তোলো!' আদেশ দিল, 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

খোলা একটা ফায়ার ডোরের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে হ্যালেক, করিডোরে ঢুকে পড়ল। কুঁজো হয়ে দ্রুত সামনে বাড়ল রানা, চেয়ার বা ইজি-চেয়ারের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আবারও শিকারের উপর বন্দুক তাক করল।

জমে গেল হ্যালেক। 'গুলি করবেন না! কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। দু'হাতে কম্পিউটার মাথার উপর তুলল। 'এটা একটা কম্পিউটার, অস্ত্র না!'

দীর্ঘ পায়ে এগিয়ে চলল রানা, ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দেখছে। ও জানে না, এখনও কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙুল নড়ছে হ্যালেকের।

'ওটা ফেলে দাও!' ধমক দিল রানা।

'তোমার বান্ধবী এখন কোথায়? সোহানা?' রানাকে দেরি করিয়ে দিতে চাইল হ্যালেক, 'আশা করি জাহাজ থেকে নেমে গেছে?'

রাগ চেপে রাখল রানা, ট্রিগার টিপে দিল। নল থেকে আগুন ছিটকে বেরল। ছররাগুলো হ্যালেকের মাথার উপরের সিলিঙে গিয়ে লাগল। বদ্ধ জায়গায় গুলির আওয়াজ দুজনের কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিল। গুঁড়ো হয়ে

যাওয়া প্লাস্টার ও রং হ্যালেকের উপর ঝুরঝুর করে পড়ল। লোকটার ভীত চেহারা দেখল রানা, আশা করল দু'একটা ছররা ব্যাটার গায়ে গেঁথেছে।

আরও দ্রুত সামনে বাড়ল রানা।

ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কর্কশ শব্দ শুনল হ্যালেক, মাসুদ রানা। বন্দুকের চেম্বারে আরেকটা কার্তুজ ঢুকিয়েছে!

নল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, বন্দুক হ্যালেকের বুকে তাক করল রানা, দশ ফুট দূর থেকে শান্ত স্বরে বলল, 'ওটা ফেলবে, না...'

'আমি শুধু সোহানার কথা জানতে চেয়েছিলাম,' দু'হাতে কম্পিউটার বাড়িয়ে দিল হ্যালেক। কুঁজো হয়ে মেঝেতে নামিয়ে দেবে। নরম স্বরে বলল, 'আমি এটা নামিয়ে রাখছি...'

কার্পেটে কম্পিউটার নামিয়ে রাখল সে, ডানহাতের তর্জনী মুহূর্তে এণ্টার টিপল -রানা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ দু'জনের মাঝখানের ফায়ার ডোর চারভাগের তিনভাগ বন্ধ হয়ে গেল! একে অপরকে আর দেখতে পেল না। দরজার শেষ চার ইঞ্চি ধীরে বন্ধ হয়। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা, কাঁধ ভরে দিল ফাঁকে -দু'হাতে দরজা ফ্রেম থেকে সরাতে চাইল। যান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে শুরু হলো মানুষের শক্তির লড়াই।

পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পর দরজা অর্ধেক খোলা অবস্থাতে নিয়ে এল রানা। বিকল দরজার এপাশে এসে দেখল, যা ভেবেছিল তাই হয়েছে, হ্যালেক স্ট্র্যাথার পালিয়েছে!

সাক্ষাৎ শয়তানকে ধরতে হবে! লম্বা করিডোর ধরে ছুটল রানা, সামনে ধোঁয়া ক্রমেই ঘন হলো। উন্মাদটা পুরো জাহাজে টাইম-রিলিজ স্মোক বোমা

বসিয়ে রেখেছে! যেখানে রাখেনি ধোঁয়া সেখানেও পৌঁছে গেছে এয়ার-সারকুলেশন সিস্টেমের কারণে! লোকটা জানে কী করতে হবে! রানার অভিজ্ঞতা বলে, চালাক লোক ভয়ঙ্কর অপরাধ করে, বোকা লোক অন্যায় করতে গিয়ে পদে পদে ভুল করে।

করিডোর রানাকে নিয়ে এল বলরুমের সামনে। বলরুমের দরজার সামনে থামল ও, ভিতরে উঁকি দিল। আশপাশে কেউ নেই। চারপাশ আরেকবার দেখে ঘরে ঢুকল। এখান থেকেই শুরু হয় ওদের সমস্যা। সোহানা আজই পাশে বসে বলেছিল, ওদের কোনও ছুটি আনন্দে কাটেনি। এবারও তা-ই হলো, ওরা জড়িয়ে গেল ঝামেলায়!

বন্দুক তৈরি রেখে সারি সারি টেবিলের পাশ দিয়ে এগোল রানা, ঘন সাদা ধোঁয়ার মধ্যে কোনও নড়াচড়া খুঁজছে চোখ। দূরে কী যেন আবছা মত দেখল -মনে হলো ওটা হ্যালেকের ফরসা মুখ! সময় নষ্ট করল না রানা, মুখ লক্ষ্য করে গুলি করল। জিনিসটা মুহূর্তে হাজারচির হলো! ডান্স ফ্লোরের অনেকটা উপরে। একটা ভিডিও স্ক্রিন ছিল, ওটাতে গুলি লেগেছে। পাম্প-গানের চেম্বারে আরেকটা কার্ট্রিজ ভরল রানা, চারপাশ দেখল। ধোঁয়ার মাঝে অনেকগুলো হ্যালেকের মুখ, লোকটা যেন ঠিক কোনও দুঃস্বপ্নের খল-নায়ক!

সিলিঙের চারদিকের অসংখ্য ভিডিও স্ক্রিনে হ্যালেক, কর্কশ স্বরে বলতে শুরু করল, ‘কম্পিউটারই আমাকে এমন শক্তিশালী করেছে, রানা! রাত-দিন কাজ করেছি আমি! এমনই পাগল ছিলাম! জানতাম না, এই কম্পিউটারই কতটা ক্ষতি করবে!’

রানা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো এক চক্কর ঘুরল, সত্যিকারের হ্যালেককে খুঁজল। নিজে লোকটা নেই, আছে শুধু তার ছায়াছবি। ধোঁয়ার ভিতর থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে। আর আছে তার কণ্ঠস্বর।

'সমস্ত ইলেকট্রনিক্স খুদে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে,' শান্ত স্বরে বলে চলেছে স্ট্রাথার হ্যালেক। 'একসময় দুনিয়ার সেরা ডাক্তাররা বলে দিল, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিলে তারা আমাকে শেষ একটা চিকিৎসা দিয়ে দেখতে পারে। অথচ...'

যাত্রীদের সবচেয়ে উঁচু ডেকে পৌঁছে দিয়েছে সোহানা, ফিরতি পথ ধরেছে, সোজা ছুটে এসেছে ব্রিজে। দরজা পেরিয়ে দেখল, থমথমে চেহারা নিয়ে বসে আছে ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি। কোনও ভূমিকা না করে বলল সোহানা, 'হ্যালেক আপনাদের ভল্ট ডাকাতি করেছে, ওর পিছনে গেছে রানা।'

চট্ করে ঠোঁটে তর্জনী তুলল ব্র্যাডলি, হাতের ইশারায় ব্রিজের অ্যাড্রেস সিস্টেম স্পিকার দেখাল।

'আমার অবস্থা চিন্তা করো, রানা,' স্পিকারের মাধ্যমে হ্যালেকের কণ্ঠ ভেসে এল। আমার সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি ব্যয় করেছি। আমি সেভেন সি কোম্পানির জন্য... জীবনটাও। কিন্তু ওরা যখন জানল আমি গুরুতর অসুস্থ, আমাকে সামান্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিল। আমি জানতাম না কম্পিউটার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে, ওটার কারণে দেহে ভয়ঙ্কর বিষক্রিয়া হয়। আমি নিজেকে চালাক মানুষ ভাবতাম, কিন্তু সেই আমিই জানতাম না ওই রেডিয়েশনের ফলে কী হয়!' বলে চলেছে হ্যালেক, 'আমি আশা করেছিলাম জাহাজ কোম্পানির উচু স্তরের ব্যবস্থাপকরা বুঝবে,

একটা মানুষ শেষ হয়ে গেছে; মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিলেই লোকটা বাঁচতে পারে। কিন্তু দিল না... ভাগিয়ে দিল। আশা করেছিলাম তারা আমার কাছে মাফ চাইবে । কিন্তু মাফও ওরা চাইল না। কাজেই ঠিক করলাম, মরার আগে প্রতিশোধ নেব। ঠিক তা-ই করছি আমি এখন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে নওন হয়ে গেল সোহানা। হ্যালেক যেভাবে বলে চলেছে, ওর মন বলছে ভয়ঙ্কর কিছু করবে সে । মন এ-ও বলল, রানা বিরাট কোনও বিপদে পড়তে চলেছে।

রানা এখন কোথায়, জানে না সোহানা, কিন্তু এটুকু জানে, ও ব্রিজে নেই। খারাপ কিছু হওয়ার আগেই রানাকে খুঁজে বের করতে হবে!

'একসেকেণ্ড, ম্যাম,' পিছন থেকে বলল ব্র্যাডলি। দৌড়ে ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে সোহানার পিছু নিল।

বলরুমে ধোঁয়া এত ঘন যে শ্বাস নিতে কষ্ট হলো রানার। মেঝে থেকে ছোট একটা টেবিলক্লথ তুলে নিল, একটা জগ থেকে পানি ঢালল ওটার উপর। কাপড়টা পেঁচিয়ে নিল নাক ও মুখের উপর। খানিকটা হলেও ধোঁয়া ফিল্টার হচ্ছে, গলার ভিতরটা কম জ্বলছে। ও বুঝে গেছে, এখানে অপেক্ষা করে কোনও লাভ হবে না। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের পাশে একটা এক্সিট সাইন দেখল। ওখানে দরজা আছে। পৌঁছে গেল ওটার কাছে, কিন্তু দরজাটা হঠাৎ বন্ধ হতে লাগল। এবার দেরি হয়ে গেছে হ্যালেকের, এক লাফে দরজা পেরিয়ে গেল রানা। কবাট ওর পিছনে বন্ধ হলো। অর্থ পরিষ্কার। রানা জানে, হ্যালেক চায়নি ও এ-পথে আসুক।

সামনের ছোট্ট করিডোর পেরিয়ে একটা শপিং আর্কেডে ঢুকল ও। দোকানিরা জাহাজ ত্যাগ করবার আগে দোকান বন্ধ করে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে সব। ধোঁয়া এদিকে নেই বললেই চলে। মুখ থেকে চাদর সরাল রানা, বড় করে শ্বাস নিল। তখনই একদিকে কীসের যেন সামান্য আওয়াজ পেল। পাশ ফিরে চমকে গেল, একটা ফায়ার ডোর খুলে যাচ্ছে। কিন্তু ওই দরজা দিয়ে এল না কেউ। হ্যালেক কি ওকে আমন্ত্রণ জানাল?

হাতের বন্দুক তৈরি রেখে দরজা পার হলো রানা। মাঝারি একটা কামরা, ব্যবহার করা হয় স্টোররুম হিসাবে। দেয়ালে একের পর এক তাক, ওগুলোতে নানা রকম মদের বোতল রাখা। এই দরজার উল্টো দিকে একটা সিকিউরিটি দরজা আছে, ওটার গলা সমান জায়গায় গোল একটা গ্লাস পোর্টহোল। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা, ওটার দিকে পা বাড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের ফায়ার ডোর বন্ধ হলো! সামনের সিকিউরিটি ডোরের পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল ও, কিন্তু চোখের সামনে দড়াম করে আটকে গেল ওটাও! ফাঁদে পড়ে চারপাশ দেখল রানা। চোখ ফিরে এল পোর্টহোলের উপর। কাঁচের ওপাশে কী যেন দেখা গেল। ওটা যেন অন্য দুনিয়ার কোনও জীব! নাক-মুখে গ্যাস মাস্ক লাগানো!

স্ট্রাথার হ্যালেক!

‘এবার কী করে আমাকে ঠেকাবে, দোস্তো?’ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল কর্কশ স্বর।

সবচেয়ে সোজা পথে জবাব দিল রানা, বন্দুকটা কাঁধে তুলেই গুলি করল। ভেবেছিল গ্লাসের পোর্টহোল চুরমার হবে, কিন্তু ওটা অনেক পুরু - বন্দুকের হালকা ছররা কাঁচ ফাটাতে পারেনি, আঁচড়ও কাটেনি। আরেকবার

গুলি করতে চাইল রানা, কিন্তু পাম্প করতে গিয়ে বুঝল, বন্দুকে গুলি নেই। এবার ওটার কুঁদো দিয়ে বার দুই ঘা দিল কাঁচে। কিন্তু এক ইঞ্চি পুরু কাঁচের কিছুই হলো না। বিরক্ত হয়ে অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলল।

কিন্তু গুলির আওয়াজে, সেই সঙ্গে কাঁচে ছররা লাগার শব্দে ভীষণ ভয় পেয়েছিল হ্যালেক, ঝট করে সরে গিয়েছিল, আধ মিনিট পর আবারও পোর্টহোলে ফিরে এল মুখটা।

ওর প্রাণের ভয় দেখে হেসে ফেলল রানা।

রাগে-ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে উঠল হ্যালেক, পরিষ্কার বুঝেছে ওকে টিটকারি দেয়া হচ্ছে। দু'হাতে পিস্তল যেভাবে ধরে, সেভাবে কম্পিউটার তাক করল রানার দিকে -একটা কী টিপল।

রানার পিছনের একটা তাকে জিনিসটা রেখেছে সে, বিকট আওয়াজে ফাটল স্টান গ্রেনেড়! প্রায় একইসঙ্গে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, দু'সেকেণ্ড পর বুঝল আহত হয়নি।

গ্রেনেড শেলফের অনেকগুলো বোতল চুরমার করেছে, সেই সঙ্গে ছড়িয়েছে আগুনের ফুলকি -ভাঙা বোতলের অ্যালকোহল জ্বলে উঠল মুহূর্তে। তাক থেকে মেঝেতে নেমে এল জ্বলন্ত মদ। একবার ওদিকে চেয়ে বুঝে গেল রানা, ওই লেলিহান আগুন নেভাতে পারবে না। চারপাশ দেখল, এখন এমন কিছু দরকার, যেটা দিয়ে সিকিউরিটি দরজার কাঁচ ভাঙা যায়।

একবার দরজার দিকে তাকাল রানা। হ্যালেক ওখানে বড়বড় দাঁত বের করে হাসছে। হাত উঁচু করে একটা গ্রেনেড দেখাল, তারপর উবু হয়ে দরজার নীচে কোথাও রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দরজা খুললেই ফাটবে এটা।'

পিছনের ফায়ার ডোর বন্ধ । মদের আগুন দ্রুত উপরে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

কাঁচের ওপাশ থেকে হাত নাড়ল হ্যালেক, যেন চিরবিদায় জানাচ্ছে। কষ্টের ভঙ্গিতে মুখ বিকৃত করল, যেন রানার কষ্টে সেও মর্মাহত। কাঁচের সামনে কয়েক সেকেণ্ড দাড়াল, তারপর ঘুরে চলে গেল।

আগুনের শিখা থেকে সরে এল রানা। খুঁজছে। স্টোররুমে কাঁচ ভাঙার মত কিছুই নেই। মদ পুড়িয়ে শিখাগুলো বাড়ছে, এখুনি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে অ্যালকোহলের ফিউম। একটু পর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। একটা দরজা অন্তত খুলতে হবে। একদিকের দেয়ালে অনেকগুলো সুইচ, একে একে টিপল। লাভের বদলে লোকসান হলো, জাহাজের মল মিউজিক বেজে উঠল উঁচু গ্রামে। লিলি ল্যাংট্রির কথা মনে পড়ল। কোন সুইচ টিপলে ওটা থামানো যাবে কে জানে, বন্ধ করবার সময়ই বা কই! শিখাগুলো লেলিহান হয়ে উঠেছে, যে-কোনও সময় ঘরটা দু'ভাগ করে দেবে।

ঝুঁকি নিল না রানা, আগুন টপকে সিকিউরিটি ডোরের সামনে থামল। ঠিক তখনই মাথা ঘুরে উঠল, মনে হলো শরীর খুব ক্লান্ত। দরজায় হেলান দিতে চাইল, পারল না -বসে পড়ল, পরমুহূর্তে মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল।

খানিকটা দূরে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এরপর আর কোনও আওয়াজ নেই। সামনে কী হয়েছে জানে না সোহানা, ব্র্যাডলিকে বলল, 'আওয়াজটা শুনেছেন? রানা ওদিকে!'

'এদিকে চলুন,' বলল ব্র্যাডলি।

এগিয়ে চলল দু'জন। আড়াই মিনিট পর এইট্রিয়ামে ঢুকল। ঘন ধোঁয়ায় চারপাশ ভরে আছে। তার মাঝে বেজে চলেছে দোকানিদের বাজনা। শব্দগুলো ভুতুড়ে লাগল সোহানার। থমকে দাঁড়াল, 'এক মিনিট, মিস্টার ব্র্যাডলি। আগেও এ বাজনা শুনেছি।'

শ্রাগ করল ব্র্যাডলি। এসব ক্যালিপসো মিউজিক, প্রতিদিন শোনে। এই বাজনা জাহাজের সবাইকে শোনানো হয়,' বলল। 'যে-কোনও জায়গায় পাবেন।'

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল সোহানা, 'এই বাজনা আমি চিনি।' আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে শুনল, তারপর মনে পড়ল। বলল, 'এটা শপিং মিউজিক। রানা মল-এ আছে!'

মল এরিয়ার দিকে ছুটল দু'জন।

পায়ের শব্দ শুনল হ্যালেক, এরপর দু'জনের কথাবার্তাও। একটা কণ্ঠ তার মনে আছে, ওই মিষ্টি স্বর সোহানার। সময় নষ্ট না করে একটা কেবিনে ঢুকল সে। দু'জন পেরিয়ে যাক ওকে, তারপর...

কম্পিউটার উঁচু করে ধরল হ্যালেক, স্ক্রিন দেখল। একটা গ্রাফিক বলছে জাহাজের কার্গো হোল্ডে বন্যা হয়েছে। স্ক্রিনে একটা মেসেজ উঠল: বন্যা আপনার প্রোগ্রাম বদলে দেবে, ক্যাপ্টেন। আপনি কি রিপ্রোগ্রাম করবেন, না ক্যানসেল করবেন?

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল হ্যালেক, তারপর কী-বোর্ড টিপতে শুরু করল। স্ক্রিনে উঠল, ওজন ও ব্যালাস্টের জন্য রিপ্রোগ্রাম করো।

লেখা শেষে এন্টার টিপল।

স্ক্রিনে একটা ডিজিটাল ঘড়ি ভেসে উঠল, কাউন্টডাউন শুরু হলো - ৪০:১২... ৪০:১১...

সোহানা ও ব্র্যাডলি মল -এর চারপাশ ঘুরে দেখছে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, রানার দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে উঠছে ব্র্যাডলি, ভদ্রতার খাতিরে মেয়েটিকে বলছে না তার অন্য কাজ আছে। এরই মধ্যে প্রায় এক চক্কর কেটেছে ওরা। পাশ থেকে সোহানাকে দেখল, সময় হয়েছে মেয়েটাকে বলা যে, মিস্টার রানা এখানে নেই। কিন্তু মিস সোহানা একটা দরজার দিকে চেয়ে আছে। চোখ অনুসরণ করল ব্র্যাডলি, এবার দেখল দরজার পোর্টহোলে আগুনের শিখা!

দৌড়ে গিয়ে ওটার সামনে থামল সোহানা, উঁকি দিল ভিতরে। পরমুহূর্তে তাৎকে উঠল। একটু দূরে পড়ে আছে রানা!

সোহানার পাশে থেমেছে ব্রাডলি। ‘কী হয়েছে?’

‘রানা!’ সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকল সোহানা। কাঁচে জোরে জোরে টোকা দিল। ‘ওঠো! রানা!’

কণ্ঠস্বর শুনেছে রানা, মাথা তুলে চাইল-সোহানাকে দেখতে পেল না। শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই । মাথা আস্তে করে মেঝেতে পড়ল।

‘একটা ইলেকট্রিক স’ দরকার,’ বলল সোহানা, রওনা হয়ে গেল ফিরতি পথে। আপনি থাকুন, আমি...’

‘দরকার নেই,’ বলল ব্র্যাডলি, ‘আমার কাছে চাবি আছে।’ পকেট থেকে চাবি বের করল সে, কিন্তু পোর্টহোলে চোখ পড়তেই থমকে গেল।

উঠে বসেছে রানা, টলমল করছে। বারবার দু’হাত নাড়ল। ‘দরজা খুলবেন না!’ দুর্বল স্বরে বলল। আঙুল দিয়ে দরজার নীচের দিক দেখাল।

সোহানা-ব্র্যাডলি প্রথমে ভাবল, রানার দিকের দরজায় কিছু আছে।

ওখানে কী থাকতে পারে?

নিজের পা'র দিকে চাইল সোহানা, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল!

একটা গ্রেনেড দরজার কোনায় ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। দরজা খুললেই....

আরেকবার গ্রেনেডটা দেখল সোহানা। নতুন জিনিস, আগে দেখেনি। উঠে দাঁড়িয়ে পোর্টহোলে চাইল, রানা মেঝেতে শুয়ে পড়েছে, চোখ দুটো বন্ধ। শেলফগুলো দেখল সোহানা, আগুনের শিখা বোতলগুলো ছাড়িয়ে উঠছে। যে-কোনও সময়ে বোতলগুলো ফাটবে। জোরে জোরে কাঁচে টোকা দিল, জোরে জোরে ডাকল, 'রানা! ঘুমিয়ে পড়ো না! তোমাকে বলতে হবে ওটা কী ধরনের গ্রেনেড়!'

চোখ খুলল রানা, দৃষ্টি পড়ল মিষ্টি একটা মুখের উপর। মন চাইল পুরোপুরি জেগে উঠতে। কিন্তু ভীষণ ঘুম আসছে যে! কাঁচে কান পেতে আছে সোহানা। ও কী চায়? এবার মনে পড়ল, দুর্বল স্বরে বলল রানা, 'গ্রেনেডের সামনে কী লেখা, সেটা দেখো।'

'এন-এম-৪৯৬০,' বলল সোহানা। 'আগে দেখিনি।'

'পিন কি খুলে নেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাঁ করে দুজনের কথা শুনছে ব্র্যাডলি ।

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা।

'ওটার স্পুন বাঁধতে হবে, গ্রেনেডের সঙ্গে।

স্পুন বাঁধতে হবে? এখন একটা ফিতা দরকার। নিজের পা দেখল সোহানা, ওর শু-তে ফিতে নেই। ব্র্যাডলির জুতোর দিকে আঙুল তুলল, প্রায় দাবীর স্বরে বলল, 'আপনার জুতো খুলে ফিতেটা দিন!'

পোর্টহোলের দিকে একবার চেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্র্যাডলি, এক পায়ের জুতো খুলে নিল। এক টানে ফিতে খুলে ফেলল।

ওটা প্রায় কেড়ে নিল সোহানা, পোর্টহোলের সামনে বসল, উঁচু স্বরে বলল, 'ফিতে পাওয়া গেছে, রানা!'

'গ্রেনেডের স্পুন বাঁধলেই হবে তো?' জানতে চাইল ব্র্যাডলি। বারবার ঢোক গিলতে শুরু করেছে।

দরজার কাছে বসেছে সোহানা। কাজের ফাঁকে বলল, 'গ্রেনেডের নীচ থেকে শুরু করে উপর পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে হবে।'

শক্ত করে গিট দেয়া শেষে দরজার কোনা থেকে গ্রেনেড আস্তে করে খুলে নিল সোহানা। উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল!

তবে সেটা গ্রেনেডের নয়, ভিতরের বোতলগুলোর বিস্ফোরণ! শকওয়েভ রানাকে নিয়ে দরজার উপর ফেলল! ধাক্কা খেয়ে হিঞ্জ খুলে গেল, পাল্লাটা বাইরের দিকে পড়ল! সোহানা ও ব্র্যাডলি আকাশে উড়াল দিল, পাঁচ ফুট দূরে গিয়ে নামল!

চিৎ হয়ে পড়েছে সোহানা, তবে জীবিত আছে। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'গ্রেনেড কোথায়?'

'আপনার হাতে,' কাঁপা স্বরে বলল ব্র্যাডলি। ওটা নামিয়ে রাখুন, প্লিজ!'

গ্রেনেড পাশে রাখল সোহানা, ধীরে ধীরে উঠে বসল।

‘আপনারা কি আর্মিতে ছিলেন নাকি?’ বলল ব্র্যাডলি। ওটা তার কোনও প্রশ্ন নয়, বিরাট একটা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

এগারো

রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সোহানা ও ব্র্যাডলি, জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। দম আটকে গেছে রানার, বেদম কাশছে। কিছুক্ষণ পর শ্বাস নিতে পারল। রক্তে নতুন করে অক্সিজেন মিশল। এইট্রিয়াম থেকে বেরিয়ে ডেকে এল ওরা। মাথার পিছনে জ্বলছে রানার, রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বোলাল -তিন ভাগের এক ভাগ চুল উধাও!

কাঠের পিঠ-সোজা একটা চেয়ার পেয়েছে সোহানা, নিয়ে এসে বলল, ‘এখানে চুপ করে বোসো তো। আমি দেখছি কী হয়েছে।’

‘আমি ঠিক আছি,’ বলল রানা।

‘আচ্ছা, বাবা, তুমি খুব আনন্দে আছ,’ বলল সোহানা। ‘একটু বসবে?’

তিতকুটে চেহারা করে বসল রানা।

কোথায় যেন চলে গেল সোহানা।

রাতের আঁধার কাটছে, সাগরের উপর ধূসর আলো। দিগন্তে চাইল না, যতদূর দেখা যায় কোনও জমি নেই। কিছুক্ষণ পর সূর্যের হাসিমুখ সাগরের বুকে লাফ দিয়ে উঠল। প্রথম সোনালী আলো সাদা জাহাজ ঝিকমিকিয়ে দিল। ক্যারিবিয়ান সাগর এখন খুব শান্ত। ওটার দিকে চাইলে মনে হয়, কক্ষনো কোনও বিপদ হতে পারে না। খেয়াল করলে টের পাওয়া যায়, জাহাজ ফুল-

স্পিডে ছুটছে। কিন্তু কে বলবে, এক বদ্ধ উন্মাদ ওটা নিয়ে চলেছে -কোথায়, কে জানে!

সুপারস্ট্রাকচার থেকে ফিরল সোহানা, রানার মাথা নিয়ে পড়ল। কাঁচির কুচকুচ আওয়াজ পেল রানা, পোড়-কোকড়ানো চুল কাটছে সোহানা। একটু পর ন্যাড়া অংশে মলমের মোলায়েম স্পর্শ পেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলুনি কমে গেল।

'আপাতত এ-ই,' বলল সোহানা। 'ভাবছ বাঁচা গেল, কিন্তু ভাল কোনও ফার্স্ট এইড-এর বাক্স পেয়ে নিই, তখন তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

উঠে গিয়ে রেলিঙের সামনে দাঁড়াল রানা, চোখ কুঁচকে গেল। সূর্যের আলো দ্রুত বাড়ছে, সে আলোয় কী যেন দেখা যায়! কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল, তারপর নিশ্চিত হলো। সামনে জমিন আছে। কোনও দ্বীপ! ওটার দিকে আঙুল তাক করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে তাকাল সোহানা ও ব্র্যাডলি। দ্বীপই তো! ঠিক তখনই থরথর করে কেঁপে উঠল ওরা। জাহাজ হঠাৎ দিক পরিবর্তন করছে!

'টের পেলেন?' বলল ব্র্যাডলি। 'কোর্স পাল্টেছে!'

'দ্বীপ এড়াতে?' জানতে চাইল সোহানা, মুখ ফ্যাকাসে।

'না,' আস্তে করে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। 'এখন সরাসরি দ্বীপের দিকে নিয়ে চলেছে!'

রানার বাহুতে হাত রাখল সোহানা, হাত একটু কাঁপছে।

'জাহাজ থামাতে হবে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

অবজার্ভেশন ডেকের সেরা জায়গা বার, ওখানে আরামে বসেছে উইন্ট্রি ও সোফিয়া, ন্যান্সির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খুব ক্লান্ত ন্যান্সি, বাবা-মার পাশে শুয়ে পড়ল।

লিলি ল্যাংট্রি বিরাট অভজার্ভেশন উইণ্ডোর সামনে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ, জোরাল স্বরে বলল, 'আগে কখনও এত ভয় পাইনি। আমার মন বলছে অনেকের মৃত্যু হবে। কী বলছি বুঝতে পারছ, রিটা?'

'আমি তোমার কথা শুনতে চাই না,' এক কথায় জানিয়ে দিল রিটা ডেলটন।

'তুমি কোন টাইপের মেয়ে আমি বুঝতে পারি না,' বলল লিলি। 'তোমার ধারণা তুমি এন্টারটেইনমেন্ট বিজনেস বোঝে। তুমি ভাবো শো-বিজ বোঝো! কিন্তু আসলে সারাক্ষণ ভাবো তোমার এজেন্ট, আর বুকিং নিয়ে!'

'তোমার কোনও এজেন্ট থাকলে বুকিঙের ব্যাপারে চিন্তা করতে হতো,' তিক্ত স্বরে বলল রিটা। 'তুমি সেই কিণ্ডারগার্টেনের টিচারই রয়ে গেলে। তোমার আসলে এই লাইনে আসা উচিত হয়নি।'

'তোমার এত বড় সাহস হলো কী করে এ কথা বলার?'

'সোজাসাপ্টা বললাম,' বলল রিটা।

'তুমি যোগ্য মিউজিশিয়ান হলে লাসভেগাস বা নিউ ইয়র্কে থাকতে, এই জাহাজে না,' ধমকের সুরে বলল লিলি।

'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ,' ক্লান্ত স্বরে বলল রিটা।

মেয়েটা এভাবে হার মানবে, তা ভাবেনি লিলি ল্যাংট্রি। মন ছোট হয়ে গেল তার, সহযোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে লজ্জিত বোধ করছে। 'আমি

দুঃখিত,’ বলল। ‘ফালতু কথা বলেছি, আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলেছি মনে কিছু নিয়ে না!’

‘লিলি, আমাকে একটু একা থাকতে দেবে?’

‘আমরা হয়তো মারাই পড়ব,’ কণ্ঠস্বর বদলে গেল লিলির। ‘খুব ভয় লাগছে আমার।’

রুবি বিরাট জানালায় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে, মানুষটাকে কত না কষ্ট দিয়েছি। একই কথা ভাবছে ভিক্টরও। স্ত্রীর হাত তুলে নিল হাতে।

জেসন পাশ থেকে চেয়ে আছে, সাগরের বুকে ডিমের কুসুম সূর্য উঠেছে।

‘ভিক্টর, দেখো, একটা দ্বীপ,’ হঠাৎ বলল রুবি। ‘আমরা বেঁচে গেলাম!’

নীল সাগরে চোখ ফেলল ভিক্টর, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘সোনা, তোমার চোখ তো ঈগলের মত! ওটা দ্বীপই! একটু পর পাম গাছ দেখব। সৈকতে নারকেল গাছ ও থাকবে। আমরা ওই দ্বীপে ঘর বেঁধে বহু বছর থাকব একসাথে।’

‘নিশ্চয়ই ওখানে কোনও ক্যাসিনো থাকবে,’ হাসল রুবি।

‘ওই দ্বীপে আমরা নিজেদের বাড়ি বানাব,’ বলে চলেছে ভিক্টর। ‘আমাদের মধ্যে একজনকে নেতা করব, বাদাম আর ফলমূল খেয়ে বাঁচব। আনন্দে...’

‘চুপ করো তো, ভিক্টর,’ ধমক দিল রুবি।

‘ওরকম হলে সবার জন্য তোমাকে পাম-পাতা দিয়ে বাড়ি বানিয়ে দিতে হবে, কুয়া খুঁড়তে হবে -তোমার পিঠের হাড় চুরচুর হয়ে যাবে!’

মাথা নাড়ল ভিক্টর, ‘আমি নতুন করে জীবন ফিরে পাব।’

‘ওসব চিন্তা বাদ দাও, আমি দ্বীপে বাড়ি দেখতে পেয়েছি,’ বলল রুবি। বড় করে শ্বাস ফেলল -বাঁচা গেছে, দ্বীপটা কোনও কোরাল এটোল বা মরুভূমি না!

তীক্ষ্ণ চোখে দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল ভিক্টর, কয়েক সেকেণ্ড পর জেসনকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওটা কি বন্দর?’

‘ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন,’ জোরে জোরে মাথা দোলাল জেসন। নীরবে প্রার্থনা করল। ঈশ্বর তার কথা শুনেছেন, তিনি দয়া করেছেন। ‘ঠিক আমরা একটা বন্দরের দিকে চলেছি,’ বলল জেসন। ‘আর ভয় নেই। একটু পর জাহাজ ছেড়ে নেমে যাব।’

ব্র্যাডলি ও অ্যাডামসের সঙ্গে ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা ও রানা। দুই অফিসার মেনে নিয়েছে, মিস্টার রানা তাদের সত্যিকারের সাহায্যকারী। ভদ্রলোক সঙ্গে আছেন বলে এখন খুশি তারা। ডোমিনিকা দ্বীপের উপর পড়েছে সূর্যের সোনালী রোদ। দ্বীপটা বিনকিউলার দিয়ে দেখছে সোহানা। মেইন কম্পিউটারের স্ক্রিনে চেয়ে আছে রানা ও ব্র্যাডলি। অ্যাডাম স্টিয়ারিং প্রোগ্রাম বদলাতে চেষ্টা করছে।

‘একটা ব্যাপার বুঝলাম না,’ বলল ব্র্যাডলি। ‘হ্যালেক যদি সরাসরি কোর্সই পাল্টাল, তো জাহাজের নীচে বন্যা বইয়ে কী লাভ!’

‘ওটা ওর কাজ নয়,’ বলল রানা।

ঘুরে তাকাল ব্র্যাডলি। ‘কী বললেন?’

ব্র্যাডলির কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাডামস। অন্য দিকে চেয়ে আছে। ব্র্যাডলি জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কার্গো ডোর খুলেছ, অ্যাডামস?’

বিরাট ঢোক গিলল অ্যাডামস। ‘স্যর, আসলে, সত্যি বলতে কী...’

‘তুমি সবাইকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছ?’ অবাক হয়ে জানতে চাইল ব্র্যাডলি।

‘কার্গো ডোরের কথা বাদ দিন,’ ওগুলো বন্ধ আছে,’ বলল রানা। ‘তার চেয়ে বলুন কতক্ষণ পর দ্বীপে গিয়ে ধাক্কা লাগবে।’

হিসাব কষতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্র্যাডলি-অ্যাডামস।

সোহানা বিনকিউলারে দ্বীপ দেখছে। হঠাৎ গ্লাসের এক কোণে বিশাল একটা কিছু দেখল। ওটার দিকে তাক করল বিনকিউলার, চমকে গেল! দ্বীপের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সুপার ট্যাঙ্কার। কয়েক সেকেণ্ড দেখল সোহানা, সরাসরি সুপার ট্যাঙ্কারের দিকে চলেছে লাভ অ্যাট সি!

‘আমরা দ্বীপে গিয়ে গুঁতো দেব না,’ শুকনো স্বরে বলল ও। ওর কণ্ঠে এমন কিছু আছে, যেটা অন্যদের ঘুরে তাকাতে বাধ্য করল।

রেইডার স্ক্রিন দেখল ব্র্যাডলি, তারপর কয়েক পা এগিয়ে সোহানার কাছ থেকে বিনকিউলার নিল। সামনের দৃশ্য দেখে থমকে গিয়ে বলল, ‘ওটা একটা বিশাল অয়েল ট্যাঙ্কার... হ্যালেক ওটার উপরে নিয়ে ফেলবে আমাদের! আগুন ধরে যাবে ট্যাঙ্কারে, জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাব আমরা। দুটো জাহাজই...’

‘ওটাই ওর প্ল্যান,’ বলল রানা। জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, ‘আরে! ওটা তো আমার ট্যাঙ্কার!’

ওর চেয়েও বেশি চমকাল ব্র্যাডলি ও অ্যাডামস। ‘আপনার ট্যাঙ্কার মানে?’ ব্র্যাডলির কণ্ঠে নিখাদ অবিশ্বাস।

'না, মানে...' চেপে যেতে চাইল রানা, কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল সোহানা।

'ওটা খুব সম্ভব সাউল শিপিঙের একটা অয়েল ট্যাঙ্কার।'

'আমিও চিনতে পারছি, বলল ব্র্যাডলি। কিন্তু উনি যে বললেন...' ঠোঁটে মুচকি হাসি টেনে থেমে গেল ফার্স্ট অফিসার।

'উনি ঠিকই বলেছেন,' ঘাড় বাঁকিয়ে ব্র্যাডলির দিকে তাকালো সোহানা। উনি ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান।'

'সত্যিই?' দুই জোড়া রসগোল্লা হয়ে গেল ব্র্যাডলি ও অ্যাডামসের চোখ। তারপর হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিল নিজেদের। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপারট্যাঙ্কারের বহর রয়েছে সাউল শিপিং করপোরেশনের, এ ছাড়াও রয়েছে কয়েক শ'... যাকগে, নাক টানল ব্র্যাডলি। একটা কথা বলে ফেলেছেন বলেই মানুষটাকে ব্রিতকর অবস্থায় ফেলা ঠিক না।

'সোহানা কী বলেছে ভুলে যান,' বলে উঠল রানা। 'এখন সামনের বিপদ থেকে কীভাবে রক্ষা পাবেন সেই চিন্তা করুন। আমার ধারণা, ওই ট্যাঙ্কারের অর্ধেকটাই ভরা আছে তেলে।'

মনে মনে হিসাব কষল ব্র্যাডলি। ওরা সুপারট্যাঙ্কারের বিশ মাইল দূরে! 'ওটার দৈর্ঘ্য হাজার ফুটের বেশি,' বলল, 'ওজন তিন লাখ টনেরও বেশি।' দ্রুত কম্পিউটার দেখল। 'তেলে ভর্তি ওটা!' চোখ তুলে দেখল মাথা নাড়ছে রানা। নিজের বর্ণনা চালিয়ে গেল সে, 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপও লম্বায় ওটার হাঁটুর সমান! ওটার নাম...'

'নোয়া'জ বোট!' ওর বক্তব্য শেষ করল রানা।

চট করে রানার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ফার্স্ট অফিসার ব্র্যাডলি। 'হ্যাঁ, নোয়া'জ বোট।'

'হ্যালেক ওটার দিকে নিয়ে চলেছে জাহাজটা,' কম্পাস দেখল অ্যাডামস। 'পোর্টসাইডে তিন ডিগ্রি সরে গেছি আমরা!'

'হ্যালেক আগেও দিক বদলেছে,' বিড়বিড় করল ব্র্যাডলি।

ব্যস্ত হয়ে উঠল দুই অফিসার, রেইডার ও ন্যাভিগেশন কম্পিউটারগুলো বারবার দেখছে।

'ওটা এখন উনিশ মাইল দূরে,' বলল অ্যাডামস। 'আমরা চব্বিশ নট গতিতে চলেছি।'

এরা কী বলছে, পুরোপুরি বুঝল না সোহানা। তবে তাদের কণ্ঠের আতঙ্ক টের পেল পরিষ্কার। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তো আমাদের দেখতে পাবে, তা-ই না? নিশ্চয়ই সরে যাবে?'

'জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে,' তিক্ত স্বরে বলল ব্র্যাডলি।

'ওরা ধরেই নেবে আমরা দিক বদল করব,' কিন্তু যখন বুঝবে আমরা গুঁতো দিতে চলেছি, ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে। ও জিনিস নড়াতে তিরিশ মিনিট লাগে।'

'আমরা জাহাজের বো থ্রাস্টার দিয়ে সরে যেতে পারি,' বলল রানা।

'সম্ভব না,' বলল ব্র্যাডলি। 'আপনারা ওই লেয়ার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন! সমস্ত প্যানেল ডুবে গেছে!'

কম্পাসের সামনে দাঁড়িয়ে হতাশ স্বরে বলল অ্যাডামস, 'লোকটা আরও সিকি ডিগ্রি সরিয়ে নিল আমাদের।'

'কোথায় নামবে সেটাই বোধহয় ঠিক করছে,' বলল রানা।

‘বন্যার ফলে ওর প্রথম প্রোগ্রাম পাল্টে গেছে,’ বলল অ্যাডামস। ব্র্যাডলির দিকে তাকাল। ‘মনে হয়, হ্যালেকের পছন্দ ডোমিনিকা।’

রানার দিকে চাইল সোহানা। ‘কিছু করা যায় না?’

‘যায়,’ ধীরে ধীরে বলল রানা। ‘আমরা প্রপেলারটা হয়তো আটকে দিতে পারি।’

‘প্রপেলার?’ মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। ‘ওটার ব্যাস দশ ফুট, চরকির মত ঘুরছে। থামাতে চেষ্টা করলে স্রেফ মারা পড়বেন।’

অ্যাডামস বলল, ‘স্যর, আমরা যদি ড্রাইভ শাফটে কিছু ঢুকিয়ে দিই?’ সিনিয়র অফিসারের চোখে রাগ দেখল সে। জাহাজের তেরোটা বাজবে তা হলে, সেটা কিছুতেই মানবে না ফার্স্ট অফিসার। আস্তে করে বলল অ্যাডামস, ‘আমি শুধু কথার কথা বললাম।’

‘দরকারে তা-ই করব আমরা,’ দৃঢ় স্বরে বলল রানা। ঘুরেই হাঁটতে শুরু করল। সোহানাও চলল ওর সঙ্গে।

একমুহূর্ত চুপ করে থাকল ব্র্যাডলি, তারপর অ্যাডামসকে বলল, ‘তুমি ব্রিজে থাকো।’

রানা ও সোহানার পিছু নিল সে। এই পাগলা লোকটা আবারও উল্টোপাল্টা কিছু করতে চাইলে ঠেকাতে হবে।

নোঙর ফেলা সুপার ট্যাঙ্কারের দুই অফিসার ব্রিজে তাস খেলছে, হাতে কোনও কাজ নেই। অর্ধেক তেল খালাস করে এসেছে কারাকাসে, আরও দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে ছুটবে নোয়া'জ বোট।

‘আমার হাতে সাত-আট-নয়, স্যর,’ বলল সেকেণ্ড অফিসার ফ্রেড, ‘রানিং ফ্ল্যাশ!’ হাসি চেপে রাখতে পারছে না।

ফার্স্ট অফিসার নাহিয়ান মাহমুদ সঙ্গীর তাসের দিকে দেখল না, রেইডার স্ক্রিনের দিকে এগোল। ওখানে কী যেন টিপটিপ করছে। স্ক্রিনে ছোট্ট একটা ডট। নড়ছে ওটা। ঠিক তাদেরই দিকে আসছে।

কালো ব্যাগ কোমরে আটকে নিয়ে জাহাজের পিছনের দিকে চলেছে হ্যালেক। মেরিনা ওখানে। কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকাল। ঘড়ি বলছে ২৪:০৪।

ভাল, ভাল!

এদিকে স্কাই ডেকে যাত্রীরা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। দূরের সুপার ট্যাঙ্কার দেখছে। ফটোগ্রাফার ব্রায়েস তার ক্যামেরায় টেলিস্কোপ-লেন্স লাগিয়ে ছবি তুলছে।

‘তোমার কি মনে হয়, ভিক্টর,’ বলল রুবি। ‘ওই জাহাজ আমাদের উদ্ধার করবে?’

‘তা ছাড়া আর কী?’ জবাব দিল ভিক্টর। মোটা শরীরটা নিয়ে এক চক্কর নেচে নিল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ষাঁড়ের আওয়াজ, বাঁ-বাঁ-বাঁ-বাঁ, টারাম টা টারাম!’

ওদিকে ব্রিজে অ্যাডামস রেডিওর মাধ্যমে এসওএস পাঠিয়ে চলেছে, ‘মে-ডে! মে-ডে! লাভ অ্যাট সি বলছি! আমরা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বে আসছি, আপনাদের দিকে! ইঞ্জিন কন্ট্রোল নষ্ট! আবারও বলছি, আমাদের ইঞ্জিন কন্ট্রোল নষ্ট!’

বারবার একই মেসেজ পাঠিয়ে চলেছে অ্যাডামস, ঠিক তখনই ব্রিজে এল স্টুয়ার্ড জেসন। বক্তব্য শুনে প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর যখন দেখল ন্যাভিগেটর হতাশ হয়ে ট্রান্সমিটার নামিয়ে রাখল -ভয়ঙ্কর ভয় পেল। মুহূর্তে বুঝল, জাহাজের রেডিও পর্যন্ত নষ্ট!

'আমরা কোথায় চলেছি, স্যর?' জানতে চাইল জেসন।

কষ্ট করে জবাব দিল না অ্যাডামস, জানালা দিয়ে সুপার ট্যাঙ্কারের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে পড়ল। 'জবাব দিন, নোয়া'জ বোট, আমরা লাভ অ্যাট সি। জবাব দিন, নোয়া'জ বোট! ডোমিনিকা, রোজো পোর্ট! শুনুন! রোজো পোর্ট, মে-ডে! মে-ডে!'

জানালা দিয়ে তাকাল জেসন। দূরের ওই জাহাজটা এখন আগের চেয়ে কাছে। এবার যা বুঝবার বুঝে নিল, তারপরও বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন, স্যর?' কোনও জবাব নেই, জেসন অন্তরে বুঝল কী ঘটতে চলেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার উচিত ছিল বিমানের স্টুয়ার্ড হওয়া!'

রানা, সোহানা ও ব্র্যাডলি জাহাজের স্টারবোর্ডের লোডিং ডেকে হাজির হয়েছে। জাহাজের গায়ে প্রকাণ্ড একটা স্লাইডিং ডোর খুলল ব্র্যাডলি। ওটার দশ ফুট নীচে সাগরের ঢেউ, দ্রুত পিছিয়ে চলেছে। জাহাজের পিছনে শোঁ-শোঁ আওয়াজে ফুসছে সাগর।

লোডিং ডকে নানান ইকুইপমেন্ট। কিছু ভারী, কিছু হালকা। স্টিলের পুরু একটা কেইবল বেছে নিল রানা। এরপর তুলে নিল একটা স্কুবা আউটফিট।

রানাকে ওয়েটসুটে ঢুকতে সাহায্য করল সোহান, পরিয়ে দিল ফ্লিপার। পিঠের সঙ্গে শক্ত করে ধরল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। রানা স্ট্র্যাপ আটকে নিল।

ওর মুরিং কেইবল পাওয়ার উইঞ্চের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল ব্র্যাডলি। সঙ্গীর জন্য হালকা কেইবল জড়ানো আরেকটা উইঞ্চ বাছল সোহানা, রানার কোমরে আটকে দিল কেইবলের এক মাথা। লোডিং ডকের দরজায় দাঁড়াল দু'জন। খানিকটা দূরে ছুটে চলেছে ক্ষিপ্ত সাগর।

'বুদ্ধিটা মোটেই ভাল লাগছে না আমার,' ঢোক গিলল সোহানা। ও, নিজে হলে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু এমন বিপদে চলেছে রানা.. মন মানতে চাইছে না। 'প্রপেলার নিয়ে না-ই বা ভাব্লাম আমরা?'

'জাহাজটা থামাতে হবে, সোহানা,' যুক্তি দিল রানা।

'সেফটি লাইন বেশি ঢিলা, মিস সোহানা,' বলল ব্র্যাডলি।

'টান করুন। প্রপেলার মিস্টার রানাকে পেলে গুনে গুনে তিন শ' আশি টুকরো করবে।'

কথা শুনে আরও সতর্ক হলো সোহানা, দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেছে। সেফটি কেইবল আরেকবার দেখল। চোখে সন্দেহ। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক জানেন তো, এটা আটকে রাখতে পারবে?'

'চিন্তা করবেন না, আমরা জাহাজে সবসময়ে এ জিনিসই ব্যবহার করি,' বলল ব্র্যাডলি।

'ও আপনাদের মত জাহাজে বসে কাজ করবে না,' প্রায় ধমকে উঠল সোহানা। ওকে যেতে হবে ছুটন্ত জাহাজের নীচে!'

'কোনও সমস্যা হবে না, ওকে আশ্বস্ত করল রানা। আটকে রাখবে।' চট্ করে এক পা এগোল, সোহানার ঠোঁটে চুমু দিল, পরমুহূর্তে মাস্ক পরে নিল। ওটার ভিতর দিয়ে দেখল, সোহানার মায়াভরা চোখদুটো ছলছল করছে।

দ্বিতীয়বার তাকাল না সোহানা, মুখ থমথম করছে, দু'হাতে সেফটি লাইন শক্ত করে ধরল।

অক্সিজেন সাপ্লাই পরীক্ষা করল রানা, পরক্ষণে পিছন ফিরে ডাইভ দিল পানিতে।

সেফটি লাইন উইঞ্চ স্পুল থেকে হড়হড়িয়ে বেরিয়ে চলেছে, চেয়ে রইল সোহানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ব্র্যাডলি বলল, 'যথেষ্ট গেছেন উনি, এবার উইঞ্চ আটকে দিন।'

এক সেকেণ্ডও লাগল না সোহানার স্টপ বাটন টিপতে।

বারো

বিক্ষুব্ধ ঢেউ শোঁ-শোঁ শব্দে পিছিয়ে চলেছে। সাগরে ঝপ্ করে পড়ল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, তীব্র স্রোত ওকে তলিয়ে দিয়েছে। সামনে থেকে আসছে প্রবল স্রোত, নানাদিকে টানছে। খোলের গায়ে আছড়ে পড়লে মারাত্মক ভাবে জখম হবে। ফ্লিপার নেড়ে সরতে চাইল রানা, কিন্তু স্রোত ওকে জাহাজের তলায় ঠেসে ধরতে চাইছে!

কিছুক্ষণ এখানে ওখানে বাড়ি খেয়ে রানা বুঝল, জাহাজের খোলের কাছ থেকে সরতে হবে, নইলে নিশ্চিত মৃত্যু! দু'হাতে কেইবল ধরেছে, দু' পা নাড়াচ্ছে হাঁসের পায়ের মত।

চারপাশ দেখতে চাইল, কিন্তু হাজারো কোটি বুদ্বুদ ছাড়া কিছুই নেই! তার উপর বারবার পাক খেয়ে সেফটি লাইনে অসংখ্য গিঁঠ তৈরি হয়েছে - বুঝবার আগেই রানা লাঠিমের মত ঘুরতে শুরু করল। উপর-নীচ জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে গেল। কয়েকবার জাহাজের তলায় গুঁতো খেয়ে টের পেল, ওদিকটা উপর দিক!

মুরিং কেইবল শক্ত করে ধরেও লাভ হলো না, হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এদিক ওদিকে গিয়ে লাগছে রানা, হঠাৎ কেইবল হাতে পেল, রাখতে পারল না, আবারও হারিয়ে গেল।

অন্তরে টের পেল, এভাবে কিছুই করতে পারবে না। ও যেন আছে, একট ঘূর্ণায়মান ব্লেণ্ডার মেশিনের ভিতর, পানির সঙ্গে একটা কমলার কোয়া। ব্র্যাডলি প্রথম থেকেই আপত্তি করেছে, কিন্তু ও শুনবে না বলে শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছে। লোকটা বলেছে, আপনি তো মরবেনই, আমাদেরও মারবেন! কথাটা ভাবতেই গায়ে শক্তি পেল রানা, পাগলের মত ফ্লিপার নেড়ে নেমে যেতে চাইল। জাহাজের প্রপেলারের কাছে পৌঁছতে হবে, তার আগে দরকার স্টিলের কেইবলটা!

জাহাজের তলার দিকে যেতে চাইল। সামনে শুধু বুম্বাদ আর ধূসর পানি, তার মাঝ দিয়ে মুরিং কেইবল খুঁজতে চাইল। বুদ্বুদগুলো ওর মাস্কের কাঁচে এসে আটকে থাকছে, চ্যাপ্টা হয়ে বিদঘুটে আকার নিচ্ছে, তারপর ছিটকে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। খানিকটা দূরে পানি সোনালী হয়ে উঠেছে।

সূর্যের আলো! জাহাজের খোল থেকে খানিকটা দূরে! পানি সেখানে আরও বিক্ষুব্ধ, কিন্তু মুরিং কেইবল ওখানে। জিনিসটা যেন কালো রঙের একটা বিষাক্ত সাপ, কিলবিল করছে! আরও মনোযোগ দিল রানা -জিনিসটা বিদ্যুদ্বেগে নড়ছে, গায়ে লাগলে হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেবে।

খোলের তলা থেকে সরতে পারবে না, জানে রানা, অপেক্ষা করল। এদিকের স্রোত ওদিকের পানির চেয়ে অনেক শান্ত। উল্টোপাল্টা স্রোত কেইবলটা ওর দিকে নিয়ে আসবে, তখন খপ্ করে ধরবে! আধমিনিট পর সুযোগ এল, জাহাজের তলায় এসে ঢুকল কেইবল। কোনও ভুল হলো না রানার, দু'হাতে খপ করে ধরল -জিনিসটা যেন প্রাণ পেয়ে ফুঁসে উঠেছে, ছোবল দিতে চাইছে। প্রাণপণে ওটা ধরে রাখল রানা। মনে মনে বলল, পেয়েছি তোমাকে!

দেরি না করে রওনা হয়ে গেল জাহাজের তলা লক্ষ্য করে, সঙ্গে সাধের কেইবল টেনে নিয়ে চলেছে। খানিকটা এগোতেই ওর সেফটি ইন বাধ সাধল, আর এগোনো গেল না। কপালের দোষ দিল রানা, পরক্ষণে মুচকি হাসল - সোহানা ওকে বেশি দূরে যেতে দেবে না! শক্ত করে আটকে রেখেছে! দূরে যায় কার বাপের সাধ্যি! ভাবল, এই কঠিন বাঁধন আমি চাই না, সোহানা! দু'হাতে কেইবল ধরল রানা, তারই ফাঁকে কোমরের কেইবলে জোর টান দিল। বারবার ঝটকা দিয়ে চলেছে। একটু পরে ওকে খানিকটা ঢিল দেয়া হলো। কাজটা বোধহয় ব্র্যাডলির। বেঁচে থাকো বাপু!

একবার পিছনটা দেখল রানা, মুরিং কেইল জাহাজের পিঠের সঙ্গে আসছে। আন্দাজ করল, প্রপেলার আছে একশো ফুট দূরে। তার মানে

কেইবল আরও একশো বার টানলে ওটা প্রপেলারের ভিতরে গিয়ে ঢুকবে। তারপর কী ঘটবে, কে জানে!

কেইবল নিয়ে রওনা হলো রানা, একেকবারে এক ফুটের বেশি এগোতে পারল না। প্রতিবারে সংখ্যা গুনে রাখছে। একবার। থেমে বিশ্রাম নিল। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর মনে হলো, প্রপেলারের খুব কাছে পৌঁছে গেছে। কেইবলটা শরীর থেকে এক ফুট দূরে ধরল, তারপর দু'হাতে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। দশ সেকেণ্ড এভাবে পেরল, তারপর হঠাৎই কেইবলের গায়ে শিহরণ তৈরি হলো, আচমকা ঝটকা দিল ওটা। প্রপেলারের কোনও পাখায় আটকেছে! চট করে হাত সরিয়ে নিল রানা, দু'পায়ের জোরালো কিক দিয়ে সরতে চাইল। বনবন করে ঘুরছে। প্রপেলার, তারটাকে পেঁচিয়ে নিল -সমান গতিতে উইঞ্চ থেকে বের করে আনছে!

লোডিং ডকে দাঁড়িয়ে দেখছে সোহানা-ব্র্যাডলি, উইঞ্চ থেকে কেইবল যাচ্ছে। ইস্পাতের কেইবল জাহাজের মেঝেতে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করছে, পরক্ষণে সাগরে গিয়ে পড়ছে।

'কাজ হচ্ছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ব্র্যাডলি।

'তা-ই,' বলল সোহানা। কণ্ঠে কোনও আনন্দ নেই। রানার সেফটি লাইনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে। তাড়া দিল, 'এবার রানাকে টেনে তুলতে হবে!'

মুরিং কেইবলের উইঞ্চের ব্রেক কষল ব্র্যাডলি, আশা করল পেঁচিয়ে যাওয়া কেইবল প্রপেলারের গতি থমকে দেবে। সোহানার পাশে এসে থামল, ছোট উইঞ্চ দিয়ে সেফটি লাইন টেনে নিতে হবে।

ওদিকে ব্রিজের ইন্সট্রুমেন্টগুলো দেখছে অ্যাডামস ও জেসন, জাহাজের গতি সত্যিই কমছে! কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে পড়েছে দু'জন, যেন কোনও ভিডিও গেম দেখছে।

'সাড়ে তেইশ নট! তেইশ... বাইশ... একুশ...' কাউন্টডাউন করছে অ্যাডামস, 'কমছে! জাহাজের গতি কমছে!'

'আয় কমে, কমে আয়,' বলে চলেছে জেসন।

'পারছে ওরা!' হেসে উঠল অ্যাডামস। 'গতি কমছে!'

জাহাজের পিছনে, মেরিনায় একই চিন্তা ঢুকেছে স্মাথার হ্যালেকের মগজে। অবাক হয়েছে সে, পাম কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখে নতুন ডেটা দিল। একবার স্পিড ইণ্ডিকেটর দেখল, গতি কমছে সেটা তার কল্পনা নয়! জাহাজ থামছে নাকি! সময় নষ্ট করা যায় না! জাহাজের গ্রাফিক ভেসে উঠল স্ক্রিনে, ওখানে একটা বাতি বলছে জাহাজের একপাশে একটা লোডিং ডক খোলা হয়েছে!

'সে-সুযোগ তোমাকে দেব না, রানা,' বিড়বিড় করে বলল হ্যালেক। প্রিয় কম্পিউটার ব্যাগে ভরে রাখল, ওটার বদলে একটা গ্লক পিস্তল বের করে হাতে নিল। ওটা কক্ করে রওনা হলো ফিরতি পথে।

সামনে থেকে আসা স্রোতের টান কমছে, টের পেল রানা। তার মানে, জাহাজের গতি সত্যিই কমেছে! কিন্তু স্রোত এখনও প্রচণ্ড, খুব সাবধানে ফিরতে হবে, নইলে বিপদে পড়বে। কোমর আটকে রাখা সেফটি লাইনে প্রতি মুহূর্তে টান লাগছে। সোহানা আর ব্র্যাডলি উইঞ্চ চালিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে

চলেছে ওকে। অক্সিজেন ভালভ পরীক্ষা করল রানা, যথেষ্ট অক্সিজেন আছে। ওদিক থেকে কোনও বিপদ নেই।

সেফটি লাইন ওকে তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে চলেছে, নইলে এগোানো অসম্ভব। এখন ওর উচিত দিকটা ঠিক রাখা, তাতেই উইঞ্চ ওকে লাশের মত টেনে নেবে।

ওর আরেকটা কাজ, জাহাজের খোলে ধাক্কা না খাওয়া। সেফটি লাইনের ব্যাপারে কিছুই করার নেই কিন্তু হঠাৎ দেখল সামনে কী যেন হয়েছে! মুরিং লাইন ঢিলা হয়ে গেল? আন্দাজ করল, ব্র্যাডলির কোনও ভুল হয়েছে, পরমুহূর্তে টের পেল, সেফটি লাইনে টান নেই! জোরাল স্রোতের সঙ্গে পিছিয়ে চলেছে! লাইনটা ছিড়ে গেল? জাহাজের খোলের তলা থেকে সরতে হবে! প্রপেলারে হাজার টুকরো হওয়ার চেয়ে সাগরে ডুবে মরা অনেক আনন্দের, অবশ্য মরায় যদি আনন্দ বলে কিছু থাকে! সরতে গিয়ে চমকে গেল রানা, মুরিং কেইবলের সঙ্গে সেফটি লাইন জড়িয়ে গেছে। দ্রুত পিছিয়ে চলেছে ও! পিছনে ঘুরছে মস্ত প্রপেলার, ওকে কাটবে!

কোমর থেকে দু'হাতে সেফটি লাইন খুলতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে জাহাজের পিছনের স্রোত ওকে পেয়ে বসেছে! হিড়হিড়িয়ে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে! স্রোতের সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ছুটছে, অরই মাঝে দেখল বিরাট প্রপেলারের পাখাগুলো পানি কাটছে। যা ভেবেছে গতি তার চেয়ে অনেক বেশি!

ওদিকে লোডিং ডকে সোহানার চোখদুটো বিস্ফারিত হলো, রানার লাইন আসবার বদলে ফিরতি পথ ধরেছে! তার মানে প্রপেলারের টানবার গতির

বিরুদ্ধে উইঞ্চ হারছে! 'ওকে তুলে আনতে হবে, মিস্টার ব্র্যাডলি!' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা।

ছোট উইঞ্চের বুলওয়ার্কে পা দিয়ে ব্রেক ঠেসে ধরল ব্র্যাডলি, দু'হাতে কেইবল ধরে টানবার ফাঁকে গালি দিল, 'আয় শালা! আয়!'

হাত লাগিয়েছে সোহানাও, খেয়ালই নেই দু'হাতের তালু ছিলছে। দু'জন মিলে টেনে রাখতে চাইছে, কিন্তু তবুও কেইবল বেরিয়ে চলেছে! পাগল হয়ে উঠল সোহানা, তাড়া দিল, 'আরও জোরে টেনে ধরুন! পিছলে না যায়।'

'চেষ্টা করছি!' দাঁতে দাঁত চেপে কেইবল আটকে রাখতে চাইল ব্র্যাডলি।

ওরা এমনই ব্যস্ত যে খেয়াল করল না ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্ট্রাথার হ্যালেক, হাতে একটা গ্লক পিস্তল!

পরিস্থিতি মুহূর্তে বুঝে নিল হ্যালেক, সামনের দু'জনের দিকে আর তাকাল না, ঠোঁটে হাসি -বিরাট উইঞ্চ থেকে মুরিং কেইবল বেরিয়ে চলেছে। তা হলে এটাই ছিল গতি কমার কারণ! দু'পা ফেলে উইঞ্চের কাছে পৌঁছে গেল হ্যালেক, পিস্তলটা কোমরে খুঁজে নিল। একবার দেখল, দুই লড়াকু হারতে রাজি না, মুরিং কেইবল উইঞ্চ থেকে বেরিয়ে ডেকের উপর দিয়ে সাগরে। পড়েছে। কী সুন্দর মেয়েটা, আর ওই বেত্তমিজ ব্যাটা ওকে পাবে? ওই রানা, বেজন্মা কুকুরটা! দু'হাতের জোরে উইঞ্চের ব্রেক চাপল হ্যালেক, সঙ্গে সঙ্গে কেইবল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো। প্রপেলার। টেনে নিতে চাইল কেইবল, কিন্তু উইঞ্চ গ্যাঁট মেরে রইল। দুই দানবীয় যন্ত্র পরস্পরকে হারিয়ে দিতে চাইছে।

প্রপেলারের গতি কমে গেল, কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনগুলো এখনও প্রচণ্ড শক্তি জোগান দিচ্ছে। উইঞ্চ থরথর করে কাঁপতে লাগল, ওটার বল্টুগুলো

ধাতব ডেক থেকে উপড়ে আসতে চাইল। গিটারের তারের মত টানটান হলো মুরিং কেইবল, যে-কোনও মুহূর্তে পটাং করে ছিঁড়বে!

ওদিকে জাহাজের তলায় পিছিয়ে চলেছে রানা, প্রপেলার আর মাত্র পঁচিশ ফুট -তারপর ভয়ঙ্কর মত্যু! বাঁচার একটাই পথ, মুরিং কেইবল থেকে সেফটি লাইন ছুটিয়ে নেয়। দ্রুত হাতে নানা কাজ করছে, সফলতাও আসছে, কিন্তু লাইনটা মুক্ত করবার সময় পাবে? তার আগেই তো মস্ত পাখার ভিতরে গিয়ে ঢুকবে!

উপরে সোহানা বা ব্র্যাডলি লোডিং ডকে ব্যস্ত, জানে না হ্যালেক পিছনে। লোকটা বিরাট একটা ক্রেটের পিছনে গিয়ে থামল, কোমর থেকে পিস্তল বের করে নিল -সম্পূর্ণ তৈরি। জানে, সামনে বিরাট বিপদ আসছে! ওটা আসবে বড় উইঞ্চটার কাছ থেকে। জিনিসটার ব্রেক আটকে দেয়াটা বোধহয় ভুলই হলো। কিন্তু এখন আর ভুল শোধরাবে কে! মুরিং কেইবল যেকোনও মুহূর্তে ছিড়বে, কাউকে উইঞ্চের সামনে পেলে দু'টুকরো করবে! না, ওটার কাছে যাওয়া যায় না! মেয়েটা দারুণ মাল ছিল, কিন্তু তাকে এখন মরতেই হবে! ওর মৃত্যু ঠেকাতে যাবে না ও। তার চেয়ে দেখা যাক কী ঘটে! কেইবল ছিঁড়বে, না উইঞ্চ উপড়ে আসবে? দারুণ দৃশ্য! তারপরই তো আসল খেলা!

সোহানা ও ব্র্যাডলি বারবার কেইবল দেখছে, ভয়ে দু'জনের মুখ শুকিয়ে গেছে। উইঞ্চের বল্টুগুলো ঘুরতে ঘুরতে খুলে আসছে! হঠাৎ ইস্পাতের মেঝে থেকে উপড়ে আসবে উইঞ্চ! ঠন-ঠনাৎ করে কয়েকটা বল্ট খুলল, উইঞ্চ নড়ে উঠল! ওরা জানে না, প্রকাণ্ড উইঞ্চ সাগরে গিয়ে পড়বে, নাকি মুরিং কেইবল ছিঁড়বে! কেইবলের সরু থ্রেডগুলো চিরচির করে খুলে আসছে, কেবল টান খেয়ে অনেক চিকন হয়ে গেছে! উইঞ্চ এই মুহুর্তে মেঝের সঙ্গে আটকানো

শুধু কয়েকটা বল্টুর কারণে! সেগুলোও পাক খেয়ে ঘুরছে, মেঝের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে! রানার সেফটি লাইন টেনে আনতে চাইছে সোহানা, কিন্তু কেইবল উল্টো চলে যাচ্ছে। সাহসী মেয়েটা হারতে রাজি নয় দেখে ব্র্যাডলি এখনও চেষ্টা করছে -নিজের কাছে ছোট হবে না! হঠাৎ ওদের মনে হলো কয়েকটা পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছে! এক পলক দেখল কী। যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল! পরক্ষণে দেখল বিরাট উইঞ্চ শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে। ওটা মেঝেতে দড়াম করে কাত হলো, ইস্পাতে ইস্পাতে ঘষা লাগল, অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল! খোলা দরজার দিকে হেঁচড়ে চলেছে উইঞ্চ, মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড লাগল ওটার দরজা পেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়তে!

সোহানা বা ব্র্যাডলি তার আগেই সরে যেতে চেয়েছে, তবে ব্র্যাডলি একটু পরে সরেছে -উইঞ্চ সাগরে গিয়ে পড়বার পথে তার ডানহাতে সামান্য টোকা দিয়ে গেছে। সোহানা উঠে দাঁড়িয়ে আবারও রানার সেফটি লাইন ধরল। ওকে সাহায্য করবার জন্য উঠতে চাইল ব্র্যাডলি, কিন্তু তীব্র যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল ডান বাহুর হাড় চুরমার হয়ে গেছে?

নীচে রানা কোটি বুদ্বুদের মধ্যে দেখল কী যেন ছুটে আসছে! জিনিসটা খুব দ্রুত! অনেকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত! তবে দেখতে তার চেয়ে অনেক কুৎসিত! চার হাত-পা নেড়ে সরতে চাইল। রানা, একমুহূর্ত পর বুঝল, ওর আর বাঁচা হবে না! পিছনে প্রপেলার অপেক্ষা করছে ওকে টুকরো করতে, সামনে থেকে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক দানব! এদিকে ছুটন্ত জাহাজের নীচে ওকে আটকে রেখেছে ইস্পাতের কেইবল। তিক্ত মনে ভাবল রানা, তুই তো শিশু রে; জাদুকর হুডিনিও এই অবস্থায় চ্যাপ্টা হয়ে মরত! মন অন্যদিকে

সরিয়ে নিতে চাইল, চিন্তা এল, তা হলে খেলা শেষ? সোহানার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

ঠিক তখনই একসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করল; রানা ঠিক বুঝল না –বো ওয়েভের সঙ্গে এল উইঞ্চ, একটানে ওকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। জাহাজের তলায় আটকে গেল রানা। ওর আঠারো ইঞ্চি দূর দিয়ে পার হলো উইঞ্চ, সঙ্গে নিয়ে চলল মুরিং কেইবল। ওই কেইবলই রানার সেফটি লাইন একটানে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু আরও দুটো কাজ হলে খুব ভাল হতো। জাহাজের গায়ে আঘাত না করে প্রপেলারের দিকেই ছুটল উইঞ্চ, কিন্তু পাখাগুলোর তিনচার ইঞ্চি পাশ দিয়ে গেল। রানার ধারণা হলো, ওই উইঞ্চই নোঙরের কাজ করবে বুঝি। সত্যিই ওটা সাগর তলে থামল, কিন্তু মুরিং কেইবল প্রপেলার থেকে কয়েক পাক দিয়ে খুলে চলে গেল নীচে -সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন উদ্যমে ঘুরতে শুরু করল প্রপেলার।

কোমরের সেফটি লাইনে ঝটকা অনুভব করল রানা। দ্রুত টানটান হলো ঢিলা কেইবল। টের পেল, জোর স্রোতের বিরুদ্ধে ওকে টেনে নেয়া হচ্ছে। মৃদু হাসল রানা, মনের চোখে দেখল সোহানা উইঞ্চে ব্যস্ত, ভুলেও কেইবল ঢিল দিচ্ছে না।

দু'মিনিট পর জাহাজের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, ঢেউয়ের নীচ থেকে মাথা তুলল। চৌকো লোডিং ডেকে দিকে এগিয়ে চলল, একহাতে অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করল, মুখ থেকে। মাস্ক খুলে মাথার উপরে আটকে নিল। ওই তো উপরে দাঁড়িয়ে হাসছে সোহানা, হাত নাড়ল। সেফটি লাইন রানাকে তুলে নিচ্ছে। ডেকের সমান উচ্চতায় ওর মাথা পৌঁছে যেতেই মাঝের কালো বোতামটা টিপে উইঞ্চ বন্ধ করল সোহানা, এবার রানা নিজেই উঠে

আসবে। বসে পড়ে দু'হাতে ওর কনুই ধরল সোহানা, যেন তুলে আনতে পারবে। পারবে না বুঝে হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হসল রানা। সোহানাকে সদ্য ফোটা গোলাপের মত লাগছে। খানিকটা দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে ব্র্যাডলি। বোধহয় উইঞ্চ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে উঠে দাঁড়াল মানুষটা, অপর হাতে ভাঙা হাত ধরে রাখল।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোনও জবাব দিল না ব্র্যাডলি, পাথরের মত মুখ করে অনড় রইল। এতক্ষণে দেখতে পেল রানা, সামনেই স্ট্রাথার হ্যালেক। সোহানার মাথার পিছনে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে হাসছে। সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে সোহানার মুখটা।

'একটু পিছিয়ে এসো, সোহানা ডার্লিং,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হ্যালেক। 'ওই লোকটার কাছ থেকে দূরে।'

নড়ল না সোহানা। নিরুপায় রানা খোলা ডেকের পাশে ঝুলছে, পায়ের নীচে সাগরের মাতাল ঢেউ!

কড়া চোখে রানাকে দেখল হ্যালেক, বুঝে নিল ত্যাড়া লোকটা এখন কিছু করতে পারবে না। সোহানাকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমিককে বলো, তার হিরোইজম দেখাবার আর কোনও অবকাশ নেই। দুনিয়ার সেরা অটোমেটেড জাহাজ ছুটছে পৃথিবীর বৃহত্তম ট্যাঙ্কারের দিকে! ওটা আবার তেলে ভরা! শুধু তা-ই নয়, ওটা তার নোঙরগুলো ফেলেছে উল্টোপাল্টা প্যাটার্নে!' গর্বের সঙ্গে রানার দিকে চাইল, 'একবার ভেবে দেখো, কেমন লজিস্টিক তৈরি করেছি আমি।'

চুপ করে থাকল রানা।

হ্যালেক ভুল বলেছে, ভাবল রানা। ওই ট্যাঙ্কারে তেল আছে অর্ধেকটা। ও জানে, কারণ মৃত্যুর আগে রেবেকা সাউল তার বিশাল জাহাজ কোম্পানীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেছে ওরই হাতে। অবশ্য অর্ধেক থাকুক বা পুরো, ক্ষয়-ক্ষতি সমানই হবে।

চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল হ্যালেক। 'তুমি জাহাজের গতি কমিয়ে দিলে, কিন্তু পারলে থামাতে এটাকে? কিংবা আমাকে? এই যে তোমার সামনে থেকে তোমার প্রেয়সীকে নিয়ে যাচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্যে, পারবে তুমি ঠেকাতে?' খপ্ করে সোহানার বামহাত ধরল সে।

'ওর হাত ছাড়ো,' চাপা স্বরে বলল রানা।

হাত ছেড়ে পিছন থেকে সোহানার বুক জড়িয়ে ধরল হ্যালেক, পিস্তলটা আরও ঠেসে ধরল ওর কানের পাশে।

'কোনও দ্বীপে গিয়ে বাকি দিন কটা কাটিয়ে দাও, হ্যালেক,' বলল রানা, 'তোমার পাছায় যতখুশি জোঁক আটকে রেখো।'

'ও, তা হলে আমার নার্সদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' বাঁকা হাসল হ্যালেক। 'ওরা আমার রক্ত থেকে বিষ চুষে নেয়। ডাক্তারগুলো বলেছিল তিন মাসও বাঁচব না, কিন্তু ছয়মাস পেরিয়ে গেছে -ওই জোকগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও।'

'এই মুহূর্তে সোহানাকে ছেড়ে না দিলে আয়ু অনেক কমে যাবে তোমার, হ্যালেক!' বলল রানা।

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল হ্যালেক, হুমকি দিচ্ছে ওই বাজে লোকটা! এক ঝটকায় পিস্তল তাক করল রানার দিকে।

সোহানা একটা সেকেণ্ড সুযোগ পাবে, জানে রানা। চট করে লোডিং ডেক থেকে হাত সরিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল সাগরে। এক ঝটকায় পাশ ফিরে পিছনের লোকটার কণ্ঠা লক্ষ্য করে কনুই চালাতে গিয়েছিল সোহানা, কিন্তু ও সামান্য নড়ে উঠতেই ওকে ছেড়ে দুই কদম পিছিয়ে গেল হ্যালেক; গ্লকটা তাক করল সোজা ওর কপাল বরাবর।

'শুধু পাঁচটা মিনিট,' বলল সে নিরুত্তাপ কণ্ঠে, 'তার বেশি তোমাকে দরকার নেই আমার, সুন্দরী। নিরিবিলিতে মাত্র পাঁচটা মিনিট, ব্যস। তোমার প্রয়োজন ওইটুকুই। নিজেকে অপরিহার্য মনে করতে যেয়ো না। আমি বেপরোয়া লোক। এই মুহূর্তে তোমার মগজে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে সামান্যতম কাঁপবে না আমার হাত। বেঁচে থাকতে হলে, সাবধান, বেশি স্মার্টনেস দেখাতে যেয়ো না।'

ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল রানা, হ্যালেক গুলি করবার আগেই ডুব দেবে। চোখ তুলে দেখল, লোকটা এখনও সোহানার পিছনে। পরিস্থিতি বরং আরও খারাপ, সোহানার কাছ থেকে কয়েক ফুট পিছিয়ে পিস্তল তাক করে রেখেছে। ছুটন্ত ঢেউয়ের মাঝে চারপাশ দেখল রানা, শুধু ওই খাটো সেফটি লাইন ওকে আটকে রেখেছে। ওর এয়ার লাইন খোলা অবস্থায় ঝুলছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখল, উপর থেকে পানিতে পড়ে মাস্কটা গেছে।

সেফটি লাইন উইঞ্চের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যালেক, এক ঝাপটায় লাল বোতামটা টিপে দিল। কিন্তু পিস্তল এখনও সোহানার দিকে তাক করা। দম নেয়ার জন্য এক সেকেণ্ড পেল রানা, পরমুহূর্তে ডুবে গেল। জাহাজের নীচের স্রোত ওকে জোর টান দিল, আবার নিয়ে চলল প্রপেলারের দিকে। ওটা এখন পূর্ণ গতিতে ঘুরছে!

লোডিং ডকে কর্কশ স্বরে হেসে উঠল হ্যালেক। হাসি আরও বাড়ল সোহানার দিকে চেয়ে। ফ্যাকাসে মুখে সাগরের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। রানা ওখানে ডুবেছে। বড় ডিসটার্ব করছিল হারামজাদা, মর! -ভাবল হ্যালেক। আমিও মরব, কিন্তু তোর পরে। ফার্স্ট অফিসারের চোখে তাকাল হ্যালেক, খুশি হলো। লোকটার চেহারায় তীব্র ভয় দেখে। হাসি হাসি মুখে বলল, 'তুমি বোধহয় রাগ করবে না, মিস্টার ব্র্যাডলি? আমি কিন্তু মিস সোহানাকে সঙ্গে নিচ্ছি। কিছুটা বিনোদন তো বটেই, এটাকে ছোট্ট একটা সুন্দর জীবন-বীমাও বলতে পারো।'

হাঁ করে শুনছে ব্র্যাডলি, কোনও সুযোগই পেল না বেচারা, সোহানার দিকে পিস্তলটা তাক করে রেখেই লাফিয়ে তার পাশে চলে গেল হ্যালেক - এক ধাক্কায় তাকে দরজা পার করিয়ে দিল। ঝুপ করে সাগরে গিয়ে পড়ল ব্র্যাডলি। পিছন থেকে হ্যালেক চেঁচিয়ে বলল, 'একহাতে ফ্রি-স্টাইল সাঁতরাতে পারো নিশ্চয়ই? হেহ্ হেহ্!'

মাঠে মারা গেল হ্যালেকের রসিকতা, ফার্স্ট অফিসার ঝপাৎ করে পানিতে পড়েই তলিয়ে গেছে।

'চলে এসো, ডালিং।' পিছন থেকে সোহানাকে বামহাতে জড়িয়ে ধরল হ্যালেক। পিস্তলের নল ঠেকাল কানে।

'ছাড়ো আমাকে!' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, দুহাতে সেফটি উইঞ্চ জাপ্টে ধরেছে।

'তুমিও কি ওদের সঙ্গে যেতে চাও?' ধমকে উঠল হ্যালেক।

'হা! তা-ই চাই!'

‘বেশ,’ নোংরা হাসি হাসল হ্যালেক। ‘আগে আমার কাজটা হয়ে যাক, তোমাকেও পাঠিয়ে দেব ওদের কাছে।’

‘ছাড়া আমাকে!’ আবার বলল সোহানা। ‘নইলে পরে...’

পাত্তা দিল না হ্যালেক, হ্যাঁচকা টানে উইঞ্চ থেকে সোহানার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। লাথি ছুঁড়ল সোহানা। হাঁটুতে বেমক্কা লাথি খেয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেল হ্যালেকের চোখ-মুখ।

‘উইঞ্চ ছাড়বি না, শালী?’ আরও রেগে গেল হ্যালেক, বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে এসে গলা পেঁচিয়ে ধরল। উইঞ্চ আঁকড়ে রাখতে পারল না সোহানা। ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে পিঠে ধাক্কা দিল হ্যালেক। হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল সোহানা। পিছন থেকে ধমক দিল হ্যালেক, ‘খবরদার! আর বাঁদরামি করলে পেঁদিয়ে তোর...!’ জাহাজের আরও ভিতরের দিকে সোহানাকে নিয়ে যাচ্ছে সে।

পিছনে পিস্তল হাতে হ্যালেক, এগিয়ে চলল সোহানা, শুধু একবার কাঁধের উপর দিয়ে ডেকটা দেখল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল। কোনও ভুল হয়নি ওর উইঞ্চের নীল রিওয়াইণ্ড বাটন টিপতে।

তেরো

টুপ করে ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল ব্র্যাডলি, কিন্তু চোখ এখনও খোলা। কাছেই সেফটি লাইন দেখে অক্ষত হাতে ধরল। কেইবল তাকে নিয়ে পিছিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর আবারও ফিরতি পথ ধরল। তবে একহাতে ভালমত

ধরা যায় না কেইবল। ফস্কে গেল ওটা। প্রচণ্ড স্রোতের টানে প্রপেলারের দিকে ছুটল ব্রাডলি। কিন্তু আড়াই সেকেণ্ড পর রানার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থামল। মাস্ক নেই বলে রানা নিজেই মহাবিপদে আছে, কিন্তু চিনতে পেরেই ব্র্যাডলিকে এক হাতে ধরে ফেলল। শ্বাস আটকে রেখেছে, আশা করল সেফটি লাইন ওদের এখনই তুলে নেবে।

পেশিগুলো রক্তের রাসায়নিক পদার্থগুলোর মাধ্যমে মগজে বার্তা পাঠাচ্ছে, তাদের অক্সিজেন দরকার। ফুসফুস জ্বলছে, হৃৎপিণ্ড পাগল হয়ে উঠছে। ব্রেন রানাকে শ্বাস নেয়ার জন্য বারবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু ও জানে, আরও তিরিশ সেকেণ্ড সহ্য করতে পারবে মগজ -তারপর নিজেই দায়িত্ব নেবে, মুখ আপনি হাঁ হয়ে যাবে! চোখ বুজে মগজকে পাল্টা নির্দেশ দিল রানা, আর কয়েকটা সেকেণ্ড! শরীরের পেশিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করো! ওর চোখদুটো খুলে গেল, কিন্তু কিছুই দেখছে না! মন বলল, সামনে হাজারো উজ্জ্বল তারা! কিন্তু ওগুলো তারা না, বাতাসও না, ওগুলো আসলে কিছুই না! বুকে-মাথায়, সবখানে ব্যথা! প্রচণ্ড ব্যথা! আর পারা যায় না!

না! পারতে হবে! পারতেই হবে!

ওদিকে আর সহ্য করতে পারল না ব্র্যাডলি, শ্বাস নিতে চাইল। ফুসফুসে বাতাসের বদলে ঢুকল সাগরের পানি। ছটফট করে উঠল ব্র্যাডলি, হাত ছুটে গেল কেইবল থেকে। দু'হাত কী যেন ধরতে চাইল। বামহাতের আঙুলগুলো রানার শার্ট পেল, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। অকেজো ডানহাত দ্রুত নড়ছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মানুষটা শিথিল হয়ে গেল।

ছটফট করছে রানাও, ব্র্যাডলিকে দু'হাতে আরও জাপ্টে ধরল, শুধু জানে লোকটাকে ধরে রাখতে হবে, নইলে মরবে! মরবে তো ওরা দুজনই!

তারপর হঠাৎ ঢেউয়ের উপর রানার মাথা উঠল। মুখের সামনে পানি নেই। শ্বাস নিল রানা। একবার! দু'বার! বারবার। আর কিছুতে এত আনন্দ নেই! মন চাইল হেসে ওঠে। চারপাশ দেখল, দু'হাতে ব্র্যাডলিকে আরও শক্ত করে ধরল -উইঞ্চ ওদের তুলে নিল লোডিং ডকের পাশে। দু'হাতে ব্র্যাডলিকে পাঁজাকোলা করে রেখেছে রানা, ডেকের ভিতর দিকে ঠেলে দিল, আছড়েপাছড়ে নিজেও উঠে এল। সুইচ টিপে উইঞ্চ বন্ধ করেই দু'পায়ের ফ্লিপার টান দিয়ে খুলল। ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্র্যাডলিকে নিয়ে। তাকে উপুড় করে দিল, মাথাটা কাত করে রেখেছে। দু'হাতে বারবার ফুসফুসে জোরে চাপ দিল। ব্র্যাডলির মুখ দিয়ে পানির পিচকারি বেরিয়ে এল। বেদম কেশে উঠল সে, জ্ঞান ফিরছে। ভাঙা হাতের ব্যথায় ছটফট করে উঠল।

অক্ষত হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। মানুষটা কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু পেইনকিলার দেয়ার উপায় নেই এখন। জিজ্ঞেস করল, 'সোহানাকে নিয়ে কোনদিকে গেছে হ্যালেক?'

এখনও ব্র্যাডলির কষা বেয়ে লবণ-পানি গড়াচ্ছে, বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে দুঃসাহসী বাঙালী যুবকটিকে। থুতু ফেলে বলল, 'জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হলে একমাত্র জায়গা হচ্ছে মেরিনা।'

ক্যাপ্টেন অলিভার সুপার-ট্যাঙ্কারের ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলেছেন, পরনে মখমলের মোলায়েম রোব। কেবিনে আরামে ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ ফাস্ট অফিসার নাহিআন মাহমুদ ফোন করেছে। লোকটার একটু যদি আক্কেল থাকত! ওর বাপের শ্রাদ্ধ করছেন তিনি মনে মনে। কোম্পানি তাকে শ্বেতাঙ্গ কোনও ফার্স্ট অফিসার দিলে এত ঝামেলা সহ্য করতে হতো না। এসব

নেটিভ কোনও দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে না। এই কোম্পানি আবার নেটিভদেরই চাকরিতে বেশি নেয়। নেবেই তো, শালার চেয়ারম্যানটাই তো একটা কালা আদমি -নাম আবার মাসুদ রানা! ওটা কোনও নাম হলো! পিত্তি জ্বলে! আর এই নাহিআন মাহমুদ, ওটাও বাঙালি, মুসলিম । মুসলিম ভাবলেই মেজাজ খাট্টা হয়ে ওঠে তাঁর। ব্যাটা দায়িত্ব পালন করতে না পারলে চাকরি ছেড়ে দূর হ! নিশ্চয়ই কোনও বেরাদারকে ধরে চাকরি জুটিয়েছে! ওই মাসুদ রানা শালাই হয়তো!

'ভালভাবে তোমার কাজ শেখা উচিত,' ফোনে বলেছেন অলিভার। 'এমন কী ঘটেছে, রাতবিরেতে এভাবে ডাকতে হবে?'

নাহিআন মাহমুদ শান্ত স্বরে বলেছে, 'আপনার বোধহয় ব্রিজে আসা জরুরি, স্যর। একটা জিনিস দেখতে হবে।'

ব্রিজে ঢুকে নাহিআন মাহমুদের সামনে থামলেন ক্যাপ্টেন অলিভার, নেটিভটার হাত থেকে নাইট-ভিশন বিনকিউলারটা নিলেন। কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, 'তো... কী দেখতে হবে?'

ব্রিজের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাহমুদ। উত্তর-পূর্ব দিকে তাকান, স্যর।'

ওদিকে বিনকিউলার তুললেন অলিভার। বেশ কয়েক মাইল দূরে বড় একটা সাদা জাহাজ-দ্রুত গতিতে আসছে। ওটার নাক বরাবর বিনকিউলার তুললেন। আরে! ওটা তো নোয়া'জ বোট লক্ষ্য করেই আসছে! ঘুরে দাঁড়িয়ে রেইডার স্ক্রিনের সামনে চলে গেলেন, কিন্তু নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে চাইল না মন।

'বিশ নট গতিতে আসছে,' বলল মাহমুদ।

সেকেণ্ড অফিসার জানাল, ‘রেডিওতে পাইনি আমরা ওদের। কোনও জবাব নেই!’

ক্যাপ্টেন নেটিভ ফার্স্ট অফিসারকে পাত্তা না দিয়ে আবারও ব্রিজের জানালায় গিয়ে থামলেন। বিনকিউলার তুলে সামনে দেখলেন, শখের ঘুম চোখ ছেড়ে উধাও! বিনকিউলার নামিয়ে সেকেণ্ড অফিসারকে বললেন, ‘নোঙরগুলো জলদি তোলো, ফ্রেড!’ মাহমুদের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন, ‘আমাকে এতক্ষণ ডাকা হয়নি কেন!’

‘ওটা রেইডার স্ক্রিনে এসেছে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে,’ জানাল মাহমুদ, একটুও দেরি না করে তখনই আপনাকে জানিয়েছি।’

সেকেণ্ড অফিসারকে বলল, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ শুনেছ। ‘চলো নোঙর তোলার কাজটা তদারকি করি গিয়ে।’

মনে মনে বেয়াড়া লোকটাকে ঝেড়ে গালি দিলেন অলিভার।

ইচ্ছে করেই ধীরে হাঁটছে সোহানা। হ্যালেক ভাবল, মেয়েলোকটা ফিগার পেয়েছে বটে! তবে বেশিক্ষণ সঙ্গে রাখা যাবে না। ওটা ঝামেলার মাল। বড়জোর একটা দিন সঙ্গে রাখতে পারবে ওকে, তারপর নিজেকেই উধাও হয়ে যেতে হবে। মেরে রেখে যাবে না সেটাই তো বেশি! নিঃশব্দে সামনে বাড়ল হ্যালেক, একহাতে সোহানার পিঠে ধাক্কা দিল। ‘জোরে হাঁটো!’

হোঁচট খেল সোহানা, সামলে নিল, কিন্তু চলার গতি তেমন বাড়ল না। পাজি মেয়েটা কিছু করে বসার আগেই পিছিয়ে গেছে হ্যালেক। ভাবল, মেয়েটা এত সুন্দর! সিদ্ধান্ত নিল, দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাবে ওকে -অনেকদিনের ভুখা সে। কিন্তু দু’মিনিটে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল, ভাবতে

লাগল -অনেক দেরি হয়ে গেছে, এক গুলিতে মেরেই রেখে যাই! পরমুহূর্তে মনে পড়ল প্রয়োজনে ইনশিওরেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এই সুন্দরীকে, এখনই একে খুন করা যাবে না। চট করে চারপাশ দেখল, কোথাও কেউ নেই। কারও থাকার কথাও নয়, কিন্তু তারপরেও একটু আগেই তো কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছিল মাসুদ রানা, সোহানা আর ওই অফিসার! রানা আর ওই লোক এতক্ষণে পানির নীচে শেষ, কিন্তু আবার আচমকা কেউ এসে হাজির হতে কতক্ষণ? ঘড়ি দেখল হ্যালেক। হাতে বেশি সময় নেই, তবে মেরিনা বেশি দূরেও না। ত্যাড়ামি না করলে এ মেয়ে বুঝবে সত্যিকার পুরুষ কাকে বলে।

পাঁচ মিনিট পর মেরিনায় পৌঁছে গেল দু'জন। দশ ফুট পিছনে থামল হ্যালেক, পাম কম্পিউটারে কয়েকটা চাবি টিপল, তারপর এগোল আবার। পাম কম্পিউটারের ওজন মাত্র পাঁচ আউন্স, কিন্তু দেখো, ওটাই কেমন মেরিনার কয়েক শ' টন ওজনের প্রকাণ্ড ধাতব দরজা খুলছে। ওটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অটোমেটিক গ্যারাজ ডোর।

সোহানার পিছনে চলে গেছে হ্যালেক, পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, সামনের সিঁড়ি বেয়ে নেবে যাবে, একটু এদিক-ওদিক যেন না হয়!'

মেরিনাতে গিয়ে থেমেছে সিঁড়ি, এরপর পানির সামনে খানিকটা আঙ্গিনা। পা বাড়াল সোহানা, পিছনে হ্যালেক। বড়সড় পুলে সারি দিয়ে ভাসছে বেশ কিছু উইণ্ডসার্ফার, সেইলফিশ, জেট স্কি, ছোট নৌকা আর স্পিডবোট। মেরিনার দরজা খুলে গেলে। নৌযানগুলো সরাসরি সাগরে বেরতে পারবে।

সোহানাকে সামনে রেখে একটা উইণ্ড-জেট ৬১-র কাছে চলে গেল হ্যালেক। এই উইন্ড-জেট আলাদা দুটো জেট-স্কি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, প্রয়োজনে মাঝখানের জোড়া খুলে নিলেই হলো। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে দেখে খুশি হলো হ্যালেক, পিস্তল হাতে সোহানাকে সংযুক্ত জেট-স্কির আসনে বসতে ইশারা করল, এবার দেখবে তোমাকে কেমন হাওয়া খাওয়াই।'

পিস্তলটার দিকে একবার চাইল সোহানা, নাগালের বাইরে। জেট-স্কিতে উঠতে গিয়ে চোখের কোণে দেখতে পেল পিস্তলটা বামহাতে নিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে নৌযানের দড়িটা খুলছে হ্যালেক। দড়ি খোলার ছলে লোকটা আর কিছু করছে কিনা দেখতে পেল না সোহানা, আচমকা দশটা সূর্য জ্বলে উঠল ওর মাথার ভিতর। যখন চোখ মেলল, দেখল চালকের সিটে হাসিমুখে বসে আছে হ্যালেক, পাশে রাখা দেড় ফুট লম্বা একটা স্টিলের রেঞ্চ। ওটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরেই ওকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। সেই ফাঁকে ওর দুই হাতের কজি এক করে কষে বাঁধা হয়েছে শক্ত রশি দিয়ে, রশির আরেক মাথা বেঁধেছে লোকটা জেট স্কির সামনের দিকে একটা আংটার সঙ্গে। চোখ তুলে দেখল, মেরিনার দরজাটা এখনও ধীরে ধীরে খুলছে। জেট-স্কি ঠেলে আগেই নামিয়ে দিয়েছে হ্যালেক পানিতে, এখন শুধু। তার দিকের ইঞ্জিনটা গর্জে উঠল, তারপর ধীরে-সুস্থে এগোল খোলা দরজার দিকে।

এক্সেলারেটার দাবিয়ে সোহানাকে বলল হ্যালেক, 'শক্ত করে বোসো, ডার্লিং!'

জাহাজের পিছনের ডেকে পৌঁছে গেছে রানা, খানিকটা নীচে মেরিনার দরজা খুলছে। নীচে তাকিয়ে দেখল একটা উইণ্ড-জেট ধীর গতিতে সাগরের দিকে চলেছে। সোহানাকে বন্দি করে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে হ্যালেক!

বিদ্যুদ্বেগে রেলিং টপকে একধারের কবাটে নামল রানা, ওখান থেকে নামবে উইণ্ড-জেটের উপর। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে পারল না -নীচেই গিয়ে পড়ত, তবে কবাটের উপরের অংশ ডানহাতে আঁকড়ে ধরতে পারল।

মেরিনার দরজা ধরে রানাকে ঝুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'রানা! সাবধান!' উন্মাদিনীর মত কব্জি দুটো খুলতে চাইল।

অনড় জাহাজ থেকে শান্ত সাগরে বেরনোর জন্য মেরিনার দরজা। এখন চালু অবস্থায় উইণ্ড-জেট গিয়ে পড়ল প্রপেলারের তৈরি টালমাটাল ঢেউয়ে। ছোট্ট নৌযান বিপজ্জনক ভাবে দাপাদাপি শুরু করল। কন্ট্রোলগুলো ধরে রাখতে হিমশিম খেল হ্যালেক। আরেকটু হলে সিট থেকে ছিটকে সাগরে গিয়ে পড়ত সোহানা। তবে সামনে অনেক কম ঢেউ, আর একটু এগােতেই ওখানে পৌঁছে গেল উইণ্ড-জেট। ঘুরে গেল ওটা, জাহাজের কাছ থেকে সরে ছুটল দ্বীপের দিকে।

দু'হাতে দরজার উপরের অংশ ধরল রানা, কিন্তু উপরে উঠতে গিয়ে হাত ফস্কে গেল। ডানহাতে ঝুলছে, নীচের দিক দেখল। সাগরে গিয়ে পড়লে লম্বা সাঁতার কাটতে হবে। সারারাত ছোটাছুটি করে এত শক্তি নেই যে এখন ওই দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। বামহাতে আবারও কবাট ধরল রানা, ঝুলে থাকল। উপরের ডেকের দিকে তাকাল, ওখান থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে কী লাভ হলো?

লাভ হয়নি, কিন্তু উপরের ডেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ফটোগ্রাফার ব্রায়েস। লোকটা খুশি হয়ে উঠেছে ওকে ঝুলতে দেখে। মনে হলো ওকে তুলে নেয়ার ইচ্ছা নেই, পটাপট ছবি তুলছে! কড়া চোখে তাকাল রানা।

ক্যামেরা নামিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ব্রায়েস, ‘ইয়াহু, যিশু, পুলিৎজার এবার আমার!’

ডেক রেইলের ওপাশে ঝুলছে তার ক্যামেরার ডাবল স্ট্র্যাপ, রানার মাথার কাছে ‘স্ট্র্যাপটা নামিয়ে দিন!’ প্রায় ধমকে উঠল রানা।

একবার ক্যামেরা দেখল ব্রায়েস, কোঁচকানো মুখ দেখে মনে হলো জিনিসটার ক্ষতি হবে ভাবছে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ট্র্যাপ রানার হাতের কাছে নামিয়ে দিল।

খপ্ করে ওটা ধরল রানা, দু’হাতে স্ট্র্যাপ টানতে লাগল ব্রায়েস। আস্তে আস্তে কবাটের উপর দাঁড়াল রানা, সহজেই পাশের ডেকের রেইলিং টপকে উঠে এল। বলল, ‘জাহাজের চারপাশটা ভালভাবে চেনেন?’

‘হ্যাঁ,’ গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিল ব্রায়েস। ‘আমি চিনি না এমন কিছু এখানে নেই।’

পা বাড়াল রানা, ‘তা হলে চলুন।’

স্কাই ডেকের জানালায় ভিড় করেছে যাত্রীরা, চেয়ে আছে সুপার ট্যাঙ্কারটার দিকে। কারও কারও মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে, ওটা ওদের উদ্ধার করতে আসেনি!

‘আমার মনে হয় আমরা অনেক বেশি জোরে ছুটছি,’ বলল ক্যাভিস গর্ডন।

অনেকের মতই অন্তরে টের পেল অ্যানিটা, বিপদের দিকে ছুটে চলেছে ওরা। তার স্বামী জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চাইল। ফোঁপাতে শুরু করল অ্যানিটা, ‘আমাদের হানিমুনে এমন হতেই হবে কেন?’

এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর লিলি ল্যাংট্রি একটু সামলে নিয়েছে, নিজের দায়িত্ব পালন করতে চাইল -সে সুপার ট্যাঙ্কার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু এসব দ্বীপ সম্পর্কে বহুকিছু জানে। সবাইকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য জোর গলায় শুরু করল, 'শুনুন সবাই, আমরা ক্যারিবিয়ান সাগরের সেরা অঞ্চলে পৌঁছে গেছি। এরপর দেখবেন আপনারা দুনিয়ার সেরা সব সৈকত। এসব দ্বীপ গড়ে তুলেছে শ্বেতাঙ্গরা। খুশি মত শপিং করবেন। ক্যাসিনো, নাইট-ক্লাব, দারুণ সমস্ত রেস্টুরেন্ট বা হোটেল -ওই দ্বীপে কী নেই! ডোমিনিকায় আপনাদের রাত কাটবে দারুণ আনন্দে। ফ্রেঞ্চদের পছন্দের দ্বীপ ওটা, বলা যায়, সত্যিকারের ফ্রান্সে পৌঁছে যাবেন।'

'আমার মনে হয় আমরা ওই অভিশপ্ত দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না,' কাঁপা স্বরে বলল অ্যানিটা। স্বামীর কানে কানে ফিসফিস করল, 'মেয়েলোকটা আবার বলল ওয়াইটরা দ্বীপ গড়ে তুলেছে! স্রষ্টার উপরে মাতব্বরি না?'

আর কেউ কিছু বলবার আগেই বিরাট শ্বাস নিয়ে শুরু করল লিলি, 'আপনারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না, নিশ্চয়ই এমন ব্যবস্থা নেয়া হবে যে...'

ভিক্টর বুঝে গেছে লিলির মুখ ঠেকানো যায় না, রুবিকে নিয়ে খানিকটা দূরে চলে গেল, যাত্রীদের বলল, 'আমাদের এখনই দূরে সরে যেতে হবে।'

উইন্ট্রি ও সিয়েরা ন্যান্সিকে নিয়ে ভিক্টরের পিছনে পা বাড়াল।

'আমরা লাইফ জ্যাকেটগুলো দিয়ে প্যাডিং তৈরি করতে পারি,' বলল উইন্ট্রি।

'যে-কোনও ধরনের কাঁচ থেকে দূরে থাকতে হবে,' বলল রুবি।

লিলি বলে চলেছে, ‘তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কারণে বিরক্ত অ্যানিটা, বলল, ‘মহিলা ফ্রেঞ্চদের নিয়ে কী যেন বলছে, কিন্তু এদিকের সাগর আবিষ্কারই তো করল স্প্যানিশরা।’

‘খুব খারাপ কিছু বলেনি,’ তার স্বামী সান্ত্বনা দিল।

‘ইশ, কলাম্বাস যদি এখন থাকতেন,’ বলল অ্যানিটা। ‘উনি বুঝতেন ওই জাহাজে গুঁতো না দিয়ে কীভাবে সরে যাওয়া যায়।’

ব্যাণ্ডের লিডার রিটা ডেলটন ব্যক্তিগত চিন্তায় ডুবে গেছে। সে এ পেশায় আসবার পর থেকেই এজেন্টের উপর পুরোপুরি নির্ভর করেছে। যা জোরগার করেছে, তা থেকে বড় একটা অংশ তুলে দিয়েছে ওই এজেন্টের হাতে। ওই লোকই ওকে এই ক্রুজে তুলে দিয়েছে। অতএব পুরো দোষ ওই লোকটার। জাহাজে উঠে গান করার চিন্তা ওর নিজের মাথায় কখনও আসত না। ওই লোকটাই ওকে এখানে পাঠিয়েছে। এখন চিন্তা করছে ও, ওই লোক কী ধরনের এজেন্ট; যার পয়সা খেয়েছে তাকে এমন ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলে! ওর মরতে হতে পারে। ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। দশটা বছর প্রচণ্ড খেটেছে ও, ওর সুর-গান পছন্দ করেছে মানুষ, কিন্তু এই কী তার প্রতিদান? লোকটা ইচ্ছা করে ওকে এই বিপদে ফেলল কী করে? এই ছিল তার মনে? লোকটা ওর দেয়া কমিশনের টাকা দিয়ে অন্তত দুটো ছেলেকে কলেজ পার করিয়েছে। সবটা না হলেও বেশির ভাগ টাকা ওরই ছিল। এই তার প্রতিদান? কৃতজ্ঞতার নমুনা তা হলে এই? লোকটা ওকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে, ও মরলে তার কী? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রিটা, মনটা একটু শান্ত হলো, জোরে বলে উঠল, ‘আমার এজেন্টের চাকরি শেষ!’

অ্যানিটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমরা ছোট্ট একটা জীবন কাটালাম দু'জন, য্যাড্রো। মৃত্যুর পর আর কি দেখা হবে?'

য্যাড্রো পাশ থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল।

ক্রুজ শিপ থেকে অনেকটা সরে এসেছে হ্যালেক, সাফল্যের আনন্দে হাসি চলে আসছে তার সরু ঠোঁটে। পরিকল্পনা সফল হয়েছে তার। হ্যালেকের মনে হলো সোহানার উচিত ওকে বাহবা দেওয়া, প্রশংসা করা। সোহানার নিজেরই বোঝা উচিত, এখন আছে অনেক উপর পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে। স্ট্রাথার হ্যালেকের ক্ষমতা ওই সামান্য মাসুদ রানার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি।

লাভ অ্যাট সি'র দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল হ্যালেক, আবার বামে ফিরিয়ে সোহানাকে দেখল, ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল, 'লাভ অ্যাট সি'র ওই অটোপাইলট যখন দশ মিলিয়ন ডলারের সুপার ট্যাঙ্কারে গিয়ে গুঁতো দেবে, আমার কম্পিউটারের প্রোগ্রামটা তখন মোটেই পছন্দ হবে না সেভেন সি কোম্পানির।'

সামনে চেয়ে রইল সোহানা, পাল্টা চেঁচিয়ে বলল, 'আমার হাতে খুন হবে তুমি, হ্যালেক!'

ঠোঁট গোল করে হাসল হ্যালেক, 'সঙ্গে নিয়ে আসায় তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ -জাহাজে থাকলে খুনটা করতে কীভাবে?'

ওদিকে সুপার ট্যাঙ্কারের ক্রুরা খেপে উঠেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। নোঙর তুলতে গিয়ে চারপাশে চেঁচামেচি চলছে।

ব্রিজে ক্যাপ্টেন অলিভার জানতে চাইলেন, ‘আমাদের পাওয়ার ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?’

‘সাত-আট মিনিট,’ বলল এক ভারতীয় অফিসার। এটা বলল না, ফার্স্ট অফিসার ক্যাপ্টেনের নির্দেশের আগেই সবাইকে কাজে নামিয়ে দিয়েছে বলে সময় কম লাগছে।

‘আট মিনিটের মধ্যেই এই ট্যাঙ্কার বিস্ফোরিত হবে,’ বললেন ক্যাপ্টেন, ‘তাড়াতাড়ি করো! কুইক!’

ক্যাসিনোর ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে রানা ও ব্রায়েস। পুরো জাহাজটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সব আসবাবপত্র উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে আছে। এইট্রিয়ামের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা, এখানে-ওখানে আগুন। কয়েকটা দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রানার পিছু ধরার পর থেকে ব্রায়েসের মনে সন্দেহ আসছে। ‘আমরা কোথায় চলেছি?’ নার্ভাস স্বরে জানতে চাইল।

‘বো থ্রাস্টার,’ বলল রানা। ‘ওটা কোথায় জানেন না?’

একদিকের লেলিহান আগুনের দিকে হাত তাক করল ব্রায়েস, ‘জানি, ওদিকে। কিন্তু আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে পারবেন না।’

একসিটের দিকে তাকাল রানা, ওদিকটা আগুনে পুড়ছে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল কয়েকটা সিঁড়ি, নীচে চলে গেছে। ওখান দিয়েই জাহাজের দু'অংশে আসা-যাওয়া হয়। হতো। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। পিছন ফিরে চারদিকে চোখ বোলাল রানা, এমন কিছু দরকার যেটার সাহায্যে আগুন পার হওয়া যায়। কিছুই তো নেই! ফাঁকা ক্যাসিনোর টেবিল ও চেয়ারগুলো উল্টে

পড়ে আছে। ওর চোখ গিয়ে পড়ল পিছন দেয়ালের কাছে। ওখানে অনেকগুলো স্লট মেশিন, সেগুলোর পিছনে একটা পেডেস্টালে আটকে রাখা হয়েছে একটা হার্লি ডেভিডসন মোটর সাইকেল। টাঙ্কিতে তেল আছে কিনা, ভাবল রানা। জানার একটাই সহজ পথ। ব্রায়েসকে নিয়ে ওটার কাছে চলে গেল ও, স্লট মেশিনের বেঞ্চে উঠল দু''জন, মোটর সাইকেলটা প্যাডেস্টাল থেকে নামিয়ে আনল বেঞ্চে। নিজেরা এক এক করে নেমে এল মেঝেতে, তারপর মোটর সাইকেল নামাল।

দু'পায়ের মাঝখানে সিট রেখে কিক-স্টার্টারে জোর চাপ দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে হার্লি ডেভিডসনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পিছনের সিট দেখাল রানা, সোজা কথা, উঠে পড়ো বাছা।

ভীষণ চিন্তিত চেহারায় সিটে উঠল ব্রায়েস, গলায় পরে নিল ক্যামেরার স্ট্র্যাপ। একহাতে ক্যামেরা ধরল, হয়তো ভাবছে দারুণ কিছু ছবি পাবে। 'দু'হাতে আমাকে শক্ত করে ধরুন,' সাবধান করল রানা।

চট করে হাত থেকে ক্যামেরা ছেড়ে দিল ব্রায়েস, রানার কোমর জড়িয়ে ধরে নাক গুঁজল পিঠে।

চোদ্দ

হোঁচট খেয়ে ব্রিজে ঢুকল ব্র্যাডলি, বামহাতে ভাঙা হাতটা ধরে রেখেছে। ধরাধরি করে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল জেসন ও অ্যাডামস। জানালা দিয়ে চেয়ে রইল ব্র্যাডলি, সুপার ট্যাঙ্কার কাছিয়ে আসছে -এখন আর কষ্ট

করে বিনকিউলার চোখে তুলতে হয় না। অক্ষত হাতে রেডিও ট্রান্সমিটার তুলে নিল ব্রাডলি, সুইচ টিপে জাহাজের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বলে উঠল, ‘মিস্টার রানা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? যদি শুনে থাকেন, জাহাজের ইন্টারকমে কথা বলুন। আমাদের হাতে আর সময় নেই।’

ক্যাসিনোর স্লট মেশিনগুলোর পিছনে একটা ইন্টারকম দেখল রানা, একবার ভাবল মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ করে নামবে। কিন্তু সত্যিই তো হাতে সময় নেই! মনে মনে বলল, ‘এমুহূর্তে আলাপ চলে না।’

এক্সেলারেটর মুচড়ে ধরল ও, আগেই গিয়ার ফেলেছে, এবার ক্লাচ ছাড়তেই জিনিসটা পাখির মত উড়াল দিল -কয়েক সেকেণ্ডে ক্যাসিনো পেরিয়ে এল, এবার ঢুকবে জ্বলন্ত এইট্রিয়ামে। বারবার পিকআপ তুলছে রানা, সামান্য জায়গা পার হতে হবে ওকে। সামনে ঘন কালো ধোঁয়ার দেয়াল, এখানে-ওখানে কমলা আগুনের শিখা। কিন্তু ওর মনে নেই, ক্যাসিনো থেকে এইট্রিয়ামে নামতে গেলে ছয় ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। হঠাৎ চোখের সামনে সিড়ির ধাপ দেখল রানা। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে –ওদের নিয়ে আকাশে উড়াল দিল হার্লি ডেভিডসন। বাঁকা একটা পথে উড়ে চলেছে মোটর সাইকেল, আরও উপরে উঠছে! ছাদে গিয়ে গুঁতো দেবে ভেবে মাথা নিচু করে নিল রানা। ব্রায়েস তা করেনি, তার মাথা টোকা খেল বিরাট ঝাড়বাতির নীচের অংশে!

আগুনের ভিতর দিয়ে ছুটল হার্লি ডেভিডসন, ওটা যেন সার্কাসের কোনও বাঘ, জ্বলন্ত রিঙের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পুরো এইট্রিয়ামে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক সেকেণ্ড চারপাশে শুধু আগুনের শিখা দেখল রানা, চিড়বিড় করে হাতের রোমগুলো পুড়ে গেল। তারপর ধপ করে মেঝেতে

নামল মোটর সাইকেল, চারপাশে শুধু লেলিহান শিখা। পিছনের চাকা পিছলে সরে যেতে চাইল, আধ পাক ঘুরে গেল মোটর সাইকেল । কিন্তু এক পায়ের ঠেকা দিয়ে যন্ত্রটা সামলে নিল রানা, চারপাশে শুধু কমলা আগুন! খানিক দূরে সরু সিঁড়ি, মোটর সাইকেল নিয়ে ওটার দিকে ছুটল রানা।

'জ্বলে গেলাম!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ব্রায়েস, দু'হাতে কাপড়ে ধরে যাওয়া আগুনের শিখাগুলো নেভাতে চাইল।

'সব নিভে যাবে!' পাল্টা চেঁচিয়ে উঠল রানা। সিঁড়ির দিকে এগোনোর পথে পাশের একটা দোকানে ঢুঁ দিল, পুরু কাঁচ মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টুকরো হলো। ভাঙা অংশটা পেরিয়ে আবারও সিড়ির দিকে ছুটল মোটর সাইকেল।

রানা ভেবেছে সিঁড়ির সামনে প্ল্যাটফর্ম আছে, ওখানে থামবে, কিন্তু বাস্তবে প্ল্যাটফর্ম নেই! সিড়ি বেয়ে হড়হড় করে নেমে গেল মোটর সাইকেল, পরের ল্যাণ্ডিঙে গিয়ে আছড়ে পড়ল। সাগরের পানি ওখানে উঠে এসেছে। মোটর সাইকেল নিয়ে নামবার পথেই সিট ছেড়েছে রানা, ধড়াস করে গিয়ে পড়ল কোমর পানিতে। পাঁচ সেকেণ্ডে নিজেকে সামলে নিল, একটানে পানির ভিতর থেকে টেনে ব্রায়েসকে দাঁড় করিয়ে দিল। গুরুতর আহত হয়নি কেউ। মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের কাপড়চোপড় দেখছে ব্রায়েস, ওগুলো থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে!

'বো থ্রাস্টার কোনদিকে?' বলল রানা।

'শুনেছি ওদিকে,' বলল ব্রায়েস, নীচের সিঁড়ি দেখাল। 'যাইনি কখনও। তবে ওদিকেই হবে। আমি আপনার সঙ্গে আছি, চিন্তা করবেন না!'

‘হয়েছে!’ ল্যাণ্ডিঙের বুক সমান উপরে একটা ইন্টারকম দেখে রিসিভারটা নিল রানা, বাটন টিপল। ‘ব্র্যাডলি, আমি রানা, আমরা বো থ্রাস্টারের দিকে যেতে চাই।’

ব্রিজের জানালা দিয়ে দেখছে ব্র্যাডলি, সুপার ট্যাঙ্কার আর বড়জোর দুই মাইল দূরে! আপনি ওখানে বন্যা বাধিয়ে দিয়েছেন, অভিযোগের সুরে বলল ব্র্যাডলি। ‘ওখানে যাওয়ার আর পথ নেই।’

‘আমি ওখানে পৌঁছব,’ দৃঢ় স্বরে বলল রানা। ‘আপনি বলতে থাকুন কীভাবে যেতে হবে।’

‘বো থ্রাস্টার বড় দুটো চাকার মত, ওগুলো ছোট একটা শাফটের শেষে থাকে,’ বলল ব্র্যাডলি। একহাতে কপাল থেকে ঘাম মুছল, আহত হাত থেকে রক্ত ঝরছে। দাঁতে দাঁত পিষল। প্রচণ্ড ব্যথা! তবুও বলল ‘রিলজ্ পাম্প-রুমের নীচে ওই শাফট। ওখানে গেলে দেখবেন..’

ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে উইন্ড-জেট, খুশিতে গুনগুন করে গান গাইছে, হ্যালেক। সবকিছু ওর পরিকল্পনা মত চলেছে, কোথাও কোনও ভুল হয়নি! সঙ্গে রয়েছে ব্যাগ ভরা হীরা। আর পাশে বসা এই সুন্দরী। মিশন সাকসেসফুল!

ওর প্রাক্তন মালিকদের ওই ক্রুজ শিপ, ওটা একটু পর অয়েল ট্যাঙ্কারে গিয়ে বিধ্বস্ত হবে। শুধু তা-ই নয়, ওই মাসুদ রানা নামের গাড়লটাকে হারিয়ে দিয়েছে সে, তার প্রেমিকাকে এক তুড়িতে কেড়ে নিয়েছে! সেভেন সি-র উপরমহলের সবাই চিন্তা করবে তার সঙ্গে লাগতে যাওয়া কত বড় ভুল হয়েছে। তাদের একহাত দেখিয়ে দিচ্ছে সে! কোনদিন এই চপেটাঘাতের

কথা ভুলতে পারবে না লোকগুলো। সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সে। পুরোটা খেলা তার নিজের! এ খেলার আইন ইচ্ছা মত তৈরি করেছে সে, তাই ভাল লাগছে!

ত্যক্ত-বিরক্ত সোহানা মাঝে মাঝে লোকটাকে দেখছে। অবাক হয়ে ভাবছে, এ তো সত্যিই উন্মাদ, নইলে এতগুলো মানুষ খুন হবে জেনেও এমন আত্মতৃপ্তি আসে কোত্থেকে! জাহাজটা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, হয়তো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে রানার... আর ভাবতে চাইল না সোহানা। ফুঁসছে ও ভিতর ভিতর, প্রথম সুযোগেই কাবু করতে হবে লোকটাকে।

কিন্তু লোকটা অসম্ভব চতুর, ওকে কোনও রকম সুযোগ দিচ্ছে না। কী করে মুক্তি পাবে সেটা এখনও ভেবে বের করা গেল না। একটা ব্যাপার বুঝে গেছে, লোকটা ওকে সাধারণ কোনও মেয়ে ভেবেছে। সেটা হয়তো বিরাট সুবিধা হয়ে দেখা দেবে। ও যখন নিজের চাল দেবে, লোকটা থাকবে অপ্রস্তুত, বিস্ময় কাটবার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

কিন্তু আগে মাথায় কিছু আসতে তো হবে!

যাই হোক, আগের কাজ আগে। কব্জির দড়ি ঢিলা করবার জন্য কাজে লেগে পড়ল সোহানা। নীচের দিকে চোখ পড়তে দুই জেট-স্কির মাঝখানের অংশে একটা ওয়ার্নিং লেবেল দেখল। নাচতে নাচতে চলেছে জেট-স্কি, তারই ফাঁকে লেবেলটা পড়ল সোহানা। লিখেছে: সাবধান! চলন্ত অবস্থায় দুটো জেট-স্কি আলাদা করবেন না!

সোহানা ভাবল, তা হলে এ নিয়ে একটু চিন্তা করা যায়!

মস্তবড় দ্বীপটার সামান্য আগে আরেকটা ছোট দ্বীপ, ওটার দিকে চলেছে হ্যালেক, চওড়া হাসি হাসছে। ফুল স্পিডে উইণ্ড-জেট চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

কব্জি থেকে পাম কম্পিউটারের স্ট্র্যাপ ছাড়িয়ে নিল, কম্পিউটারটা ফেলে দিল নীল সাগরে। সোহানার চোখে প্রেমের দৃষ্টি ফেলে বলল, 'ডার্লিং, আমরা পৌঁছে গেছি!'

কোমর পানির মধ্য দিয়ে করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছে রানা, একবার পিছনে চেয়ে ইশারা করল। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে ব্রায়েস। আরেকটু এগোতেই করিডোরের পানির গভীরতা আরও বাড়ল বুক সমান পানি ভেঙে এগিয়ে চলল দু'জন। এখন আর হাঁটতে হবে না, সাঁতার কেটে এগোনো যাবে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না ব্রায়েসের। কিন্তু সে কী-ই বা করবে। পিছনে আছে গনগনে আগুন, সামনে গভীর পানি! ওর সামনে মাত্র দুটো পথ -শিক-কাবাব হওয়া, অথবা পানিতে ডুবে মরা। সাঁতরাতে শুরু করল ব্রায়েস। দু'মিনিট সাঁতরে মন খানিকটা শান্ত হলো, কিন্তু হঠাৎ পাশ দিয়ে বিরাট দুটো মাছ বেরিয়ে যেতে চমকে গেল। মনে মনে কপালের দোষ দিল, এরপর হয়তো হাঙরের সামনে পড়বে! তার চেয়েও খারাপ খবর আছে, সামনে থমকে গেছেন মিস্টার রানা, একটা সাইন দেখালেন। ওটার তীর নীচতলার দিকে তাক করা! এমনিতেই পানি ওদের গলা ছুঁই-ছুঁই! জাহাজের আরও নীচের দিকে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ব্রায়েস, মরলে সে এখানেই মরবে।

এই ভোগান্তির জন্য রানাকে সামান্যতম দুষছে না ফটোগ্রাফ শিকারি। রানা ওকে বোট থেকে সাগরে পড়ে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, সে জন্য নয়; মানুষটার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে গেছে তার মনে। এ লোক নিজের

জন্য কিছু করছে না, ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পা বাড়িয়েছে অনেকগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

হাতের ইশারা করে নীচের দিক দেখাল রানা, পরক্ষণে বড় করে দম নিয়ে তলিয়ে গেল। লোকটা ডুবে থাকা সিড়ির নীচের দিকে গেছে, এক পলক ওদিকে তাকিয়ে থাকল ব্রায়েস, নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'সবকটা পাগল হয়ে গেছে! কিন্তু একা মরতেও তো ভয় লাগে!' বিরাট একটা শ্বাস নিল ব্রায়েস, রওনা হলো রানার পিছনে।

সিঁড়ির নীচ থেকে শুরু করে করিডোরের ছাদ পর্যন্ত পানিতে ভরা! তার মাঝে রয়েছে ভুতুড়ে আলো। জাহাজের লাইটিং সিস্টেম এখনও টিকে আছে। করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছে ব্রায়েস, সামনে মিস্টার রানা নেই! বুক শুকিয়ে গেল তার। পরমুহুর্তে দেখতে পেল, খানিকটা দূরের একটা ঘর ছেড়ে করিডোরে বেরিয়ে এল রানা, ব্রায়েসের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। হাত তুলে আরেকটু দূরের একটা হ্যাচওয়ে দেখাল।

রানার পিছু নিল ব্রায়েস, চার হাত-পা নেড়ে পৌঁছে গেল হ্যাচওয়ের সামনে। ভিতরে বড় একটা ঘর। পানি ওখানে প্রায় ছাদ পর্যন্ত, কিন্তু উপরের একফুট জায়গায় বাতাস আটকে রয়েছে। ছাদের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল রানা ও ব্রায়েস, বড় করে শ্বাস নিল কয়েকবার। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখন কোথায়?'

'জানি না,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল ব্রায়েস।

দূরে, পানির উপর থেকে কোনও ইন্টারকমে কথা বলে চলেছে ব্র্যাডলি, আবছা ভাবে শোনা যায়। ডুবে যাওয়া ঘরে কণ্ঠটা কোনও কার্টুনের চরিত্রের কণ্ঠস্বরের মত শোনাল।

‘আপনি এক এক করে হুইল দুটো ঘোরাবেন,’ জানিয়ে চলেছে ব্র্যাডলি। একই সঙ্গে যদি দুটো ঘোরান, একটা আরেকটার কাজ কাটাকাটি করে দেবে। মনে রাখবেন, প্রথমে ঘোরাতে হবে স্টারবোর্ড সাইডের চাকা।’

চারপাশ দেখল ব্রায়েস। ‘কোন দিক বলল?’

‘আমরা আছি জাহাজের সামনের দিকে,’ ডানদিক দেখিয়ে বলল রানা, এটা স্টারবোর্ড। ‘আসুন।’

ডুব দিল রানা, পিছনে চলল ব্রায়েস। চারপাশে বাতিগুলো জ্বলছে, নিজেকে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছ মনে হলো রানার। ঘর থেকে বেরিয়ে পঁচিশ ফুট যেতেই রিলজ্ পাম্প রুম, ওটার নীচে মাঝারি একটা শাফট পেল রানা। ওই পথে খানিকটা এগোলে পাওয়া যাবে দুই বো থ্রাস্টার, জাহাজের নাকের কাছে। স্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছে ফুসফুস, চারপাশ দেখল রানা। ঘরের একটা জায়গায় পানির উচ্চতা মাত্র কাঁধ পর্যন্ত। হাতের ইশারায় সঙ্গীকে ডেকে ওখানে চলে গেল রানা। ওর পিছু নিল ব্রায়েস। ওখানে দাঁড়িয়ে বার কয়েক শ্বাস নিল দু’জন। দুজনেই জানে, এখন প্রতিটা মুহূর্ত খুব জরুরি।

স্কাই-ডেকের জানালার পাশে দাঁড়িয়েছে ভিক্টর ও রুবি, দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরেছে, পরনে প্রায় কিছুই নেই। সুপার ট্যাঙ্কারের বিশাল দেহ এগিয়ে আসছে, লাভ অ্যাট সি’র জানালার সামনে আকাশ ঢেকে ফেলছে!

‘মনে পড়ে, রুবি,’ বলল ভিক্টর, ‘আমরা যখন লাভ অ্যাট সি প্রথম দেখলাম, কত বড় ভেবেছিলাম? কিন্তু ওই অয়েল ট্যাঙ্কারটা এটার চেয়ে অনেক-অনেক বড়!’

‘আমার খুব ভয় লাগছে, ভিক্টর,’ স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল রুবি।

‘চিন্তা কোরো না তো,’ বলল ভিক্টর। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ‘মনে রেখো, আমি তোমার পাশেই আছি, কাজেই খামোকা চিন্তা করবে না।’

‘ওহ ভিক্টর, আমাকে মাফ করে দিয়ো, তোমার সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি।’

‘কীসের দুর্ব্যবহার, হানি?’ ‘আমি অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি, আমি তো জানি!’

‘তা বোধহয় খানিকটা...’ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল ভিক্টর, ভ্রূ কুঁচকে গেল। ‘তুমি আমাকে প্যান্ট খুলতে বাধ্য করেছিলে।’

‘আমরা তখন ধোঁয়ায় মারা পড়ছি,’ বোঝাতে চাইল রুবি।

‘তারপরও, আমি প্যান্ট খুলতে চাইনি,’ তর্ক করবার মেজাজ ফিরে পেয়েছে ভিক্টর।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল রুবি। সুপার ট্যাঙ্কারের বিশাল ধাতব দেয়াল আরও উঁচু হয়ে উঠছে। বাচ্চা মেয়ের মত শোনাল রুবির কণ্ঠ, ‘আমি সত্যিই দুঃখিত, ভিক্টর।’

স্ত্রীর একটা হাত নিজের মস্ত হাতে পুরে নিল ভিক্টর, গালে আলতো করে চুমু দিল।

রানা ও ব্রায়েস সাঁতরে স্টারবোর্ডের বো থ্রাস্টারের সামনে চলে গেল, ঘুরল না ওটা। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ওরা। হাতের ইশারা করল রানা, ব্রায়েসকে পোর্টসাইডের চাকাটা দেখাল। চলে গেল ওরা ওটার সামনে। ঘোরাতে শুরু করল।

তিন মিনিটে তৃতীয়বারের মত অক্সিজেন নিয়ে ফিরল ওরা। এরইমধ্যে কয়েকবার হুইল ঘুরিয়েছে। পানির নীচে বলেই ওটার উপর শক্তি খাটানো কঠিন। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা প্রতিবার ঘোরাতে গিয়ে। দু'জনের মিলিত চেষ্টায় ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঘুরছে হুইল। ব্রায়েস হাঁপিয়ে গেলে থামছে রানাও, নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে বুক ভরে বাতাস নিয়ে আবার আসছে। রানা জানে, ও একা হুইল ঘোরাতে পারবে না।

একমিনিট পর ঘরের মাঝখানে ফিরে এল দু'জন, পানির নীচ থেকে মাথা তুলে দম নিল । হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ব্রায়েস, 'কাজ হবে মনে করেন?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা।

'জাহাজ ঘুরছে কী না কে জানে,' বাম কপালে জোরে চাপড় দিল ব্রায়েস, ডান কানের ভিতর থেকে কয়েক মিলি লিটার নোংরা পানি বেরিয়ে এল। মুখ থমথম করছে। 'একটা কিছু তো বলবেন। তা হলে কি আমরা মাছের খাবারই হবো?' 'ফিরে যাওয়া যাক,' বলল রানা।

একবার চারপাশ দেখল ব্রায়েস, সবখানে পানি। বদ্ধ ছাদের অক্সিজেন শেষ হলে মরতে হবে। কাঁধ ঝাঁকাল, চলুন। আমি কখনও ভাবিনি এভাবে লোহার কফিনে ঢুকে মরব।'

দু'জন একইসঙ্গে ডুব দিল।

ব্রিজে অ্যাডামস উত্তেজিত, বারবার কম্পাসে টোকা দিয়ে চলেছে। ওটা আরও দ্রুত নড়ছে না কেন! কয়েক সেকেণ্ড পর আরও নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা দিল, 'ওরা আমাদের ঘুরিয়ে নেবে।'

চেয়ারে শিথিল হয়ে পড়ে আছে ব্র্যাডলি, ক্লান্ত। ভাঙা হাতের ব্যথায় পাগল হয়ে উঠেছে, কিন্তু জানালা দিয়ে চেয়ে তিক্ত হাসল, 'বড় দেরি হয়ে গেছে, অ্যাডামস।'

'ট্যাঙ্কারও তো নড়ছে!' জানাল অ্যাডামস, এখনও বিশ্বাস করতে চাইছে, সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব।

ট্যাঙ্কার সত্যি নড়ছে, নোঙরগুলো পানির নীচ থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। প্রাউ'র সঙ্গে আটকে রাখা শেকলগুলো নড়ছে। আস্তে করে মাথা নাড়ল ব্র্যাডলি। ট্রেনিং পাওয়া নাবিক সে, জানে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর কিছুই করার নেই।

ট্যাঙ্কারের ব্রিজে সবাই ব্যস্ত, জানালা দিয়ে ক্রুজ শিপের দিকে চেয়ে আছেন ক্যাপ্টেন অলিভার। তার জাহাজের নোঙর তোলা হয়ে গেছে বলে খুশি, স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনগুলো সামনে টানছে, সেইসঙ্গে পোর্টের ইঞ্জিনগুলো চলছে রিভার্সে। জাহাজ ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। নেটিভ ফার্স্ট অফিসার নোঙর আগেই তুলবার নির্দেশ দিয়েছিল বলে ভাল লাগা ও খারাপ লাগার মাঝখানে পড়েছেন ক্যাপ্টেন অলিভার। যা কিছু করবার তার সবই করেছে ক্রুরা, এখন আর নতুন করে কোনও নির্দেশ দেয়ার কিছু নেই। বুঝে গেছেন তিনি, এবার সবাইকে নিয়ে সরে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় পালাবেন? আসলে মরতে হবে সবাইকে।

ট্যাঙ্কার অতি ধীরে ঘুরছে, যেন এক শীত ঘুমিয়ে বসন্তে জেগে ওঠা বিশাল এক ভালুক। এ জাহাজ একবার রওনা হলে আবার থামাতেও সময় লাগে। কিন্তু থামার কথা পরে, এখন দরকার গতি পাওয়া। এদিকে দ্রুত

এগিয়ে আসছে নচ্ছার ওই ক্রুজ শিপ। একেবারে শেষ সময়ে এসে ঘুরতে চাইছে! ওটার ক্যাপ্টেন হয়তো ভেবেছে সরে যেতে পারবে! আসলে তা সম্ভব নয়! তার উচিত ছিল সেঁটে ঘুম না দিয়ে সাগরের চারদিকে চোখ রাখা। নিশ্চয়ই ওই ব্যাটাও নেটিভ।

পাগল পাগল লাগছে অলিভারের।

নোয়া'জ বোট আরও খানিকটা সরল। অগ্রসরমান বিরাট জাহাজ এখনও ওদের দিকে ছুটে আসছে! ওটা আরেকটু বাঁক নিল! হয়তো গুঁতো দেবে না ট্যাঙ্কারের পেটে, কিন্তু পুরোটা এড়াতেও পারবে না। তার মানেই বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে দুই জাহাজ! সবাই মরবে! তবু যদি বাঁচা যায়? ট্রান্সমিটারের সামনে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন অলিভার, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বললেন: 'অল ক্রু, অ্যাটেনশন! আমরা নোয়া'জ বোট ত্যাগ করছি, সবাই সব কাজ ফেলে লাইফ-বোট সাগরে নামাও!'

'স্যর, জাহাজটা হয়তো এখনও বাঁচানো যায়,' বলল ফার্স্ট অফিসার নাহিআন।

'না, সম্ভব নয়,' জোর দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, ভূলে বন্ধ করেননি মাইক্রোফোন, ফলে ট্যাঙ্কারের সবাই শুনতে পাচ্ছে ব্রিজের কথাবার্তা। 'আমাদের এক্ষুনি সরে যেতে হবে।'

'চেষ্টা করতে দোষ কী, স্যর?' বলল সেকেণ্ড অফিসার ফ্রেড।

'তোমরা আমার চেয়ে বেশি বোঝো?' চোখ গরম করে দুই অফিসারকে দেখলেন অলিভার। তারাও চেয়ে রইল তাঁর চোখের দিকে। শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু নেটিভটা পর্যন্ত চোখ নামিয়ে নিল না! আরও রেগে গেলেন অলিভার।

‘আপনি ভুল করছেন, স্যর,’ বলল নাহিআন। ‘জাহাজে বিস্ফোরণ হলে, চাইলেও আমরা পালাতে পারব না।’

ক্যাপ্টেনের চোখ পড়ল মাইক্রোফোনের, অন বাটনে, খেপে উঠলেন, কর্কশ স্বরে ওটাতে বলে উঠলেন, ‘তোমরা যারা আমার সঙ্গে যেতে চাও, এক্ষুনি লাইফ-বোট সাগরে নামাও! আমাদের হাতে সময় নেই! যেসব অফিসার বিদ্রোহ করেছে, তাদের সঙ্গে যারা থাকবে, তারা বেঁচে থাকলে সময়মত তাদের শাস্তি দেয়া হবে! কোথাও চাকরি পাবে না! অ্যাটেনশন, আমরা জাহাজ ত্যাগ করছি!’ মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ঠিক তখনই দু’জন অফিসার দ্রুত পায়ে ব্রিজে ঢুকল। তাদের একজন বলল, ‘ক্যাপ্টেন, আমরা আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। সবাই আমরা জাহাজ ত্যাগ করব?’

‘হ্যাঁ!’ ধমকে উঠলেন অলিভার। এখানে কী জন্য এলে, লাইফ-বোট নামাও গিয়ে!’

দুই অফিসার পরস্পরকে দেখল, কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল। ফার্স্ট অফিসারের দিকে তাকাল। একজন বলে উঠল, ‘আপনারা যাবেন না, স্যর?’

‘আমি না,’ বলল নাহিআন। ঠোঁটে তিক্ত হাসি।

‘আমিও না, স্যর,’ বলল সেকেণ্ড অফিসার ফ্রেড। ‘যদি মরতেই হয়, নিজের জাহাজে মরব। আমাদের ক্যাপ্টেন বোট ছেড়ে চলে যেতে চান, তো যেতে পারেন তিনি!’

‘তোমরা মস্ত ভুল করলে,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন অলিভার। ‘বাঁচতে চাইলে যা বলছি তাই করো!’

‘স্যর, আপনি বরং নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করুন,’ বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলল ফ্রেড। ‘আমরা যা দিয়ে রোজগার করি, সেটা বাঁচানোর চেষ্টা করি।’

‘ভাল, ভাল! তা তুমিও নেটিভদের সঙ্গে মিশে পচে গেলে?’ কাঠখোট্টা হাসি হাসল ক্যাপ্টেন।

‘আমরা হয়তো দ্বীপে গিয়ে উঠব, কিন্তু তোমরা মরবে নির্ঘাত।’

‘যান, স্যর, আপনি গিয়ে দেখুন প্রাণটা বাঁচাতে পারেন কি না’ বলল ডেনমার্কের এক অফিসার।

লাল হয়ে গেল ক্যাপ্টেন অলিভারের মুখ, ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। ধারণা করলেন, নিশ্চয়ই বেশিরভাগ ক্রু তাঁর সঙ্গে থাকবে।

স্কাই-ডেকে কেউ কিছু বলছে না, শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় ফেঁপানোর আওয়াজ। নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে অনেকে। জানালার কাছ থেকে সরে গেছে সবাই, ছিটকে গিয়ে কাঁচের গায়ে পড়তে চায় না। মেনে নিয়েছে, মরতে হবে তাদের। বাবা-মার মাঝখানে বসেছে ন্যান্সি। ওরা সবাই পরস্পরের হাত ধরে রেখেছে। সবাইকে দেখল ন্যান্সি, আস্তে করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। বাবাকে বলল, ‘মা খুব ভয় পেয়েছে। তুমি?’

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল উইন্ট্রি।

‘অবাক হওয়ার কিছু নেই,’ বলল ন্যান্সি, বাবার বামহাত শক্ত করে ধরল। আমিও ভয় পেয়েছি।’

‘আমরা সবাই ঈশ্বরের হাতের পুতুল,’ বিড়বিড় করল সিয়েরা। ‘তাঁর ইচ্ছে পাল্টানো যায় না।’

‘আমেন,’ বলল উইন্ট্রি।

‘এই লাল পোশাকটা পরেছি বলে তোমরা কষ্ট পেয়েছ,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যান্সি।

নোংরা কাপড়টা দেখল তিনজন। মৃদু হেসে ফেলল ন্যান্সির বাবা-মা। দু’জনই জড়িয়ে ধরল অবোলা মেয়েকে।

আর কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর লাভ অ্যাট সির গলুই ধাক্কা দেবে তেলবাহী সুপার ট্যাঙ্কারের গায়ে!

পনেরো

স্কাই-ডেকের যাত্রীরা টের পেয়েছে সামান্য হলেও ঘুরে গেছে লাভ অ্যাট সি-র গতিপথ। কীভাবে কী হলো জানে না তারা। অসহায় চোখে ট্যাঙ্কারের দিকে চেয়ে আছে, মুখে কোনও শব্দ নেই। আশা করছে, তাদের জাহাজ বিধ্বস্ত হবে না, সুপার ট্যাঙ্কারে ঘষা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আরও সামনে দেখা গেল গুয়াডালুপের বন্দর। থমথমে পরিবেশে কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর সবাই টের পেল, সত্যিই ওদের জাহাজ ট্যাঙ্কারের উপর হামলে পড়বে। কেউ একটা কথাও বলল না।

হঠাৎ ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো। লাভ অ্যাট সি’র প্রাউ অয়েল ট্যাঙ্কারের গায়ে ধাক্কা দিয়েছে। যাত্রীরা যার যার জায়গা থেকে ছিটকে গিয়ে নানাদিকে পড়ল, চারপাশে হুলস্থূল শুরু হলো -কেউ কেউ

প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরল কেউ কেউ। নীচের ডেক দুলতে লাগল, বারবার লাফিয়ে উঠল!

লাভ অ্যাট সি'র নাকটা জোরেশোরে ঘষা খেল ট্যাঙ্কারের কাঁধে, আবারও প্রচণ্ড ধাতব আওয়াজ শুরু হলো, মনে হলো কেয়ামত শুরু হয়েছে। জানালায় দেখা গেল আগুনের ফুলকি আকাশে লাফিয়ে উঠছে! নতুন ষাঁড় যেমন পালের সবচেয়ে বড় ষাঁড়টিকে গুঁতো দিয়ে আন্দাজ করতে চায় নিজের ক্ষমতা কতটা, ট্যাঙ্কারে সেভাবে গুঁতো দিল লাভ অ্যাট সি। দ্বিগুণ লম্বা ট্যাঙ্কার নড়ল না, তবে একটু দুলে উঠল। ওটার ডানপাশে নাক গুজল ক্রুজ শিপ, সঙ্গে সঙ্গে গলুইটা কাগজের মত মুচড়ে গেল।

ট্যাঙ্কারের গলার কাছে ঘষা দিল লাভ অ্যাট সি, দু' জাহাজের রং উঠতে লাগল, সেই সঙ্গে ঘর্ষণের প্রচণ্ড কর্কশ আওয়াজ উঠল। কয়েকটা মিনিট, তারপর দুই জাহাজ পাশাপশি হলো -ট্যাঙ্কারের ডানপাশ থেকে বেরিয়ে এল লাভ অ্যাট সি, দ্রুত গতিতে ছুটল বন্দরের দিকে।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে জাহাজটার দিকে চেয়ে রইল ফার্স্ট অফিসার নাহিআন। এই তো একটু আগে লাভ অ্যাট সি'র ব্রিজে অফিসারদের দেখেছে। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল! লোক গুলো হাঁ করে কী করছিল কে জানে! মস্ত শ্বাস টানল নাহিআন। হয়তো আপাতত বাঁচা গেছে! নিজের জাহাজের ডেক দেখল, ট্যাঙ্কারের আর কোনও ক্ষতি হলো কি না কে জানে! এসব জাহাজে কাউকে তোলার আগে তার কাছ থেকে ম্যাচ-লাইটার চেয়ে নেয়া হয়, পরতে দেয়া হয় নরম সোলের জুতো। তেল তুলবার আগেই সমস্ত মেইনটেন্যান্সের কাজ করিয়ে নেয়া হয়। তেলের হোল্ডগুলো আস্ত না থাকলে আগুন ধরবে, গোটা জাহাজ বিস্ফোরিত হবে। এখনও অর্ধেক হোল্ড তেলে

ভরা! ওগুলোর ফিউম এখনও এতটা ঘন যে জাহাজের আশপাশে ভালভাবে শ্বাস নেয়া যায় না। অনেকে বলে চকচকে ধাতুর উপর সূর্যের আলো পড়লেও ওই ফিউম জ্বলে ওঠে, পুরো জাহাজ বিস্ফোরিত হয়। ওদের জাহাজের হোল্ডগুলোতে ফাটল তৈরি হলে ক্যারিবিয়ানদের এসব স্বর্গগুলো স্রেফ নরক হয়ে উঠবে! ইকো সিস্টেম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে!

এবার বিরাট বিপদটা দেখল নাহিআন। ট্যাঙ্কারের পাশে কয়েকটা পাইপ ফেটে গেছে। ওখান থেকে তেলের ফিউম বেরিয়ে আসছে। খানিকটা দূরে স্টিলের সঙ্গে স্টিলের ঘষা লেগে টকটকে লাল হয়ে আছে জাহাজের প্লেট - যেন কামারের চুলো থেকে বের করা লোহার টুকরো। যে-কোনও সময়ে ওসব আগুনের স্পর্শ পাবে তেলের ফিউম।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসেছে সেকেণ্ড অফিসার ফ্রেড, ফার্স্ট অফিসারকে ওদিকটায় চেয়ে থাকতে দেখে তাকাল। চমকে উঠল। 'স্যর, আগুন!'

'এসো!' দ্রুতপায়ে ব্রিজে ঢুকল নাহিআন, নির্দিষ্ট প্যানেলের সামনে থেমে ফায়ার বাটন টিপল। সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটেড ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেম চালু হলো। বেজে উঠল অ্যালার্ম। হোল্ডের উপরের অংশ থেকে লিকুইড নাইট্রোজেন তেলের উপর বর্ষণ শুরু হলো।

মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলে বলল সেকেণ্ড অফিসার, 'ডেকের আগুন নিভাতে হবে, তোমরা যারা এখনও রয়ে গেছ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে এসো।'

কয়েকজন অফিসারের নেতৃত্বে একদল নাবিক ডেকে বেরিয়ে এসেছে, হাতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার! আগুনগুলোর দিকে ছুটল সবাই।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল দুই অফিসার, চেয়ে রইল ক্রুদের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলল ওরা। তার আগেই আরেকদল ক্রু হোল্ডের তেলের সঙ্গে পাইপগুলোর সংযোগ স্টপকর্কের মাধ্যমে বন্ধ করেছে।

পাঁচ মিনিট পার হতেই তারা ফার্স্ট অফিসারের সামনে হাজির হলো। হাসছে সবাই, অনেকের চেহারায় গর্ব। ওরা কেউ পালিয়ে যায়নি, মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছে। এখন আশা করছে ওদের নেতা প্রশংসা করে কিছু বলবে।

'ওয়েলডান, অল অভ ইউ!' মৃদু হাসল নাহিআন। 'রিয়েলি সুপার্ব জব!'

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেকেণ্ড অফিসার ফ্রেড, কান পর্যন্ত হাসছে। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ পড়ল বন্দরের দিকে। বড় একটা লাইফবোট ওদিকে ছুটে চলেছে!

'তালিয়া-তালিয়া সবাই, আমাদের প্রিয় ক্যাপ্টেন চারজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন!' হাত তুলে লাইফবোট দেখাল ফ্রেড।

'লোকটার কী শাস্তি হয় দেখব আমরা,' বলল এক নাবিক।

তার এক সঙ্গী বলে উঠল, 'নাহিআন স্যর রাজি থাকলে সবাই মিলে আমরা অলিভারকে পিটিয়ে তক্তা করব!'

'তার চ্যালাগুলোকেও,' সায় দিল আরেকজন।

ফার্স্ট অফিসারের দিকে চাইল ফ্রেড, 'স্যর, আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাব না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল নাহিআন। ‘এ-কথা সাউল কোম্পানির চেয়ারম্যান মাসুদ রানা স্যারের কানে পৌঁছে যাবে। ধরে নাও ক্যাপ্টেন অলিভারের চাকরি নেই। অন্য কোনও কোম্পানিও নেবে না ওকে।’

আরেকবার দম নেয়ার জন্য ভেসে উঠল রানা ও ব্রায়েস। ঠিক তখনই সুপার ট্যাঙ্কারকে গুঁতো দিল লাভ অ্যাট সি। ওরা দাঁড়িয়েছে বো থ্রাস্টারের কাছে, বুক পানিতে। দু’দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু’জন, উপরের কম্পার্টমেন্টগুলো থেকে পানি এসে পুরো ঘর ডুবিয়ে দিল। ওরা যেন ছোট্ট পাত্রে রাখা দুটো গোল্ড ফিশ, আচ্ছামত ঝাঁকিয়ে চলেছে কোনও বাচ্চা। ধাতব দেয়াল, মেঝে বা ছাদে জোরে আছড়ে পড়ছে না শুধু পানির কারণে। ভয়ঙ্কর দুলুনি শুরু হলো পানিতে! মাত্র বিশ সেকেণ্ড, তারপর জাহাজ আবারও নিজেকে সোজা করে নিল -ঝাঁকি খেয়ে কম্পার্টমেন্টের বেশিরভাগ পানি বেরিয়ে গেল। ধপ্ করে মেঝেতে পড়ল রানা ও ব্রায়েস, অবাক চোখে চারপাশ দেখল। ওরা রয়েছে আড়াই ইঞ্চি পানিতে! বড় করে শ্বাস নিল দু'জন, জানে আবারও ওদের ডুবিয়ে দেবে পানি। ঠিক তা-ই হলো, তবে এবার বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে ক্ষান্ত হলো।

ওরা যেখানে আছে তার চেয়ে কয়েক তলা উপরে, সামনের দিকে আরও মুচড়ে গেছে জাহাজের প্রাউ -সাগর সমতলের অনেক উপরে। কোনও সমস্যা হবে না জাহাজ ভাসতে, তবে রানা বা ব্রায়েস সেটা জানে না।

ঘাড় কাত করে কান পাতল ব্রায়েস, কয়েক সেকেণ্ড শুনল, ‘আরেহ! আমরা তো ডুবছি না!’

রানাও বুঝেছে। কাঁধ ঝাঁকাল

ততক্ষণে চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে ব্রায়েসের মুখে, ডানহাতে রানার পিঠ চাপড়ে দিল। ‘দারুণ লোক তো আপনি! আমরা জাহাজ ঘুরিয়ে দিয়েছি, ব্রাদার! সত্যিই পেরেছি।’

সন্দেহ কী, ভাবল রানা। ওরা পানির নীচে নেই, বা জ্বলন্ত তেল ওদের মাছভাজা করছে না! সেটা বলতেই মুখ খুলল, কিন্তু জাহাজের পাশের প্লেটিং দেখে চমকে গেল। দৃশ্যটা দেখেই খপ্ করে বন্ধ হয়ে গেল মুখ!

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পাশের দেয়ালটা গরম ডালপুরির মত ফুলে উঠছে! স্টিলের পুরু প্লেটিং মুহূর্তে ভেজা নিউজ-পেপারের মত নেতিয়ে গেল!

বুক পানিতে দাঁড়িয়ে দেখছে রানা, ওদের কম্পার্টমেন্ট ভিতরের দিকে ডেবে আসছে!

‘হায়, খোদা!’ বিকট এক চিৎকার ছাড়ল ব্রায়েস।

‘জলদি ডুব দিন!’ বলে উঠল রানা, একহাতে ব্রায়েসের ঘাড় ধরে ডুবে গেল। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে। কম্পার্টমেন্টের পিছন দেয়ালের কাছে গিয়ে ভেসে উঠল।

ওরা জানে না দুই জাহাজের প্রাউ পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। অবাক হয়ে দেখল একটা তীক্ষ্ণ ধাতব কী যেন ভিতরে ঢুকছে!

‘ওটা বিল!’ চোখ আকাশে তুলল ব্রায়েস। ‘ফ্লুকটাও আসছে!’

‘নোঙর!’ বিড়বিড় করল রানা।

সুপার ট্যাঙ্কারের প্রাউ থেকে নেমেছে ওই নোঙর, ক্রুজ শিপের দেহে এসে গেঁথেছে। কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে গেলে শার্টের হাতায় যেমন কাঁটা লাগে, সেইভাবে আটকে গেছে জাহাজের গায়ে। আট ফুট উঁচু বারো ফুট দীর্ঘ প্লেটিং পড়পড় করে ছিঁড়ছে! ক্রুজ শিপ ছুটছে দ্রুত, তবে নোঙর ওটাকে

আঁকড়ে ধরেছে। প্লেটিঙের রিভেটগুলো চড়চড় করে খুলে এল, বল্টগুলো। কম্পার্টমেন্টের ভিতরে ঢুকছে বুলেটের মত। মাত্র তিন সেকেণ্ড, তারপর জাহাজ থেকে তাসের মত খসে গেল প্লেটিং। পরক্ষণে একটান খেয়ে চলে গেল নোঙরও!

কম্পার্টমেন্টের সমস্ত পানি ফোঁকর দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়তে লাগল, সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইল রানা ও ব্রায়েসকে! জান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল দু’জন, ধাতব ডেস্ক ও টেবিলগুলোর পা জাপ্টে ধরল।

‘আরেহ ফাটা কপাল!’ বলে উঠল রানা।

পাশ থেকে ওকে দেখল ব্রায়েস। ‘আমাদের কপাল ফাটার কী হলো?’ আন্দাজ করল, আরও বড় কোনও বিপদ আসছে। রানার চোখ অনুসরণ করল, জাহাজের ফাকটা দিয়ে দেখল। ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে জাহাজ সরু হয়ে গলুইয়ের দিকে। গেছে। আর সে-কারণেই সামনের দিক মোটামুটি দেখা যায়।

ওদের জাহাজ একটা বন্দর লক্ষ্য করে ছুটছে! ধীরে ধীরে বাঁক নিচ্ছে! বন্দর আর মাত্র একমাইল দূরে!

কম্পার্টমেন্টের চারপাশ দেখল রানা, জাহাজ থেকে হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি। দু'মিনিটে জাহাজ জলশূন্য হয়ে যাবে, কিন্তু সেইসঙ্গে পূর্ণ গতি পাবে ইঞ্জিনগুলো!

লাভ অ্যাট সি’র ব্রিজে অচল হুইলটা ধরে রেখেছে অ্যাডামস, যেন সে-ই সুপার ট্যাঙ্কারের গা থেকে জাহাজটা সরিয়ে নেবে। ওদের জাহাজের প্রাউ সুপার ট্যাঙ্কারের গায়ে জোর ঘষা দিল, কর্কশ আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলল।

আধ মিনিট পর ট্যাঙ্কারটাকে আচ্ছা মত রগড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল, ছুটল বন্দরের দিকে! দুই জাহাজে আর বাড়ি লাগবে না, ব্যবধান বাড়ছে। হুইল আরেকবার ঘোরাল অ্যাডামস, ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল, ‘ছোট বেলায় একবার একটা টিলা থেকে সাইকেল নিয়ে নেমেছিলাম, সামনে ছিল সাদা একটা প্রাচীর! ওরকম হলো আবারও!’ চোখ ছলছল করে উঠল তার। কৃতজ্ঞ বোধ করছে দুঃসাহসী মাসুদ রানার প্রতি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে আছে ব্র্যাডলি, মনে হলো জ্ঞান হারিয়েছে। ভয়ঙ্কর বিপদটা আপাতত কেটে গেছে দেখে ব্যাপারটা লক্ষ করল জেসন, ফার্স্ট অফিসারকে শুশ্রুষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্রিজে ফার্স্ট এইড কেবিনেট আছে, ওখান থেকে সিরিঞ্জ ও পেইন কিলার নিয়ে ফিরল, ব্র্যাডলির অক্ষত হাতে ইনজেক্ট করল। সে জানে, ওষুধটা কাজ শুরু করতে একমিনিট সময় লাগে। দুমিনিট অপেক্ষা করে ভাঙা হাতটা পরীক্ষা করল। ফাস্ট অফিসারের ডান বাহুর দুটো হাড়ই ভেঙেছে।

‘মিস্টার অ্যাডামস, আমার একটু সাহায্য দরকার,’ বলল জেসন। ‘হাতে স্প্লিন্ট দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।’ ফার্স্ট অফিসার চোখ খুলেছে, জেসন জানাল, ‘চিন্তা করবেন না, স্যর, দু’মিনিটে আপনাকে সারিয়ে দিচ্ছি।’

বিড়বিড় করে বলল ব্র্যাডলি, ‘তা-ই? অনেক ধন্যবাদ!’ আরেকটু চেতন ফিরল, সন্দেহ নিয়ে বলল, আমাকে সাগর থেকে উদ্ধার করার পর গেল কোথায়? তোমরা কেউ কি জানো, ওই বাঙালি ভদ্রলোক এখন কী করছে?’

ক্যাভিস গর্ডন বুঝল, তার স্ত্রী মারা গেছে। বেচারির চেহারা ফ্যাকাসে, স্কাই-ডেকে নিথর পড়ে, মাথাটা একটু কাত, চোখদুটো এখনও সামান্য খোলা।

সম্ভবত ঘাড় ভেঙেই মৃত্যু হয়েছে। সোফিয়ার পাশে দু'হাঁটু গেড়ে বসল গর্ডন। দু'চোখে টলটলে। অশ্রু, অনুরোধের সুরে বলল, 'সোফিয়া, ডার্লিং! প্লিজ, প্লিজ, একবার চোখ খোলো! মাত্র একবার! তুমি মরে গেলে আমার আর কী থাকল!' রক্তশূন্য মুখটা আরেকবার দেখল গর্ডন, আস্তে করে স্ত্রীর দু'চোখ বুজিয়ে দিল। নিচু স্বরে বলল, 'শুধু যদি আরেকবার জীবনে তোমাকে ফিরে পেতাম! আর কখনও বলতাম না সিগারেট খাওয়া চলবে না!'

সোফিয়ার চোখদুটো চট করে খুলে গেল, চোখ পিটপিট করে স্বামীকে দেখল। 'সিগারেট নিয়ে আর কিছু বলবে না তুমি?' জানতে চাইল।

'সোফিয়া, সত্যি তুমি বেঁচে আছ?' খুশিতে হেসে উঠল গর্ডন। 'চলো ডার্লিং, একটা সিগারেট জোগাড় করে আনি।'

উঠে বসল সোফিয়া, লম্বা চুলগুলো ঝেড়ে নিয়ে দাঁড়াল। কী যেন বললে তুমি?

'সিগারেটের ব্যাপারে,' লাজুক হাসল গর্ডন। 'তুমি যখন এতই ভালবাসো...'

'ও জিনিস আমি ছেড়ে দিয়েছি, গর্ডন,' দৃঢ় স্বরে বলল সোফিয়া। তবে তুমি যদি জাহাজে না-খোলা কোনও শ্যাম্পেন আর পরিষ্কার গ্লাস পাও, কয়েক চুমুক দিতে পারি।'

'ঠিক আছে, তা-ই খুঁজে বের করব আমি,' কথা দিল গর্ডন।

স্কাই ডেকে দুই যমজ বোন জুলি-ক্যারল হঠাৎই সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলল, সারাজীবন তারা আধুনিক সমাজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে নিজেদের; কিন্তু বাস্তবতা তাদের এগিয়ে যেতে বাধ্য করল। আহতদের

সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। দু'জন, যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে।

উইন্ট্রি ও সিয়েরার কাছে থামল দুই বোন, জুলি বলল, 'আপনাদের মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন ও আহত হয়েছে কি না।'

'ওর কিছু হয়নি,' বলল সিয়েরা।

নরম স্বরে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলল জুলি, 'তবুও জিজ্ঞেস করুন, ডিয়ার। আমরা জানতে চাই।'

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে শুরু করল সিয়েরা, মুখেও বলল, 'ওঁরা জানতে চান তুমি সুস্থ আছ কি না।'

ঠোঁট দেখে কথাগুলো বুঝেছে ন্যান্সি, বুড়ো আঙুল তুলে হেসে ফেলল। ও আহত হয়নি।

'ম্যাডাম, একটা কথা কি বলবেন?' জিজ্ঞেস করল উইন্ট্রি। 'হঠাৎ এই মহাবিপদে আপনারা শামুকের খোল থেকে বেরিয়ে এলেন কী করে?'

'এটা তো কিছুই না,' বলল ক্যারল। 'সত্যিকারের বিপদ হয় যখন প্রেয়ারির ঘাসে আগুন লাগে।'

'বা টর্নেডো যখন হয়,' বলল জুলি।

'টর্নেডো সত্যি খারাপ,' বলল ক্যারল। 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু আসল বিপদ একটানা তিনদিনের ব্লিযার্ড।'

'বিশেষ করে যখন গরুগুলো কোথায় রয়েছে জানা থাকে না, আন্দাজে বেরিয়ে পড়তে হয়,' বলল জুলি। 'তখন ওরা তুষারের মধ্যে পানির অভাবে মারা যায়। ওরা তো আর জানে না তুষার। আসলে পানি দিয়েই তৈরি!'

হাসতে শুরু করেছে ন্যান্সি, ওর মা পাঁজরে গুঁতো দিল।

দুই জাহাজে সংঘর্ষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর লিলি বকবক করেছে, কিন্তু যখন দেখল কেউ তার কথা শুনছে না, দৃষ্টি দিল সুপার ট্যাঙ্কারের উপর। কিছুক্ষণ দেখে হতবাক হলো, তারপর ছিটকে গিয়ে পড়ল আরেকদিকে।

এইমাত্র মেঝে থেকে উঠেছে সে, জানে তার কাজ যাত্রীদের আনন্দ দেয়া, মুগ্ধ করা। কাজেই জোরালো ঝনঝনে কণ্ঠে শুরু করল, 'আপনারা কি জানেন ডোমিনিকার রোজো বন্দর কীজন্য বিখ্যাত? ওই প্রবাল দ্বীপের তিনপাশে পানি অনেক গভীর বলে একেবারে প্রায় তীর ঘেঁষে থামে ওখানে ক্রুজ শিপগুলো -হাত বাড়ালেই ধরা যায়। এই কারণেই সবসময় জমজমাট থাকে বন্দরের সামনের রাস্তা। ওখানে পাবেন হরেক ধরনের দোকান। তবে যদি লিলির পরামর্শ চান, আমি বলব ফ্রেঞ্চদের দোকান থেকে কিছু কিনবেন না। বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ পারফিউম নিজেদের দেশে যে দামে কেনেন, তার অর্ধেক দামে বিক্রি করবে ওরা। কাজেই জিনিসটা যে নকল, বুঝতেই পারছেন! আরও আছে...'

লিলির পাশ থেকে নিচু স্বরে বলল রিটা, 'যদি তোমাকে জাহাজ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই, সবাই ধরে নেবে তুমি দুর্ঘটনায় মরেছ। খুশিই হবে মানুষ। আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন নালিশ করবে না।'

দুই মাইল নীল সাগর পেরিয়ে ছোট্ট দ্বীপের দিকে ছুটে চলেছে উইন্ড-জেট। হ্যালেকের মুখে গর্বের হাসি, সামান্য বাঁক নিল। সোহানার কব্জি দুটো এখনও জেট-স্কির সঙ্গে বাঁধা।

সোহানা ফিরে চাইল। আশ্চর্য! ওদের জাহাজটা কী করে যেন মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছে, এইমুহূর্তে সুপার ট্যাঙ্কারের গায়ে গা ঘষে পাশ কাটাচ্ছে। এরপর বোধহয় বন্দরের দিকে ছুটবে।

কোনও সন্দেহ নেই, এটা রানার কাজ! তার মানে, স্বস্তি নিয়ে ভাবল ও, সাগর থেকে ফিরিয়ে এনেছে ওকে উইঞ্চটা। জাহাজে উঠেই কোনও কৌশলে ঘুরিয়ে দিয়েছে রানা গতিপথ। হ্যালেকের দিকে তাকাল, লোকটা আপনমনে হাসছে এখনও। ইঞ্জিনের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল, 'ওই দেখো, হ্যালেক! জাহাজটা চলে যাচ্ছে!'

ডানে ঘুরে তাকাল হ্যালেক, চোখদুটো বড়বড় হয়ে উঠল -লাভ অ্যাট সি সত্যিই নোয়া'জ বোটের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। 'অসম্ভব!' বাঘের মত গর্জে উঠল সে। লাভ অ্যাট সি মস্ত জাহাজটাকে পেরিয়ে গেল! ওদিকে নিশ্চিন্তে বসে আছে সুপার ট্যাঙ্কার! হ্যালেকের গলা থেকে নেকড়ের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'আমার ভুল হতেই পারে না!' টকটকে লাল হয়ে গেল তার চেহারা, ভ্রূ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে কুঁচকে গেল -সোহানার চোখে তাকাল।

মুচকি হাসল সোহানা, 'মাসুদ রানার কাজ।'

'কী করে? অনেক আগেই কিমা করে ফেলেছে ওকে জাহাজের প্রপেলার।'

'আমি উইঞ্চ আঁকড়ে ধরার ছুতোয় টিপে দিয়েছিলাম সবুজ বোতাম।'

ওর চোখে-মুখে একইসঙ্গে ভয়-হিংসা-হতাশা-রাগ-ঘৃণা সবরকম অভিব্যক্তি দেখতে পেল সোহানা। পলকে বুঝল, এ লোক আর মানুষই নেই।

ষোলো

ডোমিনিকা দ্বীপে একটু আগে ভোর হয়েছে। আদিবাসী, কালো মানুষ আর সাদা টুরিস্টরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। রোজো বন্দর শহরে মাত্র কয়েকটা প্রধান সড়ক, বাকি সব সরু গলি। বাড়িগুলো বেশিরভাগই বন্দরের দিকে মুখ করা, সামনে নানারকমের দোকান -সবই ডিউটি-ফ্রি শপ। কয়েকটা বাড়ি পর পর হোটেল, ক্যাসিনো আর রেস্টুরেন্ট। বাড়িগুলোর দেয়াল বেয়ে উঠেছে লতাগাছ, তাতে ফুটেছে হাজারো রংবেরঙের ফুল।

সূর্য ভালভাবে উঠবার পর প্রচণ্ড গরম পড়ে, তাই সবাই যার-যার কাজ ঝটপট সেরে নিয়ে দুপুরে বিশ্রাম নেয় -বিকেলে বাকি কাজ শেষে ফুর্তি করে। টুরিস্টরা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে শপিং ব্যাগ। দোকানিরা তাদের দোকানগুলো খুলতে শুরু করেছে। রেস্টুরেন্টগুলো আগেই খুলে গেছে। যেসব ট্যুরিস্ট সারারাত ক্যাসিনোয় জুয়া খেলেছে, তারা এখন নাস্তা সারতে আসছে। অনেকে বাইরের ক্যাফেতে গিয়ে বসল। তারা পেল দেখবার মত টকটকে লাল সূর্য, রংচঙা পাখি, সবুজ গাছপালা, নানা রঙের ফুল, শান্ত পরিবেশ আর রসিক দ্বীপবাসীদের আলাপ। কিছু লোক এই সাত-সকালেই মদের অর্ডার দিয়েছে।

অনেকে বন্দরের দিকে চলেছে, যারা আগে চলে গেছে তারা ভাল জায়গাগুলোর দখল পেয়েছে। একটা পিয়ার বন্দরের মুখ থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে থেমেছে, ওখানে অনেকে হাঁটছে বা জগিং করছে। বন্দরের মেরিনায় কয়েক শ' নোঙর ফেলা নৌযান দুলছে ঢেউয়ে। সেখানে হৈ-হল্লা চলছে, খানিক পর মাঝি-মাল্লারা ট্রলার বা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বে

সাগরে। বন্দরে গুনে শেষ করা যায় না, এত্তো ওঅর্ক বোট। শৌখিন দামি ইয়ট, আকাশ-ছোঁয়া মাস্তুল তোলা ডিপ-ওয়াটার সেইল-বোট, ছোট সেইল-বোট, স্পিডবোট বা বাতাস ভরা রাবারের ক্রাফট্ -কী নেই!

জেলেরা পানি দিয়ে তাদের নৌকার পাটাতন ধুয়ে নিয়েছে। তাদের একজন ডক থেকে শহরের দিকে পা বাড়াল, দু'হাতে টেনে নিয়ে চলেছে তার চেয়ে লম্বা এক বিলফিশ। জেলেরা দক্ষ হাতে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। ট্যুরিস্টরা সাগরে একপাক ঘুরে আসবার জন্য সেইল-বোট ভাড়া করছে। চারপাশে দাম, হট্টগোল, চেঁচামেচি। সবাই চাইছে কে কার আগে বেরিয়ে পড়বে আনন্দভ্রমণে। তাদের একজন তো নোঙর তুলবার আগেই ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল! কাছাকাছি নোঙর করা কয়েকটা বোট থেকে হই-হই করে উঠল অনেকে। হাসাহাসিও চলছে।

পৃথিবীর এসব স্বর্গ-দ্বীপে প্রতিটি সকাল কাটে আনন্দে। জীবন বরাবরের মতই স্বাভাবিক ভাবে চলে, প্রতিদিনের মতই। আর বোধহয় সেজন্যই কেউ খেয়াল করল না উপসাগর থেকে বিশাল এক সাদা জাহাজ ছুটে আসছে বন্দরের দিকে! যদি খেয়াল করত, হয়তো ভাবত, নতুন করে আরেকটা ক্রুজ শিপ আসছে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে!

পানি ভরা করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে, তারপর পড়বে জ্বলন্ত এইট্রিয়াম -ও পথে ডেক-এ উঠতে চাইল না রানা। অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে। জাহাজের চৌকো ফোকরটা দেখে অন্য বুদ্ধি খেলল -উকি দিল বাইরে। যাত্রীরা জাহাজ ত্যাগ করবার সময় এদিকে বেশ কিছু দড়ির মই নামিয়ে দিয়েছিল নাবিকরা, তারই একটা হাতের নাগালে ঝুলছে। চাইলেই ব্রায়েসকে

নিয়ে মই বেয়ে উঠতে পারবে ও। কিন্তু উঠতে হবে দ্রুত গতিতে। জাহাজের সামনের দিকে থাকলে মরতে হবে। লাভ অ্যাট সি সরাসরি দ্বীপের দিকে ছুটছে! ওই দ্বীপের কিছুই হবে না, কিন্তু লাভ অ্যাট সি'র কপালে কী ঘটবে, কেউ জানে না!

ফোকর দিয়ে একহাত বাড়িয়ে দড়ির মই ধরল রানা, আরেক হাতে ব্রায়েসকে ইশারা করল -চট করে উঠতে শুরু করুন।

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ফটোগ্রাফার।

'দেরি না করে উঠুন!' ধমক দিল রানা।

'মই ছিড়ে যদি সাগরে গিয়ে পড়ি?' আবারও মাথা নাড়ল ব্রায়েস।

দু'হাতে মই নীচের দিকে টান দিল রানা, বুঝিয়ে দিল সব ঠিকই আছে। শক্ত করে মই ধরল।

'আপনি আগে উঠুন,' বলল ব্রায়েস।

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, নীচের দিকে চেয়ে তাড়া দিন, 'জলদি আসুন!'

ফোককের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা বের করল ব্রায়েস, চারপাশ দেখল। উঠবার ফাকে নীচে তাকাল রানা। ব্রায়েস যেন কোনও খরগোশের বাচ্চা, গর্ত থেকে বেরোতে চাইছে না, ঈগল না আবার তাকে তুলে নিয়ে যায়।

মইয়ের ধাপে খুব ধীরে এক পা রাখল ব্রায়েস, মাথা তুলে দেখল ওটা খসে পড়ছে কিনা। একটু আগে পর্যন্ত সে রানাকে সহযোগিতা করেছে, তবে এখন সাহসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে -এবার ভেঙে পড়বে। তাড়া দিল না রানা, এখন ধমক দেয়া মস্ত ভুল হবে –চুপচাপ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল।

দু'হাতে দড়ি ধরল ব্রায়েস, ধাপে দু'পা রাখল। বুঝে গেছে খ্যাপা সাগরে চোখ ফেললে ভয়ে হাত অসাড় হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে নীচে গিয়ে পড়বে। পা ফেলে এক ধাপ করে উঠছে, যেন নেশার ঘোরে সিঁড়ি ভাঙছে কোনও বদ্ধ মাতাল।

ক্রুজ শিপ বন্দরের দিকে চলেছে, দূরে মেরিনার ব্যস্ত পানি -বেশিরভাগ বোট জাহাজটাকে দেখেছে, সময় থাকতে সরছে। তবে পঁয়ত্রিশ ফুটি একটা ডিপ-ওয়াটার রেসিং সেইল-বোট দাঁড়িয়ে আছে বন্দরের মুখে, নড়বে না। ওটার ক্যাপ্টেনকে ঘাড় ত্যাড়ামিতে ধরে বসেছে, তাকে রাইট অভ ওয়ে দিতে হবে। বন্দরের নিয়ম অনুযায়ী তাকেই বেরিয়ে যেতে দিতে হবে, কিন্তু জাহাজটা মোটেও পাত্তা দিল না তার দাবিকে!

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন বুঝল, জাহাজটা সত্যিই পথ ছাড়বে না, বাঁচতে চাইলে তাকেই পালাতে হবে! শেষ মুহূর্তে পালের বুম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। সেইল-বোট ঘুরিয়ে নিতে চাইল, জাহাজের প্রাউ'র সামনে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু! সেইল-বোট হঠাৎ চরকির মত ঘুরে গেল, দুই নৌযানের প্রাউ একইসঙ্গে মেরিনার দিকে রওনা হলো। লাভ অ্যাট সি'র বোর বিশাল ঢেউ সেইল-বোটকে আকাশে তুলে দিল, জাহাজের পাশে কাত হয়ে গেল ওটা - প্রকাণ্ড পাল লাভ অ্যাট সি'র গায়ে আঁচড় কাটল।

ওটা ছুটে আসতে দেখল রানা, গলা ফাটিয়ে ব্রায়েসকে সাবধান করল!

ফটোগ্রাফার পাল আর মাস্তুল দেখে চমকে গেল। প্রচণ্ড শক্তি ভর করল দেহে, পাঁচ সেকেণ্ডে সাত ধাপ উঠল। অ্যালুমিনিয়ামের মাস্তুল তার জুতোর দু'ইঞ্চি নীচে খোলের উপর আছড়ে পড়ল!

সৈকতে এক মাঝবয়সী দম্পতি দুই জেলের সামনে থামলেন, একবার তাদের ফাঁদগুলো দেখলেন। পুরুষ ট্যুরিস্ট ডাচ ভাষায় বললেন, 'আপনাদের মনে হয় না, জাহাজটা এই ছোট্ট বন্দরে অনেক জোরে ঢুকছে?'

'নো ডাচ,' বলল বয়স্ক জেলে। দ্বিতীয়জন তারই ছেলে, মাথা নেড়ে শ্রাগ করল। হাসল দু'জন।

দুই টুরিস্ট এগিয়ে যেতেই ছেলেকে ফ্রেঞ্চে বলল জেলে, 'লোকটা বোধহয় জাহাজটার কথাই বলছিল! ঠিকই বলেছে, এ বন্দরে এভাবে এটা ঢুকছে কেন!'

'ঢুকবে না,' বলল তার ছেলে, 'ওটা তো বিরাট জাহাজ!'

তার বাবা বলল, 'যেভাবে আসছে তাতে অন্য দিকে যাওয়ার পথ নেই। আমাদের দিকেই আসছে!'

জাল-ফাঁদ মেরামত বন্ধ করে জাহাজের দিকে তাকাল দু'জন, গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। তাদের অভিজ্ঞ চোখ অনেক কিছু দেখল। সবাইকে সাবধান করতে দু'জন চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশে।

বন্দরের অন্য দিকে সবাই মৌজে আছে, জানে না তাদের উপর ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে। জাহাজটা যারা দেখেছে তারা ভেবেছে এই স্বর্গে ওটা সামান্য একটা আপদ, এর বেশি কিছু নয় -এখানে তো খারাপ কিছু ঘটে না কখনও!

অস্থির এক পিচ্চি ছেলে ওর মাকে বলল, 'মা, ওই দেখো বিরাট জাহাজটা আমাদের দিকে কেমন তেড়ে আসছে!'

তার মা একটা সেইল-বোটের ডেকে সানবেদিং করছে, সারা দেহ তেলে চপচপ করছে। মাথা তুলল সে, সানগ্লাস খুলে সাগরের দিকে তাকাল। মৃদু হেসে আবার শুয়ে পড়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, রিচি। জাহাজটা খুব সুন্দর।'

ব্রায়েসকে দু'হাতে টেনে রেলিং পার করিয়ে দিল রানা, ব্রিজে গিয়ে ঢুকল দু'জন। ব্র্যাডলির হাতে স্লিং দেখল ওরা, জানালায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সে। পাশে অ্যাডামস ও জেসন।

'নোঙরের কন্ট্রোলটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

ঘুরে তাকাল সবাই, ব্র্যাডলি মাথা কাত করল অ্যাডামসের দিকে। সে চট করে পোর্ট অ্যাঙ্কর বাটন টিপে দিল। মনে হলো কাজ হবে, নোঙটা ঝপ্পাস করে সাগরে পড়ল, পিছনে ছুটল লোহার মোটা শেকল। কিন্তু নোঙর উপসাগরের বালির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে চলল। তারপর বালির নীচের পাথরে আটকে গেল, শেকল টানটান হলো। নোঙরটা জাহাজের তীব্র গতি থামিয়ে দিতে চাইল। বালির নীচের কঠিন পাথর গাট মেরে রইল। জাহাজের গতি এভাবে থামবে না; হয় নোঙরের শেকল ছিড়বে, নয়তো উপড়ে আসবে পাথর! শেকলের একটা লিঙ্ক অন্যগুলোর চেয়ে দুর্বল, ওটার ডিম্বাকৃতি চেহারা প্রচণ্ড টানে সিধে হলো, সঙ্গে সঙ্গে মাঝখান থেকে খুলে গেল শেকল, জাহাজের সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না। নোঙরের। আগের মতই ছুটল জাহাজ!

'স্পিড কমেছে কিছুটা,' ঘোষণা দিল অ্যাডামস, ঝুঁকে পড়ল স্পিড় ইণ্ডিকেটারের উপর। 'পনেরো নট... চোদ্দো... বারো... মনে হয় থামছি আমরা।'

সামনে একটা সেইল-বোট দেখল জেসন, খপ করে জাহাজের হুইল ধরল, চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে সর! সামনে থেকে সরে যা!’ জাহাজ প্রায় বন্দরে ঢুকে পড়েছে। দু’হাতে অকেজো হুইল ধরে এদিক-ওদিক করছে জেসন, গলা ফাটাল, ‘আমাদের ভেঁপুটা কোথায়?’

প্যানেলে নানারকম সুইচ দেখে একের পর এক বাটন টিপল ব্রায়েস, আশা করল ওগুলোর একটা হয়তো হর্নের।

বড়সড় একটা ক্যাটাম্যারানের ডেকে সুইমসুট পরে শুয়ে আছে এক স্বর্ণ-কেশী, আরাম করে চোখ বুজে রোদ পোহাচ্ছে। পাশে পোর্টেবল টিভি ও সিডি প্লেয়ার চলছে। চুলে টেরি কাটা এক সুর্দশন যুবক ক্যাটাম্যারানের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, হাতে রুপোর ট্রে। ওটার উপর ড্রিঙ্কসের দীর্ঘ দুটো গ্লাস।

জাহাজটা ক্যাটাম্যারানের এত কাছে চলে এসেছে যে জেসন ব্রিজ থেকে ড্রিঙ্কটা পরিষ্কার দেখল -ব্লাডি মেরি’জ। সুদর্শন লোকটা হঠাৎ চোখ তুলল, কী যেন তাকে ছায়া দিয়েছে -ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিশাল এক জাহাজ দ্রুতগতিতে আসছে! ওটার প্রাউ ঠিক এদিকেই তাক করা! হাত থেকে ট্রে খসে পড়ল তার, ভুলেই গেল প্রেমিকার কথা, দু’লাফে গিয়ে রেলিং টপকাল, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে!

হঠাৎ কীসের ছায়া এল? সুন্দরী পাশ ফিরল, সঙ্গে সঙ্গে গলা চিরে ভয়ানক চিৎকার বেরিয়ে এল। একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ে, সঙ্গী যেদিকে ঝাঁপ দিয়েছে, তার উল্টোদিকের রেলিং টপকে পানিতে পড়ল! এরপর পাঁচ

সেকেণ্ডও পেরল না, লাভ অ্যাট সি'র প্রাউ ক্যাটাম্যারানের পেট কেটে দু'টুকরো করে দিল!

ওই দুজনকে একটু আগে শেষবার দেখেছে জেসন, তারপর কী হয়েছে জানে না -ব্যস্ত হয়ে কয়েকবার হুইল ঘোরাল সে। মানুষজনকে বাঁচাতে পেরেছে কি না বুঝল না, একছুটে ব্রিজের স্টারবোর্ড হাউজে গেল, ক্যাটাম্যারানের অবশিষ্ট দেখতে চাইল। ওখানে কিছুই নেই। করুণ স্বরে বলল জেসন, 'আমি বোধহয় দু'জন মানুষ খুন করলাম!'

বন্দরের স্কুবা স্কুলের সেরা সাহসী দুই ডাইভার পানির উপর মাথা তুলল। ইন্সট্রাকটার ওদের যতটা যেতে বলেছেন, তার চেয়ে অনেক দূরে সরে গেছে। তাতে কী! ঝুঁকি যা নেওয়ার তারা নিজেদের জীবনের উপর নিয়েছে, স্কুবা স্কুলকে প্রচুর টাকাও দিয়েছে। চারপাশ দেখতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখল সেটার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। ইন্সট্রাকটার বারবার বলেছেন, কোনও বোট এলে বড় করে শ্বাস নিয়ে ডুবে যাবেন। কিন্তু সামনে ওটা কোনও বোট নয়! ওটা এক বিশাল জাহাজ! দ্রুত ওদেরই দিকে ছুটে আসছে! মস্ত শ্বাস নিয়ে ডুবে গেল দু'জন, দুই হাত নেড়ে আরও নীচের দিকে চলল একেবারে সাগর - তলায় গিয়ে থামল।

বিশাল জাহাজের কিল ও নীচের অংশ তাদের মাথার উপর দিয়ে গেল, দু'জনের মনে হলো ওটা সিনেমার কোনও স্পেসশিপ। ইচ্ছা করলেই ওরা হাত তুলে জাহাজের গায়ের বারনাকলগুলো ছুঁতে পারত, কিন্তু সাহস পেল না।

সাগর-তলের দু'জন ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে, কিন্তু জাহাজের উপর ডেকে অর্ধউলঙ্গ যারা রয়ে গেছে, তারা আরও বেশি ভয় পেয়েছে -মরণ ভয়। প্রায় সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছে এখন।

ভিক্টর চিৎকার করে বলল, 'সবাই ডেকে শুয়ে পড়ুন।' স্ত্রীকে নিয়ে আগেই শুয়ে পড়েছে সে।

'আরও কষ্ট সহ্য করতে হবে নাকি?' জানতে চাইল জুলি।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল দ্বিতীয় বুড়ি, ক্যারল।

ততক্ষণে সবাই ভিক্টর হিগিন্সের নির্দেশ মেনে নিয়েছে, শুয়ে পড়েছে ডেকে। দু'বোন দেরি না করে শুয়ে পড়ল ঝটপট।

হুইল ঘুরিয়ে জাহাজ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টায় কোনও লাভ হয়নি, তবে ডেসনের সান্তনা, ও অন্তত চেষ্টা তো করেছে। লাভ অ্যাট সি'র স্টারবোর্ডের নোঙর ফেলবার পরও কাজ হয়নি, কিন্তু সুযোগ পেয়ে হুইলটা আচ্ছামত ঘুরিয়েছে সে। সামনে পড়ল দুটো ষাট ফুট লম্বা ইয়ট, ওগুলো বাঁচাতে চাইল জেসন। ওদের জাহাজ প্রথম ইয়টের স্টার্নে ধাক্কা দিল, ওটাকে ছিটকে নিয়ে ফেলল দ্বিতীয়টার উপর। প্রচণ্ড আওয়াজে ডাঙায় দাঁড়ানো পর্যটকরা চমকে গেল। স্রষ্টার নাম নিল সবাই, কৃতজ্ঞ বোধ করল এই ভেবে যে, তারা অন্তত খুন হয়নি।

ধাক্কা খেয়ে উড়ে গেল দুই ইয়ট, উল্টে পড়ল। কিন্তু প্রকাণ্ড জাহাজ ও-দুটোকে ঠেলে আরও সামনে নিয়ে ফেলল। ওটার প্রাউ দুই নৌযানকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করল যে একটা বাচ্চা ছেলেও বলে দেবে, ওগুলো আর কোনদিন পানিতে ভাসবে না। একটা ইয়ট সিগারেটের বাক্সের মত ছিটকে

পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। নিয়ন্ত্রণহীন লাভ অ্যাট সি'র প্রাউ অন্যটাকে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড খেলল, তারপর একপাশে ছুঁড়ে দিল। টুপ করে ডুবে গেল ওটাও।

এসব সংঘর্ষে জাহাজের গতি সামান্য কমল, কিন্তু ততক্ষণে ওটা বন্দরে ঢুকে পড়েছে। সামনে মাত্র পাঁচ শ' গজ, তারপর দ্বীপের তটভূমি! লাভ অ্যাট সি সরাসরি তীরের দিকে ছুটছে।

ঠিক তখনই জাহাজের স্টিম হুইসলের বাটন খুঁজে পেল। ব্রায়েস, বারবার টিপতে শুরু করল। ভয়ানক আওয়াজ হলো, বোঁওওও! বোঁওওও! বোঁওওও! বোঁওওও! বোঁওওও!

থামল না ব্রায়েস, তবে হুইসল্ খুঁজতে ওদের বোধহয় দেরিই হয়ে গেছে। প্রচণ্ড আওয়াজে বরং মানুষ আরও হতভম্ব হলো, বুঝে উঠতে পারল না কী করা উচিত।

বড়সড় একটা লাইফবোট নিশ্চিন্তে মেরিনার দিকে ছুটে চলেছে, ওটাতে মাত্র ছ'সাতজন লোক, পরনে নাবিকের পোশাক। এইমাত্র তারা জাহাজের ভেঁপু শুনেছে, পিছন ফিরে দেখল মস্ত সেই সাদা জাহাজটা আবার তাদের দিকে তেড়ে আসছে। মুহূর্তে ওটা বোটের পাশে পৌঁছে গেল, বোর জোর ঢেউয়ে লাইফ-বোট ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। ক্যাপ্টেনসহ ডুবে গেল নাবিকরা। পরক্ষণে আবারও ভেসে উঠল সবাই, ততক্ষণে জাহাজ এগিয়ে গেছে।

'হেল্প!' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন অলিভার, দু'হাতের সাহায্যে কোনও মতে ভাসছে।

'আপনার আবার কী হলো, স্যর?' এক নাবিক বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ক্যাপ্টেন মুখ কুঁচকে বলল, 'আমার মনে হয় পাছার হাড় ভেঙে গেছে, ওফ!'

তাকে দু'পাশ থেকে ধরে সাঁতরাতে শুরু করল দু'জন নাবিক।

ওদিকে জাহাজের সামনে অন্তত ছোট-বড় বিশটা বোট নোঙর ফেলে রেখেছে। ওখানে মানুষের নড়াচড়া দেখা গেল। সৈকতে রয়েছে পর্যটক ও জেলেরা।

জানালা দিয়ে আর চাইল না জেসন, দু'হাতে চোখ টিপে ধরল। কিন্তু মাত্র দু'সেকেণ্ডের জন্য, তারপর আবারও চোখ খুলতে বাধ্য করল তাকে কৌতূহল। খানিকটা দূরে অনেকে সেইল-বোট, ফিশ-বোট, ওঅর্ক-বোট ছেড়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ছে। ট্যুরিস্টদের একটা প্যাডেল-বোট জাহাজের সামনে থেকে সরতে চাইল, সবার পা ইঞ্জিনের মত চলল –কয়েক সেকেণ্ড পর সরে গেল বোট।

সৈকত থেকে সবাই দৌঁড়ে পালাল, কিন্তু মাত্র একজন মহানন্দে আছে। একটা রেন্টাল স্পিড-বোট নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে মেয়েটা, তার পিছনের টো-লাইন ধরে ছুটছে তার বয়ফ্রেণ্ড। ওয়াটার স্কি দিয়ে নানা কেতা করছে সে। মেয়েটা এত মজা পেয়েছে যে দুনিয়ার আর সব ভুলেছে। প্রথমবারের মত সে আস্ত একটা স্পিড-বোট চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

তার বয়ফ্রেণ্ড হঠাৎ জাহাজ দেখে চমকে উঠল, গলা ফাটিয়ে সঙ্গিনীকে ডাকল, একহাতে দ্রুত ইশারা করল। বান্ধবী পাল্টা হাতের ইশারা করল। যুবক ভাবল, টো-লাইন বার হাত থেকে ছেড়ে দেবে। অন্য চিন্তাও এল, মেয়েটাকে এখন ত্যাগ করলে বিশ্রী দেখাবে। এদিকে বিশাল জাহাজ ছুটে আসছে! সে আর টো-লাইনের বার ছাড়ল না। পলকের জন্য ভাবল, স্পিড-

বোট আড়াআড়ি ভাবে জাহাজের নাকে গিয়ে গুঁতো দেবে। কিন্তু পলকা বোটই জিতল, জাহাজটার নাকের সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ প্রাউ টো-লাইনটা কুচ করে কেটে দিল। মেয়েটা হঠাৎ বুঝল বিরাট এক রেসে অংশ নিয়েছে। ওদিকে তার বয়ফ্রেণ্ড জাহাজ এড়াতে বার ছেড়ে দিয়েছে, দেখবার মত একটা ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়ল সে। তার বিশ ফুট দূর দিয়ে এগোল জাহাজ। হঠাৎ টো-লাইনের জোরাল টান না থাকায় স্পিডবোট অন্যদিকে ছুটল -চালিকা আর ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। স্পিড-বোট ছুটল কাছের তটরেখার দিকে।

ক্যাফেগুলোর বাইরের টেবিলে যারা বসেছে, সবাই দৃশ্যটা ভালভাবে দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দেখল তারা, তারপর প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটল নানান দিকে। স্পিড-বোট প্রচণ্ড গতিতে সৈকতে উঠ এল, খ্যাসখ্যাস আওয়াজ তুলে রাস্তা পেরিয়ে টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল। এই সাধারণ ছোট্ট শহরে এমন কাণ্ড দেখলে সবাই অবাক হবে, কিন্তু আজকের সকাল কেমন যেন অন্যরকম -যারা স্পিড-বোটের সামনে থেকে সরে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ এ-নিয়ে চিন্তাই করল না। কয়েকজন কাস্টমার এই সুযোগে ক্যাফের বিল না মিটিয়েই কেটে পড়ল।

চোখের সামনে মস্ত একটা ইয়ট দেখল জেসন। স্বীকার করে নিল, ওদের জাহাজ আগে যে ইয়ট দুটোকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে এসেছে, সেগুলাে তেমন বড় ছিল না। ওদের জাহাজ এই বিরাট ইয়টকে ছিটকে ফেলতে পারবে না! এটা লম্বায় এক শ’ পঞ্চাশ ফুটের বেশি, দুটো চিমনি, তিনটে ডেক আছে, সেই সঙ্গে আছে একটা হেলিপ্যাডও। যাকে বলে বিশাল ইয়ট!

দুই অফিসার কিছুই করছে না দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে। জেসন, নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছে, শিপ টু শিপ অ্যাড্রেস সিস্টেমে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনারা ঘুম থেকে উঠুন! জলদি উঠুন! নিয়ন্ত্রণহীন বিরাট একটা জাহাজ আপনাদের দিকে আসছে!'

জানালায় দাঁড়িয়েছে রানা, বিরাট ইয়টের দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল। দশ সেকেণ্ড পেরনোর আগেই ইয়টের উপর চড়াও হলো লাভ অ্যাট সি। ওই ইয়ট যেন জন্মদিনের নরম কেক, ছুরি দিয়ে দু'টুকরো করা হলো। এগিয়ে চলল জাহাজ। লাল রঙের একটা ফিউল-বোট ঢিবঢিব আওয়াজ তুলে প্রাউ'র সামনে চলে আসছে।

'হায় ঈশ্বর!' জেসন ডুকরে উঠল। 'আবারও মানুষ খুন!'

ক্রুজ শিপের প্রাউ এক ফুটের জন্য ফিউল-বোটের স্টার্ন ধরতে পারল না। কিন্তু সামনের দৃশ্য আরও অনেক ভয়ঙ্কর হতে পারে। দ্বীপের তট এগিয়ে আসছে, জাহাজ দিয়ে ওটা কখনও সরানো যাবে না। ডাঙার পাশেই পানির গভীরতা অনেক, জাহাজ সোজা গিয়ে ধাক্কা দেবে প্রবাল দ্বীপটাকে।

ব্রিজের জানালা দিয়ে চেয়ে রইল রানা, তিক্ত স্বরে বলল, 'দু'হাতে শক্ত করে কিছু ধরুন সবাই। আরও ভাল হয় মেঝেতে শুয়ে পড়লে!'

অ্যাডামস একবার জাহাজের স্পিড ইণ্ডিকেটার দেখল, মস্ত ঢোক গিলল। 'সুসংবাদ আছে, কিন্তু সঙ্গে দুঃসংবাদও।' শান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের গতি নয় নটে নেমে এসেছে, কিন্তু জাহাজ এখন দ্বীপে ধাক্কা দেবেই।'

'আমরা মরে গেলাম!' মেঝেতে শুয়ে পড়ল জেসন।

স্কাই-ডেকের যাত্রীরা আগেই সটান শুয়ে পড়েছে, শুধু লিলি ল্যাংট্রি একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। জোরাল স্বরে বলল, 'ওই যে মেরিনার রাস্তা! এখান থেকে আপনারা ডিউটি-ফ্রি শপগুলো দেখতে পাবেন পরিষ্কার!'

তীরে এক রিয়াল এস্টেট এজেন্ট এক দম্পতিকে নতুন একটা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। তাদেরকে অনেকটা পটিয়ে এনেছে সে। স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে দু'বছরের ছেলেটি, বড়দের আলাপ শুনে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে সে জানালার সামনে, বাইরেটা দেখছে।

'মা, একটা জাহাজ আসছে,' বলল সে।

'তা-ই?' ভালবাসা নিয়ে বলল মহিলা, হাসছে। 'এখানে তো অনেক জাহাজ আসে, বাবু!'

'মিষ্টি ছেলে,' হাসতে চাইল এজেন্ট, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'বুদ্ধিমান ছেলে, সব খেয়াল করে!'

জানালা দিয়ে চেয়ে আছে ছেলেটি, বিরাট জাহাজটা সরাসরি পিয়ারের দিকে আসছে।

'দুই বেডরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন... মেঝে পালিশ দেয়া সেগুন কাঠের,' বলে চলেছে এজেন্ট, 'এসব বাড়ি কখনও পুরোনো হয় না।'

'মা, জলদি এসে দেখো,' বলল ছেলেটি। 'বিরাট জাহাজ!'

দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে এজেন্টের দিকে তাকাল মহিলা, ছেলের দিকে এগোল। আপনারা কথা বলুন, 'আমি আসছি।'

ছেলেটির দিকে ছুরির ফলার মত দৃষ্টি তাক করল এজেন্ট, ভদ্রলোকের দিকে ফিরল।

ওদিকে লাভ অ্যাট সি'র ব্রিজে রানা, জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। এখন আর ওর কিছুই করার নেই। নীরবে দেখল ওদের জাহাজ কাঠের পিয়ার ভাঙছে। কপাল ভাল যে একটু আগে লোকজন ওটা ছেড়ে নেমে পড়েছে। তক্তাগুলো আকাশে ছিটকে উঠল, উপর থেকে মনে হলো ওগুলো দাঁতের খিলাল। একটা কুকুর পিয়ারের গোড়া থেকে চিৎকার শুরু করল। পিছিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে চলছে অবিরাম ঘেউ-ঘেউ!

ক্রুজ শিপের প্রাউ এক পলকে পিয়ার উড়িয়ে দিল, সি-ওয়ালে বাড়ি দিল -তাতে থামল না, দেয়ালের উপর দিয়ে মড় মড় শব্দে উঠে পড়ল দ্বীপে। যাত্রীরা মেঝে থেকে ছিটকে নানান দিকে ধাক্কা খেল। গুরুতর আহত হয়নি কেউ। কিন্তু ব্রিজে ব্র্যাডলি তেমন কিছু ধরেইনি, জানালার সেফটি গ্লাসে আছড়ে পড়ল সে। ফ্রেম থেকে। গ্লাসটা ধুপ আওয়াজ তুলে বাইরের দিকে পড়ল -সঙ্গে ব্র্যাডলিও। ডেকের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে সে, খানিকটা সামনে কাচের খাড়া হাউজিং।

জানালা টপকে বিদ্যুৎবেগে ছুটল রানা, লোকটাকে ধরবে। ও জানে, ডেক থেকে নীচে পড়লে মরতে হবে মানুষটাকে। মাটির উপর দিয়ে ছুটছে জাহাজ। বারবার উঠছে-নামছে। পা পিছলে গেল ওর, পলকে পৌঁছে গেল ব্র্যাডলির পাশে। দু'হাতে লোকটাকে ধরল রানা, নিজেও গড়িয়ে চলেছে। ততক্ষণে বোর্ডওয়াক চুরমার করে শহরে ঢুকেছে জাহাজটা। কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজ হলো, কিন্তু জাহাজের গতি থামল না, ওটার তীক্ষ্ণ কিল রাস্তার অ্যাসফল্ট কেটে এগিয়ে চলল সামনে।

জাহাজের সামনের গ্লাস-টপের উপর দিয়ে পিছলে এগিয়ে চলেছে রানা ও ব্র্যাডলি, খানিকটা দূরে প্রাউ! ওদের ধরবার কিছুই নেই, পিছলে চলেছে

প্রাউর দিকে। ওখান থেকে নীচে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! ব্র্যাডলি বুঝে গেল এবার মরতেই হবে। সামনে ঢালু একটা জায়গা, তারপর পনেরো ফুট নীচে ডেক। ওখানে একটা য্যাকুযি পুল আছে, বেশিরভাগ সময় খালি থাকে। জাহাজের ঝাঁকি ও আওয়াজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। ঢাল বেয়ে সরসর করে নীচে নামছে -কপাল ভাল, পুলে পানি আছে। ঝপাস শব্দে পড়ল দু'জন!

ভেসে উঠল ওরা, ব্র্যাডলি মুখ কুঁচকে বলল, 'মনে হয় বামহাতটাও গেছে!'

ওর দিকে খেয়াল নেই রানার, দেখছে বাড়িগুলো পাশ দিয়ে পিছিয়ে চলেছে।

'মা, জাহাজটা ওই যে আসছে,' বাড়ির জানালা থেকে বলল ছেলেটি, 'জলদি, দেখো এসো!'

'রোজো সত্যিই দারুণ এক শহর,' ছেলেটির বাবাকে বলল এজেন্ট। মনে মনে গালি দিল, বাইরে এত আওয়াজ কীসের! যে হারামজাদা আওয়াজ করছে, মরুক শালা! 'আপনারা এখানে দেখবেন কত দেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসে। আছে...'

জানালায় পৌঁছে গেছে মা, বাইরে চেয়ে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ল সে, ছেলের একহাত ধরেই ঘুরে দিল দৌড়! বাঁচতে হবে!

লাভ অ্যাট সি মাঝখান দিয়ে বাড়িটাকে সমান ভাগে দু'টুকরো করল। এক অংশে রয়ে গেল এজেন্ট ও পরিবারটি। হাঁ করে তারা দেখল তাদের তিন ফুট দূর দিয়ে চলেছে ইস্পাতের উঁচু একটা দেয়াল! বিকট আওয়াজে

সব ভেঙেচুরে এগিয়ে চলেছে ওটা। থরথর করে কাঁপছে সব, কিন্তু বাড়ির এদিকের অংশটা আস্তই রয়ে গেল। বড়রা নিঃশব্দে দেখছে, মুখে কোনও রা নেই।

পিচ্চি ছেলেটি বলে উঠল, 'মা, এই দ্বীপটা দারুণ ভাল! আমি এখানেই থাকব!'

শহরের মাঝখানটা তাক করে চলেছে জাহাজ, কিছুক্ষণ পর নাক ঢুকিয়ে দিল সেখানে -এক দম্পতি অনেক রাতে ঘুমিয়েছে, আওয়াজে তাদের ঘুম ভাঙল। জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখল একটা জাহাজ যাচ্ছে ডাঙার উপর দিয়ে! ওটার পোর্টহোলগুলো বড়জোর পাঁচ ফুট দূরে!

বড়সড় একটা ট্রাক নিয়ে চলেছে এক ড্রাইভার, এক ক্রেতার আসবাবপত্র পৌঁছে দেবে নতুন বাড়িতে। বাঁক নিয়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, কপালে উঠল চোখ -রাস্তা ধরে বিরাট এক জাহাজ ঠিক তার দিকেই আসছে। ডানে বাঁক দিল সে, কিন্তু সেঁধিয়ে গেল জাহাজের আণ্ডারসাইডে। দানব এগিয়ে চলেছে, চোখের সামনে সে দেখল তার উইন্ডস্ক্রিন চুরচুর হয়ে গেল, ট্রাকের সামনে থেকে ফেণ্ডার ও রেডিয়েটার উধাও হলো!

সতেরো

রাস্তার সবাই নানানদিকে ছুটছে, তাদের ধাওয়া করছে বিরাট জাহাজ! এক ফেরিওয়ালা ফল বিক্রি করার কার্ট নিয়ে পালানোর চেষ্টা করল, আরেকটু হলে পিষে যেত, কিন্তু জাহাজের কিলটা ওর দু'ফুট সামনে দিয়ে পেরিয়ে

গেল! যেসব গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে, ওগুলো যেন খেলনা -ধাক্কা খেয়ে সব ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। জাহাজের বিশাল খোল ইলেকট্রিসিটির পোলগুলো ভাঙছে, তারগুলো শর্ট-সার্কিট হয়ে স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছে। যে কুকুরটা পিয়ার থেকে তাড়িয়ে এনেছে জাহাজটাকে, সেটা এখন জাহাজের পাশাপাশি ছুটছে, পাগল হয়ে উঠেছে কামড়ানোর জন্য, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছে না।

এক স্থানীয় লোক একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এল, দু'হাতে অনেকগুলো ব্যাগ -অবাক হয়ে দেখল প্রকাণ্ড জাহাজ রাস্তা কেটে এগিয়ে আসছে। জায়গায় থমকে গেল সে, মনে পড়ল তার প্রিয় গাড়িটা চার্চের সামনে রেখে এসেছে। হঠাৎ কোত্থেকে জাহাজ আসে, সেটা তার মাথায় এল না, শুধু মন বলল, এ জাহাজ তো ওর গাড়ির বারোটা বাজাবে! হাঁ করে চেয়ে রইল সে, ইস্পাতের ছ'তলা দানবটা রাস্তার অ্যাসফল্টে লাঙল চালিয়ে ছুটছে, খানিকটা দূরে তার পলিশ করা প্রিয় নতুন কনভার্টিবল!

কুকুরটা এখন জাহাজের চেয়ে জোরে ছুটছে, পেরিয়ে গেল ওটা, মাড়ি বের করে ধমক মারছে। কনভার্টিবল ছুঁলো না লাভ অ্যাট সি, এগিয়ে চলল টাউন হলের দিকে। লোকটা গাড়িটার দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করল। জাহাজের পাশে ছুটছে কুকুর, সর্বক্ষণ ঘেউ-ঘেউ করছে। লাভ অ্যাট সি'র গতি একেবারে কমে এসেছে, টাউন হলের টাওয়ারে টোকা দিয়ে থামল। প্রাউর উপরের অংশ টাউন হলের ঘণ্টি বাজিয়ে দিল।

ঠং! ঠং! ঠং!

জাহাজ থেমে যাওয়ায় কুকুরটা সাহস পেয়েছে, কনভার্টিবলের বনেটের উপর লাফিয়ে উঠল। এবার জন্তুর গায়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। ওদিকে লোকটা

তার গাড়ির পাশে এসে থামল, হাসছে এখনও। হঠাৎ অনেক উপর থেকে কীসের ধাতব আওয়াজ এল, মাথা তুলে দেখল নোঙরটা নীচে পড়ছে!

লোহার প্রকাণ্ড নোঙর পড়ল কনভার্টিবলের উপর, সুন্দর গাড়িটা মুহূর্তে মুচড়ে দলা পাকিয়ে গেল। নোঙরের পিছন পিছন কয়েক শ' ফুট লম্বা শেকল। গাড়ির তখনও যা কিছু ছিল সব চ্যাপ্টা হয়ে গেল। কুকুরটা নোঙর-শেকলের ভিতর সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

ক্রুজ শিপ রাস্তার মাঝখানে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে, টাউন হল টাওয়ার বাদে অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে ওটা উঁচু। জাহাজের প্রপেলার এখনও ঘুরছে, যেন বিশাল কোনও পাখা, বাতাস দেবে।

ব্যাগগুলো মাটিতে আস্তে করে নামিয়ে রাখল লোকটা। চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল, একটা আওয়াজ তাকে থামিয়েছে। জাহাজের দিকে চেয়ে নেই সে, চোখ তার কুণ্ডলি পাকানো শেকলের উপর। গাড়িটা এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু আওয়াজটা কীসের? হর্ন নয়! শেকলের ভিতর থেকে ঘেউ করে উঠল কিছু। ওগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা, ভীষণ রেগে জাহাজের গায়ে কামড় দিল।

জাহাজের উপর থেকে হই-হল্লার আওয়াজ ভেসে এল। স্কাই-ডেকের জানালা দিয়ে অনেকে চেয়ে আছে, চারপাশের শহরটা দেখছে। কিন্তু আনন্দের চিৎকার হঠাৎই থেমে গেল, জাহাজ কাত হলো! মেঝেতে ডেকশায়ী হলো সবাই, রেলিঙের দিকে গড়িয়ে চলেছে! ছ'তলা থেকে নীচের রাস্তায় গিয়ে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু!

জাহাজ আরও কাত হলো, পাশের বাড়িগুলোর উপর হেলান দিল। ভয়ানক ওজনে দেয়াল ফাটছে, ভাঙছে, যেন পলকা কিছু। তারপর বাড়িগুলো জাহাজের পুরো ওজন নিল, ধসে পড়ল না!

লাভ অ্যাট সি সাগর ছেড়ে মাটিতে উঠেছে দেখে হো-হো করে হেসে উঠল হ্যালেক। উইণ্ড-জেট নিয়ে পুরো এক চক্কর কাটল সে। ভাবল, দুই জাহাজে ধাক্কা লেগে বিস্ফোরণ হয়নি বটে, কিন্তু যা ঘটল তাই বা কম কীসে। এ জাহাজ খতম। যা চেয়েছিল তা-ই হয়েছে, ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে, দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই!

সোহানা নিজেও খুশি। বেঁচে আছে রানা। দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে নিজের দিকে খেয়াল দিল এবার, হাতদুটো মুক্ত করতে হবে।

ছোট্ট দ্বীপের একটা অংশ ঘুরে আরেকদিকে চলেছে হ্যালেক। অবাক হলো সোহানা -লোকটা কি দ্বীপে নামবে না? উইণ্ড-জেট বাঁক নিতেই সামনের দৃশ্যটা দেখে চমকে গেল। একটু দূরে একটা বয়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা সি-প্লেন আটকে রাখা আছে।

'তা হলে এসেই পড়লাম,' তৃপ্তি নিয়ে হাসল হ্যালেক।

বুঝল সোহানা, ওই সি-প্লেন পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই যেমন করে হোক নিজেকে মুক্ত করতে হবে। হ্যালেক আত্মতৃপ্তিতে এতই মগ্ন যে দেখল না সোহানা দু'পা উইন্ড-জেটের রিলিজ বাটনের কাছে সরিয়ে নিয়েছে। হ্যালেক ওর হাতদুটো জেট-স্কির সামনে বেঁধেছে বলে পা সরানো খুব কঠিন। নিশ্চিত হতে পারল না সোহানা ওই লিভার জেট-স্কি রিলিজ করবে কিনা, তবে আশা করতে তো দোষ নেই! শহরের দিকে চেয়ে আছে হ্যালেক, বাড়িগুলোর উপর

দিয়ে জাহাজ দেখা যায় সেই সুযোগে সোহানা পা দাবিয়ে দিল লিভারের উপর। কিছুই ঘটল না। যে-কোনও সময়ে ওর দিকে ফিরবে হ্যালেক, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে ও। পা দুটো লিভারের নীচে রেখে উপরের দিকে টান দিল, এবার খুট আওয়াজে খুলে গেল লিভার।

দুই জেট-স্কির কানেক্টার রড বিচ্ছিন্ন হলো। সোহানা যেটায় বসেছে ওটা মুহূর্তে পিছিয়ে গেল। আটকানো দু' বাহু দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল সোহানা, রওনা হলো বন্দরের দিকে! হ্যালেকের জেট-স্কি তখনও সি-প্লেনের দিকে ছুটছে!

'সোহানা!' খ্যাপার মত চেঁচিয়ে উঠল হ্যালেক, তীরে এসে তরী ডুবছে দেখে টকটকে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা। জেট-স্কি ঘুরিয়ে নিল সে, সোহানাকে ধরবার জন্য পিছু নিল।

সোহানাকে নিয়ে জেট-স্কি ছুটে চলেছে, বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা নামিয়ে নিল ও, স্টিয়ারিং দুবাহু দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। গতি আরও বাড়িয়ে দিল। এসব জেট-স্কি শান্ত সাগরেও চালানো কঠিন, গতি বেড়ে যাওয়ায় পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল।

সোহানা তারই ফাঁকে হাত বাঁধা অবস্থাতেই স্টিয়ারিঙের নীচের স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট খুলে ফেলল, ভিতরে হাত ভরে খুঁজল কিছু পাওয়া যায় কিনা। ওখানে একটা ফ্লেয়ার গান ও কয়েকটা ফ্রেয়ার রয়েছে। পিস্তলটা বের করে নিল সোহানা, আরেক হাতে ধরেছে একটা ফ্লেয়ার। কয়েকবার চেষ্টা করে ফ্লেয়ার ভরল পিস্তলে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ফ্লেয়ার ঠিক দিকে পুরেছে কি না বুঝল না।

ইতিমধ্যে সোহানার জেট-স্কির ডানপাশে পৌঁছে গেছে হ্যালেক, থাবা মারল সোহানাকে ধরতে। দেখেছে সোহানাও, চট্ করে পাশ ফিরল, দু'হাতে শক্ত করে পিস্তল ধরল, তাক কল হ্যালেকের মুখ লক্ষ্য করে -পরমুহূর্তে চাপ দিল ট্রিগারে!

য্যাকুযি থেকে উঠে এল রানা, হাত বাড়িয়ে দিল ব্র্যাডলির দিকে। মাথা নাড়ল ব্রাডলি, ঘুর দাঁড়াল। তার দুই বগলে হাত ভোরে টেনে তুলে নিল রানা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ব্র্যাডলি, কোনও মতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল, টলছে। একহাতে তাকে ধরল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'হাঁটতে পারবেন? মনে মনে প্রশংসা করল, লোকটা হাতের প্রচণ্ড ব্যথা নীরবে সহ্য করছে।

'আমার দু'হাত ভেঙে গেছে, জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে একটা শহরের মাঝখানে, এর চেয়ে কষ্টের আর কী আছে একজন সেইলারের জীবনে,' বলল ব্র্যাডলি, হাসতে চাইল। 'তবে এর চেয়ে অনেক খারাপ কিছুও ঘটতে পারত।'

যে-কোনও সময়ে সাংবাদিক ও টিভির লোকজন চলে আসবে। চারপাশ দেখল রানা, এবার ওর জরুরি কাজে চলে যেতে হবে। 'আপনি জেসনের সঙ্গে দেখা করুন, ব্যথার ওষুধ দেবে,' বলল, 'সোহানাকে খুঁজতে আমি...' যিকুযির পানি পিছলা ডেকে পড়েছে, হোঁচট খেয়ে ধড়াস করে পড়ল রানা, সড়সড়িয়ে চলল ঢালু ডেকের রেলিঙের দিকে।

থামতে চাইল ও, কিন্তু সামনের রেলিং একদম নিচু -মুহূর্তে ওটা পেরিয়ে নীচের দিকে রওনা হলো!

একটা ছাদে নামল রানা, এক গাদা টাইলস নিয়ে পড়ছে। বেড়ে থাকা বারান্দার উপর পড়ল। ওখানে শৌখিন রট-আয়রন আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে, পাশে টবে লাগানো ফুলের গাছ। উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, সামনে বড়সড় একটা ঘর। পরিবারের পাঁচ সদস্য আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে। তাদের বাড়ির সামনে প্রকান্ড একটা জাহাজ এসে থেমেছে, ওখান থেকে নেমে এসেছে এক খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা ভয়ঙ্কর ডাকাত!

বাড়ির কর্তা থমকে গিয়ে বলল, 'আপনি কে? কী চান!'

'আমি কে এই মুহূর্তে সেটা জরুরি নয়, আর আপনাদের কাছে আমি কিছুই চাই না,' বলল রানা, 'জাহাজ থেকে এখানে পড়েছি বলে আমি নিজেই দুঃখিত ও ব্যথিত!' ঘরের একদিকে সিঁড়ি দেখল ও, দ্রুত পা চালাল ওটার দিকে।

নীচতলায় নেমে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে গেল ও।

লাভ অ্যাট সি'র ব্রিজে জেসন এখনও হুইল ধরে রেখেছে, এইমাত্র মেঝে থেকে উঠেছে। যতদূর দেখা যায় চারদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি! জেসনের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি, ও যেন এইনশেন্ট মেরিনার! ওর দু'পাশে এসে দাঁড়াল অ্যাডামস ও ব্রায়েস। ব্রিজের জানালা যেখানে ছিল সেখানে কিছুই নেই, কিন্তু ওরা কেউ মিস্টার ব্র্যাডলি ও রানা সম্বন্ধে কিছু বলল না। ভাবছে, মানুষ দুটো কোথায় গেল! বারবার চিন্তা এল মাথায়, এই ভয়াবহ অভিযাত্রা শেষ হয়েছে, এবং, ওরা বেঁচে আছে!

চার্চের জানালা দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছেন এক যাজক। জেসন তার দিকে হাত নাড়ল। একটু দ্বিধা করলেন যাজক, তারপর পাল্টা হাত নেড়ে হাসলেন। দু'চোখে অবিশ্বাস, এখনও ভাবছেন এরা অন্য কোনও দুনিয়ার মানুষ, আক্রমণ করবার আগে বন্ধুত্ব দেখানোর ভান করছে।

স্কাই-ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভিক্টর, চড়া স্বরে বলল, 'এ-দৃশ্য দেখার জন্য দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষ নিজের সব দেবে। রুবি, শিগগির এসো! দেখো একবার চেয়ে!'

'আমি রেলিঙের ধারেকাছে যাচ্ছি না, ভিক্টর,' বলল রুবি। 'এ-পর্যন্ত যা ঘটেছে তাতেই আমার আক্কেল হয়ে গেছে। আর তোমার তো ও জিনিসটা কোনওদিন হবে না! কোন আক্কেলে তুমি খোলা জায়গায় প্যান্ট ছাড়া দাঁড়িয়ে আছ! গোটা শহরের সবাই দেখবে তুমি আণ্ডারপ্যান্ট পরে হুল্লাহুল্লা নাচ্ছ!'

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে চমকে উঠল ভিক্টর, চেহারা কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রেলিং থেকে সরে এসে বলল, 'সবাই এখন জাহাজ দেখতে ব্যস্ত, আমার দিকে কেউ তাকাবে না, ডার্লিং!'

চোখ গরম করল রুবি। তবে হাসছে। ওদের খুনসুটি দেখে সবাই বুঝতে পারছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

ন্যান্সি বাবা-মার সঙ্গে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে চলেছে, হাসছে। বলল, 'তোমরা আসলে অত খারাপ নও, মা!'

'যাক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইন্ট্রি, 'একটা তো সার্টিফিকেট পাওয়া গেল! কী বলো, সিয়েরা, তাই না?'

হাসল ন্যান্সি, হাত নাড়ল ক্যারল ও জুলির উদ্দেশে। তারা আবার আসছে সবার খোঁজ-খবর নিতে।

'আমরা একচক্কোর ঘুরে সবাইকে দেখে ফিরে আসতে আসতেই দেখি নতুন কিছু ঘটে গেছে,' বলল ক্যারল।

'এরপর কী ঘটবে কে জানে,' বলল জুলি।

'যা ঘটার সব ঘটে গেছে, আর নতুন করে কিছু ঘটবে না,' বলল সিয়েরা। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে তার। 'আমরা এখন বিপদ-মুক্ত।'

'সব শেষ হয়নি, তোমার সঙ্গে বাজি ধরতে পারি,' বলল জুলি। 'দরকারে আমাদের ফার্ম লিখে দেব।' ন্যান্সিদের কাছে পৌঁছে গেছে দু' বোন।

ডেকের আরও সামনে রিটা দেখল লিলি ল্যাংট্রি সবাইকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে, কড়া স্বরে বলছে, 'আপনারা এক্ষুনি বসে পড়ুন!'

এন্টারটেইনমেন্ট ডিরেক্টর দমে যাওয়ার মেয়েই নয়, ভাবল রিটা।

লিলি বলে চলেছে, 'আমাদের ভেবে বের করতে হবে কীভাবে নামা যায়। চোখের সামনে আপনারা দেখছেন ডিউটি শপগুলো! আপনারা জানেন না শপিং করলে মাথা ঠাণ্ডা হয়!' রিটার দিকে। তাকাল সে, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ! যাও, কোনও বাজনার যন্ত্র নিয়ে এসো, খুশির এই মুহূর্তে গান ধরো!'

রিটার দলের সবাই আগেই লাইফবোটে চলে গেছে। রিটার মনে হলো ও যদি তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারত! এই অভিযানে অনেক কিছু ঘটেছে, এসব সংবাদপত্রে আসবে, টিভিতে বলা হবে, কিন্তু ওর অন্তরের কথা কেউ জানবে না। ওর ক্যারিয়ারের কোনও লাভ হবে না এতে। লিলির দিকে চেয়ে হাসল রিটা, পকেট থেকে একটা মাউথ অর্গান বের করল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল লিলির চেহারা। তীক্ষ্ণ ঝনঝনে স্বরে বলে উঠল, ‘লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনারা এখন শুনবেন রিটা ডেলটনের মিউজিক!’

দু’পা এগোল রিটা, তারপর লিলি ল্যাংট্রির গলা একহাতে টিপে ধরল। হাঁ হয়ে গেল লিলি, আর সে-সুযোগে রিটা মাউথ অর্গানের অর্ধেকটা তার মুখে ভরে দিল।

মাউথ অর্গান মুখ থেকে ফেলে আর্তনাদ করে উঠল লিলি, ‘তুমি হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ কেন?’

‘তোর মুখ বন্ধ করতে,’ হুঙ্কার ছাড়ল রিটা।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিলি, পরমুহূর্তে আরেকদিকে দৌড় দিল! ডেকে আর থাকলই না, সুপারস্ট্রাকচারে গিয়ে ঢুকল।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে গর্ডন, খুব চিন্তিত স্ত্রীর জন্য । ‘সোফিয়া ডার্লিং,’ বলল সে। ‘তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসব?'

স্বামীর দিকে অসহিষ্ণু চোখে চাইল সোফিয়া। ‘কী নিয়ে আসতে চাও, গর্ডন?’

‘আসলে...’ থমকে গেল গর্ডন। ‘সত্যিই ছেড়ে দিয়েছ?’

‘দিয়েছিলাম,’ মুচকি হাসল সোফিয়া। ‘কিন্তু এখন একটা পেলে মন্দ হয় না।‘

‘ঠিক বলেছ,’ খুশি হয়ে উঠল গর্ডন। ‘তা হলে আমিও দুই পেগ উইস্কি খাব।’

‘ঠিক আছে। আমি বাধা দেব না, তুমি যদি আর সিগারেট ছাড়তে না বলো।'

বিখ্যাত আমেরিকান ফিল্ম ডিরেক্টর টার্ক রাজয় তার সিগারেট বোটে উঠেছে, বুকের কাছে ঝুলছে পুরু সোনার চেইন। এইমাত্র স্পিয়ার গানগুলো লকারে রেখেছে সে, চেয়ে আছে শহরের দিকে। দৃশ্যটা দেখবার মতই, আস্ত এক ক্রুজ শিপ মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে শহরে ঢুকেছে। মুভি ক্যামেরা থাকলে ছবিটা তুলে রাখা যেত।

'জাহাজটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি ক্যাপ্টেন,' সাড়ে চারফুটি দেহটা নিয়ে ছ'ফুটি বান্ধবীর চোখে চাইল সে, 'আমি হলে আরও আগেই ব্রেক চাপতাম।'

'ড্রাইভার বেচারার কপাল মন্দ,' বলল মারিয়া। ''ওই লোকের আর চাকরি হবে না কোনও জাহাজে।'

টার্ক রাজয়ের বোটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা, ওর একটা ভাল বোট দরকার, ওটা নিয়ে সোহানাকে খুঁজতে বেরোবে। এক লোক স্পিড-বোটে মাত্র উঠেছে, তার পাশে থেমে রানা বলল, 'আমার একটা বোট দরকার, খুব জরুরি।'

পায়ের দিকে দেখাল লোকটা, বোটের ভিতর হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। বোটের পাম্প চালু করলেও অত পানি সেঁচতে বিশ মিনিট লাগবে। তারপর ইঞ্জিন চালু হবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অন্য কোথাও স্পিড-বোট খুঁজতে হবে, বুঝে গেল রানা। বোট এমন হতে হবে, যাতে উইণ্ড-জেটকে গতিতে হারিয়ে দিতে পারে। সাধারণ মোটর-বোট দিয়ে কাজ হবে না। চারপাশ দেখল রানা, বন্দরে অনেক বোট পানি গিলেছে, কিছু ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। ওর চোখ পড়ল বিধ্বস্ত পিয়ারের দিকে।

ওখানে সাগর-তীরে একটা সিগারেট বোট ভাসছে, মনে হলো না ওটার কোনও ক্ষতি হয়েছে। দ্রুত পায়ে সেইদিকে এগুল রানা।

'ডার্লিং, মুরিং কেইবলটা খুলে উঠে পড়ো,' অস্বাভাবিক মোটা গলায় বলল রাজয়। নিজে এসব কাজ করে না সে। বান্ধবীরা আছেই তো এসবের জন্য। 'জলদি, মারিয়া, আমাদের জন্য রাম ঢালছি,' হাতের ইশারা করল সে। শক্তিশালী ইঞ্জিন চালু করল। 'স্পিয়ার গানও তৈরি, মাছেরও অভাব নেই। শিগ্‌গির!'

মারিয়া কেইবল খুলে বোটে উঠল।

বিধ্বস্ত পিয়ারে উঠে পড়েছে রানা, সিগারেট বোটের লম্বা নাকের উপর লাফিয়ে নামল। রওনা হয়েছে বোট, মাঝখানের উইণ্ডস্ক্রিন পেরিয়ে এপাশে চলে এল রানা, দুই সিটের পিছনে এসে দাঁড়াল।

আরেকটু হলে সিট থেকে পড়ে যেত রাজয়, ঘাড় কাত করে রানাকে দেখল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?' কর্কশ কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পেল।

'আমি ওই জাহাজের একজন প্যাসেঞ্জার,' বলল রানা, আঙুল তুলে দেখাল ডাঙায় ওঠা জাহাজটা। 'আপনার বোটটা আমার দরকার।' ওর কণ্ঠস্বর থমথমে, যে-কেউ ওর দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবার আগে দ্বিতীয়বার ভাববে।

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন?' জানতে চাইল রাজয়। 'আপনি কি জানেন আমরা পিকনিক করতে চলেছি?'

'জানি। কিন্তু আমি আমার বান্ধবীর জীবন রক্ষার চেষ্টা করছি,' বলল রানা। 'পিকনিক এখন বন্ধ, বন্দর ছেড়ে বোট নিয়ে ডানদিকে চলুন।'

‘আপনি আমার বোট থেকে এক্ষুনি নেমে যান, নইলে...’ হুমকির স্বরে শুরু করল রাজয়। কিন্তু থমকে গেল লোকটার চোখে চোখ পড়তেই। ব্যাটা একটা স্পিয়ার গান তুলে নিয়েছে! তাকও করেছে ওর বুক লক্ষ্য করেই।

‘জলদি সরুন।’ ধমক দিল রানা।

মারিয়া এতক্ষণ কথা শুনেছে, এবার বুদ্ধিমতির মত বলল, ‘আমার মনে হয় তোমার সরে যাওয়াই ভাল, টার্ক।’

‘ঠিক আছে,’ হুইলের পিছনে বসে পড়ল রাজয়, ‘তবে, আপনার হুকুমে নয়, যাচ্ছি আমার বান্ধবীর অনুরোধে। আর, কথা দিতে হবে আমার বোটের কোনও ক্ষতি করবেন না।’

স্পিয়ার গান সরিয়ে রাখল রানা, রাজয়ের হাফ-প্যান্টের কোমরটা দুহাতে ধরল, পরমুহূর্তে লোকটাকে সিট থেকে তুলে পিছনে নামিয়ে দিল। নিজে তার সিটে বসেই থ্রটল খুলে দিল। সিগারেট বোট বিরাট একটা লাফ দিল, পরক্ষণে ছুটল ছোট্ট দ্বীপের দিকে। টার্ক রাজয় আরেকটু হলে পানিতে গিয়ে পড়ত, পিচ্চি ডেকে ধপ করে পড়ল। একবার শুধু বিলাপের সুরে বলল, ‘ম্যান, আস্তে চলুন। এটার দাম আড়াই লাখ ডলার!’

কথা শুনে থটল পুরোপুরি খুলে দিল রানা, সিগারেট বোটের নাক সঙ্গে সঙ্গে পানি থেকে উপরে উঠল। পিছলে গিয়ে বেটে পিছনে গিয়ে থামল রাজয়।

মারিয়া আরাম করে সিটে বসেছে, হু-হু বাতাসে উড়ছে তার দীর্ঘ কেশ, একবার পাশ ফিরে দেখল সুদর্শন লোকটা দক্ষহাতে হুইল ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে। যেখানে নিয়ে যেতে চায় যাক না! ...ওর বান্ধবীটা ভাগ্যবতী।

আঠারো

জেট-স্কি পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে ছুটছে, তারই ফাঁকে ফ্লেয়ার গানের ট্রিগার টিপল সোহানা। দয়াময়ী বঙ্গ-ললনা! সরাসরি ওর দিকে তাক করেনি। হ্যালেকের মাথার তিন ইঞ্চি উপর দিয়ে উড়ে গেল ফ্লেয়ার। এখনও সোহানার পাশাপাশি ছুটছে সে। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, ভয়ও পেয়েছে। বুঝেছে, সরাসরি ওর চোখে-মুখে ফ্লেয়ার ছুঁড়তে এ মেয়ের হাত কাঁপবে না। ইচ্ছে করেই প্রথম গুলিতে মাথার চুল পুড়িয়ে দিয়েছে, দ্বিতীয় গুলিতে অন্ধ করে দেবে। রক্তচক্ষু সোহানার চোখে স্থির হলো।

অন্তরে বুঝে গেল সোহানা, যে-করে হোক ওকে পালাতে হবে, নইলে লোকটা ভয়ঙ্কর কিছু করবে এবার।

থ্রটল পুরো খুলে দিল সোহানা, খানিকটা এগিয়ে হ্যালেকের জেট-স্কির সামনে দিয়ে পেরতে চাইল। ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে যেত হ্যালেক, কিন্তু সামলে নিল। তার জেট-স্কি তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, এক চক্কর কেটে আবারও সোহানার পিছন পিছন ছুটল। ততক্ষণে সোহানা দশ গজ এগিয়ে গেছে। সিটে ঝুঁকে বসল সোহানা, ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটল বন্দরের দিকে।

তবে হ্যালেকের দু'হাত মুক্ত, জেট-স্কি দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারছে। তিরিশ গজ পেরনোর আগেই সোহানার পিছনে পৌঁছে গেল সে। সামনে বেড়ে সোহানার পথ আটকে দেবে কি না ভাবল। তারই ফাঁকে দেখল, আবার ফ্লেয়ার গান লোড করছে সোহানা। ফ্লেয়ার এরইমধ্যে নলের ভিতর পোরা হয়ে গেছে! তিক্ত হাসল হ্যালেক, মেয়েটা এবার ওর কপালে ফ্লেয়ার ছুঁড়তে চাইবে! কিন্তু দু'হাত আটকানো, সরাসরি তাক করতে পারবে না। গুলি

লাগাতে হলে আগে ওকে বাম পাশে পেতে হবে সোহানার! সে-সুযোগ সে দেবে না!

গতি আরও বাড়াল হ্যালেক, ঠিক সময়ে ছোবল দেবে সে। এক পলকে সোহানার ডান পাশে পৌঁছে গেল। চট করে ফিরতে চাইল সোহানা, তবে দেরি হয়ে গেছে। ফ্লেয়ার গান ঘোরানোর। আগেই ওর হাতে থাবা দিল হ্যালেক, এক টানে পিস্তলটা কেড়ে নিতে চাইল। পিস্তলের নলটা আকাশে তাক করা, যে-কোনও সময়ে ওটা কেড়ে নেবে লোকটা -ট্রিগার টিপে দিল সোহানা। দুশ করে একটা আওয়াজ হলো, আকাশের দিকে রওনা হলো ফ্লেয়ার। অনেক উপরে নীলাকাশে ফাটল ওটা, ওখান থেকে নামতে শুরু করল সাদা ধোঁয়ার পুরু রেখা।

টান মেরে ফ্লেয়ার গান কেড়ে নিল হ্যালেক, সাগরে ছুঁড়ে ফেলল। পরমুহূর্তে নিজের জেট-স্কি ত্যাগ করে একলাফে সোহানার পিছনের সিটে এসে নামল। দু'হাতে সোহানাকে ঘিরে ফেলল সে, শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে এক শ' ষাট ডিগ্রি বাঁক নিল। সি-প্লেনের দিকে চলেছে। কানের পাশে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল হ্যালেক, 'তুমি ভেবেছ আমাকে ফাঁকি দেবে, সোহানা? সেটি হবার নয়, আমি যা চাই তা আদায় করে ছাড়ি।'

লাথি ছুঁড়ল সোহানা। হাই-হিল দিয়ে লোকটার শিন-বোনে জোর লাথি লাগিয়ে দিয়েই লাফিয়ে উঠতে চাইল, আশা করল লোকটা সিট থেকে সাগরে গিয়ে পড়বে।

'কী করছ তুমি!' ব্যথায়, রাগে গর্জে উঠল হ্যালেক।

সোহানা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ছাড় আমাকে! হারামজাদা, পিশাচ কোথাকার!'

সিগারেট বোটের স্পিডোমিটার বলছে আশি নট্, খুদে কয়েকটা দ্বীপ পেরিয়ে এল রানা, খেয়াল করেছে ওগুলোতে সোহানাকে নিয়ে ওঠেনি হ্যালেক।

পপস রাজয় এরইমধ্যে কয়েকবার রানাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে। শেষে বুঝে গেছে, উন্মাদ লোকটা কোনও কথাই শুনবে না, বোটের ড্রাইভিং সিট থেকেও নড়বে না। তবুও বলল, 'আপনি যা করছেন, সেটা করার অধিকার আছে একমাত্র পুলিশের। জানেন, আমি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারি?'

রানা চুপচাপ বোট নিয়ে এগিয়ে চলেছে। 'দেখো, পপস,' বলে উঠল মারিয়া। 'আতশবাজি!'

মেয়েটির আঙুল লক্ষ করল রানা। বেশ দূরে একটা সবুজ দ্বীপ, ওটার কাছে আকাশে জ্বলে উঠেছে ফ্লেয়ার। স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওই দ্বীপের দিকে।

'ওদিকে অনেকগুলো অগভীর রিফ আছে,' সতর্ক করল পপস। 'অত জোরে ওদিকে যাবেন না!'

বাঁক নিয়েই থ্রটল পুরো খুলে দিল রানা। সিগারেট বোটের নাক তিন হাত উপরে উঠে গেল। প্রায় উড়ে চলেছে বোট। মাঝে মাঝে তলায় কেমন যেন ঘিসঘিসে আওয়াজ হচ্ছে। ওগুলো সম্ভবত রিফের মাথা, অথবা কোনও হাঙরের পাখনা। রাজয় ব্যাটার বুকটা ভাঙে ভাঙুক, ওসব দেখবার সময় এখন নয়!

ঝটকা-ঝটকি করছে সোহানা, হ্যালেকের হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু পিছন থেকে লোকটা ওকে গায়ের জোরে চেপে ধরে আছে। জেট-স্কি সি-

প্লেনের পাশে গিয়ে থামল। ছুরির পোঁচ দিয়ে স্কি থেকে সোহানার হাত ছাড়িয়ে নিল হ্যালেক, তবে কব্জিদুটো বাঁধাই রইল। সোহানার কণ্ঠনালিতে ছুরির ফলা ঠেকাল, কর্কশ স্বরে বলল, 'চুপচাপ প্লেনে উঠবে, কোনও চালাকি চাই না।'

দুই কব্জি সোহানার কোলের কাছে পড়ে রয়েছে, জেট-স্কি ছেড়ে পা রাখল ও প্লেনের একদিকের পন্টুনে। বাঁধা হাতে ককপিটের দরজা খুলল, একবার পিছনের উইঙের উপর দিয়ে চারপাশ দেখল। হ্যালেক ছাড়া কোথাও কোনও মানুষ নেই! ফিউজেলাজে বসানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সোহানা, ককপিটে ঢুকবার আগে আরও একবার ঘুরে তাকাল। হ্যালেক এখনও জেট-স্কির উপর দাঁড়িয়ে, ওকেই দেখছে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে রেখেছে, হাতে বেরিয়ে এসেছে নাইন এমএম গ্লক পিস্তল। লোকটার চোখ বলে দিল, এখন তাকে বাঁধা দিলে নির্দ্বিধায় গুলি করবে। ককপিটে উঠে বামের সিটে বসল সোহানা।

প্লেনের মুরিং লাইন খুলে ফেলল হ্যালেক, দেরি না করে ককপিটে এসে ঢুকল। মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে তার, মেয়েটা ডেঞ্জারাস... যদি প্লেনের কন্ট্রোল নিয়ে নাড়াচাড়া করে! বন্দিনীর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল বাগিয়ে ধরল হ্যালেক, পাইলটের সিটে বসল। কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল কালো ব্যাগ। ওটা ভরে রাখল একটা ওয়াটারপ্রুফ কাভারিঙে -ওটার সঙ্গে রয়েছে ফ্লোটেশন ডিভাইস। হীরার ব্যাগ ডুবলে চলবে না! ডুবতে দেবে না সে!

সোহানার দিকে চাইল হ্যালেক, হাসি-হাসি চেহারা করে বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়েই দেব, সোহানা?' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'তবে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে!'

নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠল হ্যালেক, ককপিট প্যানেলে একের পর এক সুইচ টিপছে, আডজাস্টমেন্টগুলো করছে। দাঁত বের করে হাসল, এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করো, ডারলিং। অনেকদিন হয় আমি প্লেন চালাই না।'

'চালানোর দরকার কী,' বলল সোহানা। পানির উপর দিয়ে বোটের মত করে চালাও। উন্মাদের উচিত না প্লেন চালানো।'

হাসল হ্যালেক, সব মিলে মন খুশি তার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। প্যানেলের উপর মনোযোগ দিল, পিস্তলটা বামহাতে চলে গেল, কোলের উপর নামিয়ে রাখল -তবে মাঝে মাঝে সোহানাকে দেখে নিচ্ছে। ফ্লাইট প্রিপারেশন হয়ে গেল, তারপর ইঞ্জিনের সুইচ টিপতেই মাছির মত আওয়াজ তুলে ঘুরতে লাগল প্রপেলার। ককপিটে যথেষ্ট আওয়াজ আসছে, বাইরে তাকাল সোহানা। খোলা সাগরের দিকে এগোতে শুরু করল প্লেন। কিছুক্ষণ ট্যাক্সিইং করল, তারপর থমকে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপরই হঠাৎ ওটা খ্যাপা ষাঁড় হয়ে উঠল।

একবার সোহানাকে দেখল হ্যালেক, পরমুহূর্তে থ্রটল অনেকটা খুলে দিল। প্লেনের গতি আরও তুলছে, দুই মিনিটের মধ্যে আকাশে উড়াল দেবে ওটা। সুপার ট্যাঙ্কারের উপর দিয়ে বাঁক নেবে, রোজো শহরের পাশ দিয়ে ফিরতি পথ ধরবে গুয়েডেলোপের রাজধানী ব্যাসটেয়ার উদ্দেশে।

তীব্র গতিতে ছুটছে প্লেন, আর কয়েক সেকেণ্ড পর আকাশে। উড়াল দেবে -ঠিক তখনই সামনে থেকে একটা সিগারেট বোট তেড়ে এল! দুটো যান্ত্রিক দানব যেন পরস্পরকে ধ্বংস করতে চায়! প্লেনের টেক অফ পাথ ধরেই আসছে ওটা!

বোটটার দিকে চেয়ে রইল হ্যালেক ও সোহানা। হঠাৎ চমকে উঠল দু’জনই -দ্রুতগতি ওই বোট সরাসরি ওদের দিকে চালিয়ে আনছে মাসুদ রানা!

আরে! আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো ব্যাটা! প্লেনের গতি কমাল হ্যালেক, কোর্স পাল্টে নিল একটু! থ্রটল খুলে দিল আবার, স্পিড তুলছে প্লেনের। ওটাকে ধরতে হলে রানাকে এর পাশ থেকে তেড়ে আসতে হবে।

বোটের দিকে আড়চোখে চাইল হ্যালেক। এবার রানার বাপেরও সাধ্য নেই ওকে ঠেকায়। লোকটা পিছু নিয়েছে, কিন্তু তাকে হারতে হবে। বিড়ালের মত কড়কড়ে স্বরে বলল হ্যালেক, ‘আমার ধারণার কথা বলছি, সোহানা, তোমার প্রেমিক আমাকে যেমন আনন্দ দিল, ঠিক তুমিও তেমনি মজা দেবে।’

সিগারেট বোটের পুরো থ্রটল খুলে দিয়েছে রানা, আড়াআড়ি ভাবে প্লেনের গতি-পথের পিছনে পৌঁছে গেল। এ বোট হ্যালেকের সি-প্লেনের টেকঅফ গতির চেয়ে বেশি দ্রুত ছুটতে পারে। রানা যা ভেবেছে পরের দশ সেকেণ্ডে সেটাই প্রমাণ হলো, বোট প্লেনের সাত-আট ফুট দূরে পৌঁছে গেল!

‘স্টিয়ারিং ধরুন, রাজয়!’ চেঁচিয়ে বলল রানা। তীব্র বাতাস মুহূর্তে ওর কথা অন্যদিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ‘আপনি প্লেনের কাছাকাছি থাকবেন!’

আবছা ভাবে কথাগুলো শুনেছে পপস। সিটের পিছনে আরাম করে শুয়ে ছিল, পাল্টা চেঁচাল, ‘স্টিয়ারিং কেন ধরব? কেন প্লেনের কাছে থাকব? কোন কারণে?’

‘কারণ আছে,’ বলল রানা। ‘কথা না শুনলে আপনাকে তুলে ফেলে দেব পানিতে।’

সোজা কথা জানিয়ে দিয়েছে রানা, লোকটার চোখ দেখে ভয়ই পেল রাজয়। 'বুঝতে পেরেছি, জোরালো কারণ!' বলল ডিরেক্টর। হুইল খপ্ করে ধরল সে, বাঁদরের মত লাফিয়ে এসে সিটে বসল। প্লেনের পাশে পৌঁছে গেছে বোট। বিমানের একটা ডান রানার হাতের কাছেই। দুই জলযান পঁচাশি মাইল গতিতে ছুটছে!

'আরও কাছে চলুন!' বলল রানা, স্পিয়ার গান তাক করল প্লেনের দিকে।

'আপনি উন্মাদ!' জানাল পপস। চোখদুটো গোল হয়ে গেছে। 'আপনি প্লেন শিকার করতে চান?'

তাক ভুল হলো না রানার, প্লেনের পাতলা উইঙে স্পিয়ার গেঁথে গেল। স্পিয়ারের পিছনে বাঁধা ইস্পাতের চিকন তারটা ছাড়ল না ও, চট করে বোটের গানেলের সঙ্গে বেঁধে ফেলল । স্পিয়ারের কাটাগুলো খুলে এল না বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

রানার সঙ্গে যে ঝগড়া হয়েছে সেটা মুহুর্তে ভুলে গেল পপস রাজয়, এই খেলায় মজা পেয়ে গেছে। এটা যেন রিয়াল লাইফ ভিডিও গেম! থ্রটল একটু কমিয়ে দিল সে। বোট পিছাতে চাইছে, কিন্তু প্লেনের ডানা ওটাকে টানছে! হাসতে শুরু করল রাজয়, 'পাখির গতি কমে আসছে! অনেকটা আকাশের ঘুড়িকে টেনে নামিয়ে আনার মতই!'

মারিয়াও হাসতে শুরু করল, দু' যুবক শিশুর কাণ্ড দেখছে। রানার হাতে আরেকটা স্পিয়ার গান তুলে দিল সে।

উইঙে যতবার টান লাগছে, প্লেন ধীরে ধীরে পাশে সরছে। কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হ্যালেক, তার সাধের প্লেন যেকোনও সময়ে পানির

মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়বে। চারবার এরকম হওয়ার পর ভাল সুযোগ বের করে নিল সোহানা, একটু আগে দেখেছে ওর পাশের দরজায় একটা পকেট আছে, ওটার ভিতর আছে একটা থার্মোস ফ্লাস্ক –দু'হাতে ওটা একটানে বের করে নিল, গায়ের জোরে হ্যালেকের মাথার উপর নামিয়ে আনল।

'শয়তান মাথারি!' গুঙিয়ে উঠল হ্যালেক, দু'চোখে অন্ধকার দেখছে। তবে ঝুঁকে পড়ে ইয়োকে জোর টান দিল, বুঝে গেছে যেকরে হোক টেকঅফ করতে হবে তাকে।

এই সুযোগে হীরা ভরা ব্যাগটা তুলে নিল সোহানা, পাশের জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। তখনই দেখল, ওর খানিকটা পিছনে রানার সিগারেট বোট! পপস্ রাজয় দক্ষতার সঙ্গে প্লেন সহ বোটের গতি কমিয়ে আনছে, উড়ু-উড়ু প্লেন এখন আবারও ঢেউয়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় স্পিয়ার ছুঁড়ল রানা, ওটা লাগল একটা পন্টুনের গায়ে। তারটা বাঁধবার আগেই টানটান হয়ে গেল, ওটার সঙ্গে বোট থেকে উড়াল দিল রানা। শক্ত হাতে তার ধরেছে। পানির উপর দিয়ে হেঁচড়ে এগোল। তারটা ধরে টেনে একটু একটু করে প্লেনের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছে রানা।

প্লেনের পিছনে ছুটছে বোট! আকাশে উড়তে দিচ্ছে না।

ঠিক তখনই ককপিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল সোহানা, রানাকে পানিতে দেখেই হ্যালেকের উপর ঝাপিয়ে পড়ল! এক হাতে ওর চোখে ঘুসি মারল হ্যালেক। ব্যথায় কাতরে উঠল সোহানা, পাশের দরজায় গিয়ে ছিটকে পড়ল।

'হারামজাদি!' গর্জে উঠল হ্যালেক, দুহাতে ইয়োক ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিল -পানি থেকে প্লেন আকাশে তুলবে!

ওদিকে পপস রাজয় তার বোট নিয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছে, তার হাসি দেখে যে-কেউ ভাববে হুইল ছিপে বিরাট কোনও মাছ ধরেছে! ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটছে প্লেন, উড়াল দিতে গিয়েও পারছে না! রানা হাঁপিয়ে উঠেছে, ছিটকে ওঠা পানির কণাগুলো যেন ওর শ্বাস আটকে দেবে! বুঝে গেছে যে-কোনও সময়ে ছিটকে পড়বে। তবে একটা সুযোগ হয়তো পাবে! স্পিয়ার গানের রিট্রাকশন বাটন টিপে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পন্টুনের দিকে এগোতে শুরু করল ওর দেহ। পন্টুনে আটকে থাকা স্পিয়ার ওকে টেনে নিয়ে চলেছে! পন্টুনের কাছাকাছি গিয়ে লাইন ঢিলা হলো, দু'হাতের জোরে দূরত্বটা পেরিয়ে গেল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যালেক টের পেল সি-প্লেনের ওজন বদলে গেছে। তার মানে পন্টুনে কেউ উঠেছে! দ্রুতগতিতে বামে বাঁক নিল। হ্যালেক, আশা করল এক কাজে দুই কাজ হবে -রানা ছিটকে পড়বে, একইসঙ্গে বোটের লাইন ছাড়িয়ে নেয়া যাবে। ঝটকা খেয়ে পিছলে গেল রানা, কিন্তু দু'হাতে ধরে রাখল পন্টুন, ছাড়ল না। প্লেনের ডানা থেকে স্পিয়ার খুলল না, পিছন থেকে বোট ওটাকে টানছে, ফলে গঙ্গাফড়িংটা ডুবতে বসল। প্রাণপণে প্লেনের নাক সোজা রাখার চেষ্টা করছে হ্যালেক, কিন্তু সোহানা ওকে স্বস্তি দিচ্ছে না, পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কনুই দিয়ে হ্যালেকের কানের পাশে জোর গুঁতো দিল। ব্যথায় লোকটা কন্ট্রোলের উপর উবু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছে।

পন্টুনের সামনের দিকে এগোল রানা, কিন্তু পাইলটহীন প্লেন ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে চাইছে। ডানার গোড়ার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড পর ককপিটের দরজার পাশে থামল। তবে

ওটা কো-পাইলটের দরজা। ওখানে আছে সোহানা, কিন্তু উন্মত্ত সাগরে বিমান স্থির না হলে হ্যাণ্ডেলই ধরা যায় না!

দু'হাতের ধাক্কায় হ্যালেককে ইন্সট্রুমেন্টের উপর থেকে সরিয়ে দিল সোহানা, প্লেনটা সোজা রাখার চেষ্টা করছে। পারলও কিছুটা, কিন্তু খেয়াল করেনি হ্যালেকের জ্ঞান ফিরেছে! এদিকে প্লেনের গতিও বাড়ছে।

সোজা হয়ে বসতে চাইল হ্যালেক, ঠিক তখনই দেখল কোপাইলটের জানালা দিয়ে মাসুদ রানার মুখ উকি দিচ্ছে! বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার আগেই হ্যালেক বুঝল বদমাশ লোকটা ককপিটে এসে ঢুকবে এখুনি!

সোহানাকে দু'হাত দিয়ে জোর ধাক্কা দিল হ্যালেক, একটানে ইয়োক পিছনে নামিয়ে আনল -সঙ্গে সঙ্গে প্লেন পানি ছেড়ে ভেসে উঠল! ওটার ডানায় আটকে থাকা স্পিয়ার টান খেয়ে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে নিল ডানার কাভারের বড়সড় একটা অংশ! বিমানের সঙ্গে বোটের আর সম্পর্ক থাকল না!

বিমান আকাশে উড়াল দিতেই ভারসাম্য হারাল সোহানা, সেই সঙ্গে রয়েছে হ্যালেকের ধাক্কা-ঠেলা খেয়ে হুড়মুড় করে রানার উপর গিয়ে পড়ল ও। ডোর ফ্রেম ধরতে চাইল রানা, কিন্তু হাত ফস্কে গেল! সোহানাকে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও, পড়ল পন্টুনের উপর! জিনিসটা দু'জনের ওজন সইতে পারল না, প্লেন থেকে খসে গেল। তারপর সোহানা-রানাকে নিয়ে ঝপাস করে পড়ল সাগরে! দু'হাতে সোহানাকে জড়িয়ে ধরেছে রানা, ওদের সামনে দিয়ে দ্রুতগতি স্লেডের মত পিছলে এগিয়ে গেল পন্টুন! ডুবে গেল ওরা!

বিমানে বসে উন্মাদের মত হাসছে হ্যালেক। যাক, ঝামেলা শেষ -এখন কেউ আর তাকে ঠেকাতে পারবে না। সামনে চোখ ফেলল, ওর সামনে এখন

অবারিত ভবিষ্যৎ, নীল আকাশ! অন্তত তা-ই থাকবার কথা, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা সুপার ট্যাঙ্কারের উঁচু দেয়াল দেখল সে।

মাথায় আঘাত পেয়ে চোখে ভাল দেখছে না হ্যালেক, তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওই দেয়াল পর্যন্তই ওর দৌড়, ওখানেই বিধ্বস্ত হবে বিমানটা। তবুও কয়েকবার ইয়োক টানল, তারপর হাল ছেড়ে দিল - ককপিটের দরজা খুলে ঝাপ দিল বাইরে। ছুটন্ত পন্টুনের সঙ্গে বাড়ি খেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। ডিগবাজি খেয়ে সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়ল সে। তার দেখা হলো না, হঠাৎ হালকা হয়ে যাওয়ায় বিমানটা সুপার ট্যাঙ্কারের দেয়াল পেরিয়ে গেছে, ডেকের উপর দিয়ে ওদিকের সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়েছে।

হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেল হ্যালেক, খুব ঠাণ্ডা লাগছে। চোখ খুলে দেখল, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে তার দেহটা পানি কেটে সোজা নীচের দিকে চলেছে! ওপরে সূর্যালোকের সামান্য আভাস। নীচে কালিগোলা অন্ধকার! আর ভাবতে পারল না হ্যালেক, চার হাত-পা নেড়ে ভেসে উঠতে চাইল! কিন্তু হতাশা এসে ভর করেছে মনে, ভয়ও পেয়েছে প্রচন্ড। ওর ধারণা, গভীর সমুদ্রের অনেক নীচে তলিয়ে গেছে। এখানে বাস করে মানুষখেকো হাঙর, কিলার ওয়েইল আর নিষ্ঠুর ব্যারাকুডা। চোখ বন্ধ হয়ে গেল আতঙ্কে, টের পেল ফুসফুস আঁকড়ে আসছে! কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে উঠে শ্বাস নিতে চাইল, বদলে টেনে নিল লোনা পানি! অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করল মিনিট খানেক! আরও কয়েকবার খাবি খেল! বাঁচার তাগিদে নিজের অজান্তেই আবার উঠল কয়েক ফুট, তারপর হঠাৎ হাল ছেড়ে দিল। জানল না, সাগর সমতল থেকে মাত্র পাঁচ ফুট নীচে মারা পড়ছে সে!

কয়েক সেকেণ্ড পর চেতনা হারালো স্ট্রাথার হ্যালেক, শিথিল দেহটা মাথার ভারে উল্টে গেল, তারপর ডাইভ দেওয়ার ভঙ্গিতে নেমে গেল নীচে।

নোয়া'জ বোটের ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন নাহিআন মাহমুদ, এইমাত্র এক নাবিক তাকে বিমান দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছে। স্টারবোর্ড রেইলিঙের পাশে ভিড় করেছে অনেকেই। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল নাহিআন। বিমানটা এখন আর নেই, শুধু একটা পন্টুন ভাসছে পানিতে।

'জাহাজের ওপর পড়লেই গেছিলাম,' বলল নাহিআন। আমরা আরেকবার বেঁচে গেলাম। 'সবাই নিজেদের কাজে যাও, আর এখানে নয়, আমরা আজই রওনা দেব!'

'নতুন ক্যাপ্টেনের আদেশ শুনলে তোমরা,' বলল বর্তমান ফার্স্ট অফিসার ফ্রেড।

'থ্রি চিয়ার্স ফর ক্যাপ্টেন মাহমুদ!' চেঁচিয়ে বলল এক নাবিক।

'হিপ হিপ হুররে!' হুঙ্কার ছাড়ল সবাই।

হাসছে সমস্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, সিম্যান। যার যার নিজের কাজে রওনা হয়ে গেল সবাই।

সোহানা কখন হাত থেকে ছুটে গেছে, বোঝেনি রানা। স্বর্ণ-রশ্মির মধ্য দিয়ে চারপাশে তাকাল। খানিকটা নীচে সোহানা খুব ধীরে উঠে আসছে! ওর দুই কব্জি দড়ি দিয়ে বাঁধা দেখল রানা। ডুব সাঁতার কেটে সোহানার পাশে চলে গেল, ওকে নিয়ে উঠতে শুরু করল। দশ ফুট উঠতে দশ সেকেণ্ডও লাগল না, একহাতে সোহানাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে বাঁধন খুলতে শুরু করল।

তারই ফাঁকে দেখল ওর বাহন সিগারেট বোট ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে এদিকে আসছে। ওটার গতি একদম কমে গেছে, পপস বোধহয় ওদেরকেই খুঁজছে।

পঞ্চাশ গজ দূরে ওটা থেমে গেল। ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে নামছে। রানা-সোহানা, দূর থেকে মারিয়ার অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল।

'পপস, ঢেউয়ের মধ্যে ওই যে একটা কালো মাথা!'

সঙ্গিনীর কথার জবাব দিল না পপস। জিনিসটা কারও মাথা নয়, কালো একটা ব্যাগ, সঙ্গে রয়েছে ফ্লোটেশন ডিভাইস।

চারপাশ দেখল পপস, কয়েক মুহূর্ত পর রানা ও সোহানাকে দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। ধারণা করছে জিনিসটা দামি কিছু, কিন্তু লুকাতে পারবে? চট্ করে ওটা পানি থেকে তুলে নিল সে, রেখে দিল পাটাতনের নীচে।

'ওই যে সেই প্লেন ধরা স্পিয়ার ম্যান,' হাত তুলে বলে উঠল মারিয়া। হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেল, সুদর্শন লোকটার সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতী! মন খারাপ করে বলল, 'ওর সঙ্গে একটা মেয়েও আছে দেখছি!'

সিগারেট বোট ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, পানিতে পড়া মানুষ দু'জনকে উদ্ধার করবে।

একহাতে সোহানাকে ধরে রেখেছে রানা, ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে আসছে সোহানার নরম ঠোঁটে।

'যাহ! ওরা দেখছে তো!' বিড়বিড় করল সোহানা।

তারপর বাকশক্তি হারাল।

***